শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
২৫টি
রোমাঞ্চকর
কল্পবিজ্ঞান

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
২৫টি
রোমাঞ্চকর
কল্পবিজ্ঞান

২৫টি রোমাঞ্চকর কল্পবিজ্ঞান

২৫টি রোমাঞ্চকর কল্পবিজ্ঞান

সম্পাদনা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পারুল

ভূমিকা

কল্পবিজ্ঞানকে আমি বলি আধুনিক রূপকথা। সেকেলে রূপকথার দিন আর নেই। তার কারণ পৃথিবীতে আর অজানা দেশ নেই। রাক্ষসখোক্কস নেই, ডানাগুলোলো পক্ষীরাজ ঘোড়া নেই, রাজা বা রাজকন্যা বা রাজপুত্রদেরও আর সেই অবস্থান নেই। এ যুগের বাচ্চারা আর সেইসব রূপকথাকে তেমন উপভোগ করেনা। তার রূপকথাই যখন খোলনলচে পাল্টে, বিজ্ঞানের পোশাক পরে এসে হাজির হয় তখন আবার তার আকর্ষণ দুর্নিবার হয়ে ওঠে। টাইম ট্রাভেল বা সময়-প্রবাহ, প্রশান্তের ক্যাথলিক সভ্যতা কিংবা বর্তমানেরই কোনও মেকপ্রদ প্রযুক্তিমায়ার গল্প আমাদের যোগবিষ্ট করে রাখে। আমি নিজে কল্প-বিজ্ঞানের ভক্ত পাঠক।

বর্তমান সংকলনটি 'পঁচিশটি রোমাঞ্চকর কল্পবিজ্ঞান' বাংলা ভাষায় রচিত এই আধুনিক রূপকথা। এই সংকলনের অভিমুখ শুধু শিশু আর কিশোরই নয়, সব বয়সের পাঠক পাঠিকাই, এই ধরনের রচনায় যাঁরা সিদ্ধহস্ত তাঁদের লেখাতেই সংকলনটি সমৃদ্ধ হয়েছে।

ভরসা করি বইটি সকলের কাছে সমাদর পাবে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সূচি

নীল মানুষের বন্ধু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রণজয়ের জন্য দর্জি এসেছে। তার নতুন প্যান্ট তৈরি হবে। বাগানের আম বিক্রি করে বেশ কিছু টাকা পেয়েছেন বাবা। ছেলে ফিরে আসায় তিনি এত খুশি হয়েছেন যে বলে দিয়েছেন, যত টাকা লাগে লাগুক, রণজয়ের জন্য তিনখানা করে প্যান্ট-শার্ট শিগগিরই তৈরি করতে হবে।

দর্জিকে ডেকে আনা হয়েছে বাড়িতে। রণজয়কে প্রথম দেখেই সে হাত-পা ছড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল!

মাথায় জলটল দিয়ে তার জ্ঞান ফেরানো হল বটে, তবু সে চোখ ফ্যালফ্যাল করে বলতে লাগল, কী দেখলাম! ও কে? অসুর, না দৈত্য!

রণজয়ের দাদা সঞ্জয় বলল, আরে ছি ছি ছি, তুমি এত সহজে অজ্ঞান হয়ে গেলে? বইটই পড়ো না কিছু? মানুষ বুঝি লম্বা হতে পারে না? পৃথিবীর কত জায়গায় কত লম্বা লোক থাকে। গিনেস বুক অফ রেকর্ডস নামে একটা বই আছে। তাতে সাড়ে আট ফুট লম্বা মানুষের ছবি আছে। আমার ভাই তো মাত্র আট ফুট পাঁচ ইঞ্চি!

দর্জি বলল, মানুষ? ও সত্যি মানুষ?

সঞ্জয় বলল, হ্যাঁ, ও আমার ভাই রণজয়। হঠাৎ লম্বা হয়ে গেছে। বেশি লম্বা হয়ে গেছে!

দর্জি বলল, তা বলে একেবারে তালগাছের মতন লম্বা? ওর গায়ের রং নীল কেন? একেবারে কলমের কালির মতন নীল?

সঞ্জয় বলল, একটা অসুখে ওরকম নীল হয়ে গেছে। অসুখ করলে অনেকের গায়ের রং কালো হয়ে যায় না?

দর্জি তবু ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। সে বলল, রং কালো হয় শুনেছি, কিন্তু নীল রং হয় তা কখনো শুনিনি! দুর্গাপুজোর সময় মহিষাসুরের মূর্তিটাই তো নীল রঙের হয় দেখি!

সঞ্জয় বলল, কেন, শুধু মহিষাসুরের রং নীল কেন? শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রং নীল নয়? শ্রীরামচন্দ্রের?

এ কথা বলেই সঞ্জয় কপালে হাত জুড়ে নমস্কার করে বলল, ওঁরা অবশ্য এমনিই নীল।

দর্জিটি বলল, দাদা, সত্যি করে বলুন তো, কাছে গেলে আমায় কামড়ে-টামড়ে দেবে না তো? তুলে আছাড় মারবে না?

সঞ্জয় হেসে বলল, আরে না না! আমার ভাইটি খুব নিরীহ! অতবড়ো চেহারা হলে কী হয়, আসলে এখনো শিশুই রয়ে গেছে। চল, চল, তোমার ভয় নেই কিছু!

বাড়ির ভেতরের দিকে উঠোনে একটা তোয়ালে শুধু কোমরে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে রণজয়। এতদিন সে বনে-জঙ্গলে থাকত, জামা-কাপড় সব ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। তার খালি গা, বুকেটুকে একটাও লোম নেই। সমস্ত শরীরটা নীল পাথরের মূর্তির মতন। যারা রণজয়কে চেনে না তারা দেখলে তো ভয় পাবেই!

একটা লম্বা টুল আনা হল। তার ওপর দাঁড়িয়ে দর্জি মাপ নিতে লাগল। তার হাত দুটো এখনো থরথর করে কাঁপছে, রণজয়ের মুখের দিকে সে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না।

রণজয় মুচকি হেসে ফিসফিস করে বলতে লাগল, ভয় নেই! ভয় নেই!

কোনোরকমে রণজয়ের মাপ নেওয়া শেষ হল।

তখন রণজয় বলল, এবার আমার বন্ধুর জামা প্যান্টের মাপ নাও।

উঠোনের এক কোণে নীল ডাউন হয়ে বসে গুটুলি একটা পেয়ারা খাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে দর্জির চোখ আমার কপালে উঠল। সে বলল, ওরে বাবা, এ আবার কী? এত ছোটো মানুষ? এও কী অসুখের ওপর ছোটো হয়ে গেছে নাকি?

গুটুলি তেজের সঙ্গে বলল, না, আমার অসুখটসুখ হয়নি। তা ছাড়া আমি মোটেও ছোটো মানুষ না। আমি একটু বেঁটে, এই যা! ছোটো মানুষ আর বেঁটে মানুষ কী এক?

দর্জি এবার ফিক করে হেসে ফেলে বলল, এইটুকু মানুষের গলার আওয়াজ তো কম নয়! ঠিক যেন একটা শানাই!

গুটুলির কাছে এসে ফিরে খুলে দর্জি বলল, এই, নড়াচড়া করবি না, চুপ করে দাঁড়া।

গুটলি আবার ধমকের সুরে বলল, আপনি আমাকে তুই তুই বলছেন কেন? আমি কী বাচ্চা ছেলে নাকি?

দর্জি তবু হাসতে লাগল।

মাপ নেওয়া শেষ করে দর্জি চলে যাবার পর সঞ্জয় বলল, মজার ব্যাপারটা দেখলে? রণজয়কে দেখে দর্জি ভয়ে ভিরমি খেয়েছিল। আর গুটুলিকে দেখেই হাসতে লাগল!

রণজয় বলল, গুটুলির চেহারাটা ছোট্টখাট্টো হলে কী হবে, ওর বুদ্ধি কারুর চেয়ে কম নয়।

এর পর এক মুচিকে ডেকে বানানো হল ওদের দুজনের জুতো।

অনেকদিন পর নতুন জামা-প্যান্ট-জুতো পরে, সেজেগুজে রণজয় গুটুলিকে নিয়ে বেরুল রাস্তায়।

গ্রামের অনেক লোকই এখন রণজয়ের কথা জেনে গেছে। ভয়টাও এখন ভেঙেছে। রণজয় কারুর কোনো ক্ষতি করে না। কোনো গাছটাছও ভাঙে না। কিন্তু গুটুলিকে দেখে সবাই মজা পায়। বাচ্চা ছেলেরা গুটুলিকে ঘিরে ধরে হাততালি দিতে দিতে বলে, এই বাঁটকুল! এই বাঁটকুল! কেউ কেউ তার গায়ে ঢিল ছোঁড়ে।

রণজয় ঘুরে দাঁড়ালেই অবশ্য সবাই চোঁ চোঁ দৌড় মারে।

গুটুলিকে নিয়ে রণজয় নদীর ধারে এসে বসল। সন্ধে হয়ে এসেছে। এখানে আর কোনো মানুষজন নেই।

রণজয় আস্তে আস্তে বলল, জানিস গুটুলি, অনেকদিন আগে এই রকম এক সময়ে আমি নদীর ধারে মাছ ধরতে এসেছিলাম। হঠাৎ এক সময় আকাশ থেকে একটা সাদা বল খসে পড়ল। সেই বলকে আমি ধরতে গেলাম। তারপর থেকেই আমার এই অবস্থা। চেহারাটাও লম্বা হতে লাগল আর গায়ের রংটাও বদলে গেল।

রণজয় নিজের কাহিনি বলে যাচ্ছে, গুটুলি কোনো সাড়াশব্দ করছে না।

এক সময় হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনে রণজয় চমকে মুখ ফেরাল।

গুটুলির থুঁতনিতে একটা আঙুল ছুঁইয়ে সে বলল, এ কী, তুই কাঁদছিস কেন? কী হয়েছে?

গুটুলি তবু কান্না থামাচ্ছে না।

রণজয় আবার কাতরভাবে জিজ্ঞেস করল, তোর কী হয়েছে? বাড়ির জন্য কষ্ট হচ্ছে?

গুটুলি কাঁদতে কাঁদতেই বলল, আমার কোনো বাড়িই নেই!

রণজয় জিজ্ঞেস করল, তা হলে কীসের কষ্ট হচ্ছে? নতুন জুতোয় পায়ে ফোস্কা পড়েছে?

গুটুলি বলল, না, সে সব কিছু না। আমার কষ্ট হচ্ছে অন্য কারণে। বন্ধু, এবার তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে!

রণজয় বলল, সেকি! আমায় ছেড়ে যাবি কেন? আমার বাড়িই তো তোর বাড়ি। আমার মা তোকে ভালোবাসে। আমার দাদাও তোকে পছন্দ করে।

গুটুলি বলল, সে জন্যও নয়। তুমি লম্বা, আমি বেঁটে। তোমাকে দেখে লোকে ভয় পায়, আমাকে দেখে লোকে হাসে। কেউ আমার মাথায় চাঁটি মারে, কেউ ঢিল ছোঁড়ে। যখন বনে-জঙ্গলে ছিলাম, তখন বেশ ছিলাম। লোকজনের মাঝখানে থাকলে কেউ আমাকে গ্রাহ্য করবে না। তোমার পাশে থাকলে আমাকে আরও বেশি বেঁটে দেখায়! নাঃ, আমি চলেই যাব!

রণজয় বলল, তুই আমার একমাত্র বন্ধু। তুই চলে গেলে আমি থাকব কী করে? না, না, গুটুলি, তোকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না!

গুটুলি মাটিতে চাপড় মারতে মারতে বলল, আমি লম্বা হতে চাই! আমি লম্বা হতে চাই! আমি তোমার মতন লম্বা হতে চাই!

রণজয় বলল, লম্বা হওয়ার অনেক জ্বালা রে, গুটুলি! দ্যাখ না, আমি ইচ্ছে মতন চলাফেরা করতে পারি না। কেউ আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না!

গুটুলি বলল, আর বেঁটে হওয়ার কী জ্বালা, তা তো তুমি বুঝবে না! এর থেকে লম্বা হওয়া অনেক ভালো। তোমার সেই সাদা বলটা কোথায়? সেটা জোগাড় করে আন। আমি লম্বা হব!

রণজয় বলল, সেটা কোথায় পাবো রে! মহাকাশের লোকেরা সেটা তো আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

গুটুলি বলল, ওসব জানি না। লম্বা না হলে আমি আর এখানে থাকতে চাই না। আমি আর বেঁচেও থাকতে চাই না।

রণজয় আলতো করে গুটুলির পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, অমন করিস না। মরার কথা বলতে নেই। ঠিক আছে, তুই লম্বা হতে চাস তো! দেখা যাক, কী ব্যবস্থা করা যায়। আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরে থাক।

পরদিন ওরা গেল শহরের দিকে। ট্রেনে চেপে এল, কিন্তু কোনো অসুবিধে হল না। অনেকেই অবাক হয়ে তাকাচ্ছে বটে, রণজয়কে দেখে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছে। কিন্তু ভয়ে চোখ উলটে ফেলছে না।

শহরের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে রণজয় বলল, কী আশ্চর্য ব্যাপার বল তো গুটুলি! আগে আমাকে দেখলেই লোকে ভয়ে পালাত। এখন তো সে রকম কিছু হচ্ছে না। হঠাৎ সব বদলে গেল কী করে?

গুটুলি বলল, কারণটা বুঝলে না? আগে যখন তুমি জঙ্গল থেকে বেরুতে তখন তোমার খালি গা, জামা ছিল না। ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা ধুতি জড়ান। আর মাথার চুলও আঁচড়াতে না। সবাই তাই মনে করত জঙ্গলের দৈত্য-দানব। এখন তোমার ভদ্দরলোকদের মতন নতুন পোশাক। আজকাল পোশাক দেখেই তো সবাই মানুষ চেনে!

রণজয় বলল, হায় রে, মানুষ দেখে চেনা যায় না। পোশাক দেখে ভদ্দরলোকদের চিনতে হয়। তা হলে তো দর্জিদেরই জয়!

গুটুলি বলল, তবু দ্যাখো, তোমাকে দেখে কেউ হাসছে না। আমায় দেখে হাসছে। এ পৃথিবীতে লম্বাদেরই জয়।

—তুই আমার সমান লম্বা হতে চাস, গুটুলি?

—না, না, তোমার সমান নয়। ছোটো ছেলেরা আমাকে দেখে ভয় পাক, তাও আমি চাই না। এই ধর, মাঝামাঝি। তোমার শরীর থেকে খানিকটা কমিয়ে যদি আমার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেত!

—ওঃ, তা হলে কী ভালোই হত! তুই আর আমি সমান সমান! আচ্ছা, সামনে ওটা কী দেখা যাচ্ছে, চল তো যাই!

গুটুলি সামনে তাকিয়ে দেখল।

রাস্তার ওপারে একটা পার্ক। তার একদিকটা টিন দিয়ে ঘেরা। সেখানে গেটের ওপর সাইনবোর্ডে লেখা : নবীন ব্যায়ামগার।

তার তলায় আবার ছোটো ছোটো অক্ষরে লেখা : শরীর মজবুত করতে হলে এখানে যোগ দিন!

গুটুলি আর রণজয় রাস্তা পার হয়ে সেই গেট ঠেলে ঢুকল।

দুপুরবেলা সেখানে আর লোকজন কেউ নেই, শুধু ব্যায়ামাগারের ম্যানেজার একা বাফুপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে ওঠবোস করে যাচ্ছেন।

রণজয় কোনো ভুমিকা না করেই বলল, আপনারা এখানে শরীর মজবুত করে দেন। আপনারা বেঁটে লোককে লম্বা করে দিতে পারেন?

ম্যানেজার মশাই বসা অবস্থায় রণজয়ের পা থেকে দেখতে লাগলেন। পেট-বুক-গল পর্যন্ত চোখ বোলাতে বোলাতে তাঁর মুখখানা অনেকটা হাঁ হয়ে গেল। তিনি বললেন, অ্যাঁ? অ্যাঁ? অ্যাঁ? আরও লম্বা? আপনি আরও লম্বা হতে চান?

রণজয় হেসে বলল, না, আমি না। এই যে আমার বন্ধু। এর কথা বলছি।

রণজয়ের আড়ালে গুটুলিকে আগে দেখতে পাননি ম্যানেজার মশাই। এবার তিনি ভালো করে দেখে নাক কুঁচকে বললেন, ধুৎ! ধুৎ! ধুৎ!

রণজয় বলল, এ কি, আপনি তিনবার ধুৎ বললেন কেন?

ম্যানেজার মশাই বললেন, আমি এক একটা কথা তিনবার তিনবার তিনবার বলি!

রণজয় বলল, আপনি একবারই বা ধুৎ বলবেন কেন?

ম্যানেজার মশাই বললেন, ওইটুকু বেঁটে বাঁটকুল কখনো লম্বা লম্বা লম্বা হয়? কোনো আশা নেই, আশা নেই, আশা নেই!

রণজয় বলল, সে কী মশাই? বেঁটে লোকরা কোনোদিন লম্বা হতে পারে না?

ম্যানেজার মশাই বললেন, ধুৎ! ধুৎ! ধুৎ! তা কখনো হয়! তবে আপনারা প্রফেসার হংসধবজের কাছে গিয়ে দেখতে পারেন। সে ওসব কী যেন করে শুনেছি!

রণজয় জিজ্ঞেস করল, ঠিক আছে। প্রফেসর হংসধবজের ঠিকানা?

ম্যানেজার মশাই ঘরে ঢুকে একটা কার্ড নিয়ে এসে বললেন, এই নাও, এই নাও, এই নাও! যাও, যাও, যাও,।

রণজয়ও তিনবার বলল, যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি!

কার্ডখানাতে লেখা, প্রফেসার হংসধবজ রায়। যে-কোনো সমস্যা, চলে আসুন!

ঠিকানাটা খুব দূরে নয়।

রণজয় বলল, চল রে, আজই একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। হংসঝবজের নামটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

সেটা একটা সিনেমা হলের মতন বাড়ি। দুদিকে দুটো গেট। মাঝখানের দেওয়ালে নানা বয়সের অনেক নারী-পুরুষের ছবি। বেঁটে, মোটা, রোগা, লম্বা।

বাড়িটার সামনে এসে রণজয় বলল, এবার তুই আগে যা গুটুলি। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।

ভেতরের অফিস ঘরে প্রফেসার হংসধবজ রায় টেবিলে বসে লেখালেখি করছিল। গুটুলি তার কাছে গিয়ে বলল, এই যে শুনুন!

হংসধবজ এক পলক গুটুলির দিকে তাকিয়ে বলল, যা, যা এখন বিরক্ত করিস না। কাজ করছি!

গুটুলি বলল, আপনার সঙ্গে একটা কাজের কথা আছে!

হংসধবজ ড্রয়ার খুলে একটা লজেন্স বার করে গুটুলির হাতে দিয়ে বললেন, এই নে, যা পালা!

গুটুলি রাগ করে লজেন্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, আপনি কী আমাকে বাচ্চা ছেলে পেয়েছেন নাকি? আমার বয়েস একুশ।

হংসধবজ এবার দারুণ ধমক দিয়ে বলল, আ মল যা! তোর বয়েস কত আমি কী তা জানতে চেয়েছি? জেনে আমার লাভ কী? কেন আমায় বিরক্ত করছিস!

গুটুলি বলল, আমি একটা কাজের কথা বলতে এসেছি!

হংসধবজ বলল, আমি কোনো কাজের কথা শুনতে চাই না।

গুটুলি এবার বাইরের দরজার কাছে এসে হাঁক দিল, বন্ধু, তুমি এবার ভেতরে এস!

রণজয় ধপধপ করে পায়ের শব্দ করতে করতে ভেতরে আসতেই হংসধবজ চমকে তাকাল। চ্যাঁচাতে গিয়েও গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। অজ্ঞান হয়ে সে চেয়ারসুদ্ধু উলটে পড়ে গেল!

গুটুলি বলল, দেখলে তো বন্ধু, বেঁটে লোকদের কেউ গ্রাহ্য করে ন। আমাকে বকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, আর তোমাকে দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেল।

টেবিলের ওপর এক গেলাস জল রাখা ছিল। সেটা মাথায় ঢেলে দিতেই হংসধবজ চোখ মেলে তাকাল।

রণজয় বলল, ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই! আমরা কাজের কথা বলতে এসেছি!

হংসধবজ এবার দুজনকে দেখল ভালো করে তারপর উঠে বসে খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, তোমরা কাজ চাও! এক্ষুনি কাজ দিতে পারি। দু'হাজার টাকা করে মাইনে পাবে।

রণজয় অবাক হয়ে বলল, কাজ মানে চাকরি? আপনি আমাদের চাকরি দিতে চাইছেন? কী চাকরি?

হংসধবজ বলল, খুব সোজা কাজ। আমার বাড়ির দু'দিকের দরজায় তোমরা দুজনে দাঁড়িয়ে থাকবে। একজনের গায়ে লেখা থাকবে 'আগে', আর একজনের গায়ে লেখা থাকবে 'পরে'।

রণজয় জিজ্ঞেস করল, তার মানে?

হংসধবজ বলল, আমার এটা একটা নার্সিংহোম। এখানে লোকে চিকিৎসা করতে আসে তো। বেঁটে লোকটির গায়ে লেখা থাকবে 'আগে', তার মানে আমার এখানে চিকিৎসা করাবার আগের অবস্থা। আর আর একজন 'পরে'। তার মানে, চিকিৎসার পরের অবস্থা!

রণজয় বলল, আপনার এখানে বেঁটে লোককে লম্বা করা যায়?

হংসধবজ বলল, হ্যাঁ, কেন যাবে না। সব করা যায়!

রণজয় বলল, বাঃ বাঃ বাঃ! চমৎকার! তা হলে তো কোনো চিন্তাই নেই। আপনি আমার এই বন্ধুটিকে লম্বা করে দিন তো! তারপর আমরা আপনার সব কথা শুনব!

হংসধবজ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, তোমার মাথা খারাপ? এই বেঁটে বঙ্কেশ্বরকে কি কেউ লম্বা করতে পারে?

গুটুলি ফুঁসে উঠে বলল, খবর্দার!

রণজয়ও হুৎকার দিয়ে বলল, আপনি আমার বন্ধুকে অপমান করছেন কেন? এই না বললেন, বেঁটে লোককে আপনি লম্বা করে দিতে পারেন?

হংসধবজ বলল, সে বলেছি বলেছি বেশ করেছি। আমার যা খুশি আমি তাই বলবো!

গুটুলি অমনি ছুটে গিয়ে হংসধবজের একটা হাতক ঘ্যাঁচ করে কামড়ে দিল।

হংসধবজ আঁতকে উঠে বলল, এ কী?

গুটুলি বলল, আমাকে অপমান করছ কেন? আমারও যা খুশি তাই করব?

হংসধবজ এবার ভয়ে চুপসে গিয়ে রণজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমিও কামড়ে দেবে নাকি? তা হলে আর আমি বাঁচব না! আঁ? সত্যি সত্যি আর বাঁচব না!

রণজয় ঘাড় ধরে হংসধবজকে উঁচুতে তুলে নিল। তারপর বলল, আমি সব সময় কামড়াই না। তবে, আমারও যা ইচ্ছে তাই করব!

হংসধবজ পা দোলাতে দোলাতে বলল, নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও আমার ঘাড়ে ব্যথা, আরও ব্যথা হয়ে যাবে।

রণজয় ঘাড় ধরে হংসধবজকে তুলে নিল।

রণজয় তাকে মাটিতে নামাবার পর সে, বলল, আসল ব্যাপার কী জান, রোগা লোকেরা মোটা হয়ে গেলে একটু বেঁটে দেখায় আর মোটা লোকেরা খুব রোগা হয়ে গেলে খানিকটা লম্বা মনে হয়। আজকাল রোগা-মোটা করার অনেক জায়গা আছে, তাই আমি রোগা-লম্বা করার কথা বলি। আসল বেঁটেকে লম্বা করা আমার সাধ্য নয়। তবে তোমরা একটা কাজ করতে পার। তোমরা মেঘধবজ আচার্যের কাছে যাও।

গুটুলি জিজ্ঞেস করল, সে আবার কে?

হংসধবজ বলল, সে একজন জাদুকর আর বৈজ্ঞানিক। সে অনেক কিছু পারে। সে তোমাদের মনোবাঞ্ছা ঠিক পূর্ণ করে দেবে।

গুটুলি ধমক দিয়ে বলল, আবার শক্ত শক্ত কথা বলছো। ওই কথাটার মানে কী?

রণজয় বলল, চল, চল, এ কথাটার মানে আমি জানি!

হংসধবজের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে রণজয়েরা চলে এল মেঘধবজ আচার্যের বাড়িতে।

এ বাড়িটার সামনের দিকটা ভাঙা-চুরো, বন-জঙ্গলে ভরতি। কিন্তু ভেতরে পরপর তিনখানা ঘর লাল, নীল আর সবুজ রং করা।

রণজয়রা প্রথমে লাল রঙের ঘরটার দরজায় ধাক্কা দিল।

একজন বুড়ো মতন লোক শুধু মাথাটা বার করে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই

রণজয় বলল, আমরা মেঘধবজ আচার্যের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বৃদ্ধটির মাথাভরতি চুল, মুখভরতি দাড়ি, চোখে রুপোলি ফ্রেমের চশমা।

রণজয়কে দেখে তিনি একটুও অবাক না হয়ে বললেন, বা বা বা বা! এই রকম একজনকেই তো খুঁজছিলাম। তুমি কী কলসির দৈত্য নাকি হে?

রণজয় বলল, আজ্ঞে না। আমি মানুষ!

বৃদ্ধ বললেন, তুমি মানুষ? তবে তো আরও চমৎকার। তুমি আমার জন্য একটু মরতে পারবে?

রণজয় গুটুলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, একটুখানি মরা মানে কী রে?

বৃদ্ধ বললেন, তুমি দড়াম করে মরে যাও না। তারপর তোমার শরীরটা আমি কাটাছেঁড়া করবো। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করবো। দেখবো, দৈত্যদের সঙ্গে মানুষদের কী তফাত! দৈত্য বলে সত্যিই কিছু ছিল কিনা।

রণজয় বলল, আজ্ঞে, এই সামান্য কারণে তো আমি মরতে রাজি নই। আমার আরও বেশ কিছুদিন বাঁচার ইচ্ছে আছে!

বৃদ্ধ তাতে যেন বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, তবে ওই দৈত্যের মতন চেহারা নিয়ে আমার কাছে এসেছো কেন?

রণজয় বলল, শুনেছি, আপনি মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন। তাই আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি।

বৃদ্ধ বললেন, বটে? তোমাদের মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ করব কেন শুনি? তাতে আমার কী লাভ হবে? আমার বুদ্ধি সময়ের দাম নেই?

রণজয় বলল, আমাদের মনোবাঞ্ছা যদি পূর্ণ হয়, তাহলে আপনাকে আমরা নিশ্চয়ই কিছু দেব। আপনি কী চান বলুন!

বৃদ্ধ মুখ ভেংচে বললেন, ইস! আবার বলে কী চান! তুমি আমার জন্য সামান্য মরতেও রাজি হলে না! আচ্ছা, আগে শুনি তোমাদের মনোবাঞ্ছা কী!

রণজয় হাত কচলে বলল, আজ্ঞে দেখুন, আমার এই বন্ধুটির উচ্চতা খুব কম। তাই নিয়ে ওর মনে খুব দুঃখ। আপনি ওকে লম্বা করে দিতে পারেন?

বৃদ্ধ এবার গুটুলিকে দেখে খুকখুক করে হেসে বললেন, কেন, বেশ তো চেহারাটা। লম্বা হয়ে কী হবে?

গুটুলি জিজ্ঞেস করল, আপনি লম্বা করে দিতে পারেন কি না, আগে সেটা ঠিক করে বলুন!

বৃদ্ধ দুদিকে ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, পারি। তা পারি। কিন্তু একটা মুশকিল আছে। পৃথিবীটা একটা নিয়মে চলে জানো তো? একটা বেঁটে লোক হঠাৎ লম্বা হয়ে গেলে আর একজন লম্বা লোককে বেঁটে হতে হবে! তোমার বদলে তা হলে কে বেঁটে হবে বল?

রণজয় আগ্রহের সঙ্গে বলল, আমি! আমি!

বৃদ্ধ বললেন, তুমি? ইস, এত বোকা তুমি? এতখানি লম্বা চেহারা কেউ নষ্ট করে?

রণজয় বলল, আমি এতটা লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা থাকতে চাই না!

বৃদ্ধটি বললেন, বেশ, হবে এস!

বৃদ্ধটি এবার তাদের নিয়ে গেলেন নীল ঘরে। সে ঘরটা অনেক রকম যন্ত্রপাতিতে ভরতি। বৃদ্ধটি কয়েকটা প্লাগ লাগিয়ে দিলেন ওদের দুজনের গায়ে। তারপর একটা মেশিনের বোতাম টিপতেই গোঁ গোঁ শব্দ হতে লাগল।

রণজয় শুধু একটু সুড়সুড়ির মতন বোধ করল, আর কিছু টের পেল না। গুটুলি থরথর করে কাঁপছে।

একটু পরে বৃদ্ধটি আনন্দে হাততালি দিতে দিতে বললেন, বাঃ বাঃ! ঠিক হয়েছে! আমি আর তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না।

রণজয় জিজ্ঞেস করল, তার মানে?

বৃদ্ধ বললেন, এই সহজ কথাটার মানেও বুঝতে পারলে না? তোমরা অদৃশ্য হয়ে গেছ। তোমাদের আর কেউ দেখতে পাবে না।

রণজয় নিজের গায়ে চোখ বুলিয়ে বলল, কই, আমি তো আমাকে দেখতে পাচ্ছি!

বৃদ্ধ বললেন, তা তো পাবেই। অদৃশ্য হলেও নিজেকে দেখা যায়।

রণজয় বলল, আমি গুটুলিকেও দেখতে পাচ্ছি।

গুটুলি বলল, আমি তোমাকেও দেখতে পাচ্ছি।

বৃদ্ধ বললেন, অদৃশ্য লোকেরা নিজেদের দেখতে পায় না কে বলল? একজন ভূত কি অন্য ভূতকে দেখতে পায় না? অন্য মানুষ আর দেখতে পাবে না তোমাদের।

রণজয় বলল, কিন্তু আমরা তো অদৃশ্য হতে চাইনি? এ কী করলেন?

বৃদ্ধ বললেন, আহা হা, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বেঁটে কিংবা লম্বা কি আর এমনি এমনি হওয়া যায়? আগে অদৃশ্য হতে হয়। এরপর তোমরা একজন বেঁটে আর একজন লম্বা হবে! চল, এবার পাশের ঘরে।

বৃদ্ধর কথামতন ওরা দু'জন চলে এল সবুজ ঘরে।

বৃদ্ধ এবার একটা পিচকিরি দিয়ে খানিকটা গন্ধ জল ছিটিয়ে দিলেন ওদের গায়ে। আপনমনে হাসলেন ফিকফিক করে ঘরটা অন্ধকার করে দিলেন সব আলো নিভিয়ে।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এখনো ভেবে দ্যাখো, যে বেঁটে আছ, সে লম্বা হতে চাও লম্বা যে, সে বেঁটে হতে চাও?

গুটুলি আর রণজয় দুজনেই একসঙ্গে বলল, হ্যাঁ, চাই!

বৃদ্ধ বললেন, তা হলে এবারে পেছনের দেয়ালের দিকে দ্যাখো।

আবার আলো জ্বলতেই ওরা পেছন ফিরে দেখল, দেয়ালের গায়ে দুটো বিরাট গোল মতন আয়না। তাতে ফুটে উঠল দুটো বিকট মুখ!

গুটুলি দেখল, তার মুখখানা বিরাট লম্বা হয়ে গেছে। কান দুটো টেনিস র‍্যাকেটের মতন, নাকের ফুটো দুটো রাস্তার গর্তের মতন!

আর রণজয় দেখল, তার শরীরচা চেপ্টে একেবারে ছোট্ট হয়ে গেছে। মুখখানা একটা বাচ্চা কচ্ছপের মতন। নাক আর কান দেখাই যায় না!

গুটুলি চেঁচিয়ে বলল, ওরে বাবা, আমি এত লম্বা হতে চাই না!

রণজয় বলল, আমি এত বেঁটে হতে চাই না!

দু'জনে এই কথা বলে চিৎকার করতে লাগল। আর হাততালি দিয়ে হাসতে লাগলেন বৃদ্ধ।

একটু পরে বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, তবে, তোমরা কী চাও?

ওরা দুজনেই বলল, আগের মতন করে দিন। আগের মতন করে দিন!

বৃদ্ধ আবার আলো নিভিয়ে দিলেন। দরজা খুলে দিয়ে বললেন, যাও, বাড়ি যাও! শুধু শুধু আমাকে এত খাটালে। আমার বাড়ির সামনে অনেক ভাঙা ইট আর জঞ্জাল জমে আছে। কাল এসে সাফ করে দিয়ে যেও!

রণজয় বলল, নিশ্চয়ই দেবো! কিন্তু কী ব্যাপারটা হল বলুন তো? আমরা দুজনেই বদলাবদলি হয়ে গিয়েছিলাম! গুটুলি খুব লম্বা আর আমি অত বেঁটে! আবার ঠিক জায়গায় ফিরে এসেছি?

বৃদ্ধ বললেন, কনভেক্স আর কনকেভ!

রণজয় অবাক হয়ে বলল, তার মানে?

বৃদ্ধ বললেন, যাও যাও বাড়ি যাও, আমাকে আর বেশি খাটিও না! বাড়িতে ডিকশনারি আছে? মানে দেখে নিও!

তারপর তিনি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন!

হরি পণ্ডিত

লীলা মজুমদার

পুজোর ছুটিতে পশ্চিমে—যাকগে জায়গাটার নাম করলাম না—দাদুর বাড়ি গিয়ে ভজু লক্ষ্য করল যে পাশের বাড়িটা এবাড়ি থেকে দেখা যায় না। সেখানে হরি পণ্ডিত থাকেন, দাদুর সঙ্গে নাকি ছোটোবেলায় দারুণ ডাংগুলি খেলতেন, দাদুর প্রাণের বন্ধু। তারপর অনেক বছর ছাড়াছাড়ির পর বুড়ো বয়সে আবার পাশাপাশি থাকতে এসেছেন।

হরি পণ্ডিত রোজ-রোজ যখন তখন দাদুর কাছে টাকাকড়ি চান। দাদুও যা পারেন দেন। কেউ কিছু বললে বলেন, 'আহা! ও তো আর নিজের খাওয়া পরার জন্য নেয় না—সে তো আমি এমনিতেই দিয়ে থাকি—এ টাকা দিয়ে ও এক অভাবনীয় গবেষণার কাজ করছে।'

ভজু বলল, 'কি অভাবনীয় গবেষণা দাদু? মরা মানুষ জ্যান্ত করবার গবেষণা?'

দাদু শিউরে উঠলেন, 'আরে না না, তার চেয়েও ঢের গুরুতর ব্যাপার। ঠিক অর্ধেক কাজ হয়েছে, বাকি অর্ধেক না হলে কাউকে কিছু বলা যায় না। বললে সর্বনাশ হবে!'

এ-কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল। দাদু একটু চটে গেলেন। বললেন, 'তা তোরা হাসতে পারিস। কিন্তু অদ্ভুত মাথা ওর। পৃথিবীতে হেন জায়গা নেই যেখানে গিয়ে ও গবেষণা না করেছে, খেতাব মেডেল পুরস্কার না পেয়েছে। সে-সব বুঝবার মতো বিদ্যেবুদ্ধি তোদের থাকলে তবে তো। এখনো যেটা নিয়ে কামড়ে পড়ে আছে সেটা শেষ করতে পারলে পৃথিবীতে যুগান্তর ঘটিয়ে দেবে। তোদের নিউক্লিয়ার বোমা-ফোমা নস্যাৎ হয়ে যাবে। অথচ সম্পূর্ণ অহিংস। এতটুকু চিহ্ন কেউ খুঁজে পাবে না। দুঃখের বিষয়, টাকার অভাবে কাজটা শেষ করতে পারছে না।'

এই বলে দাদু এমনি জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন যে টেবিলের ওপর রাখা 2-3 দিনের খবরের কাগজ ফড়ফড় করে উঠল।

ভজুর মামাতো ভাই পল্টু বলল, 'তাহলে এখন এ-কথা কেন?' দাদুর কি দুঃখ, 'আরে' তাই তো বলছি। গবেষণা গবেষণা করে খেপে গেল। চাকরিবাকরি করল না, বিয়ে-থাও করল না। পূর্ব বাংলায় জমিদারি ছিল। সেখান থেকে টাকা আসত। নিজে না খেয়ে না পরে, সব টাকা ঢালত গবেষণায়!'

'গবেষকরা তো সরকারের কাছ থেকে পায়। উনি নেন না কেন?'

'নিত রে নিত। তাতে কোনো লজ্জা নেই। কিন্তু বছরের পর বছর কাজ করে যাচ্ছে, কোনো ফল দেখাচ্ছে না, কাউকে কিছু ভেঙেও বলছে না—দিয়েছে সরকার সব সাহায্য বন্ধ করে!'

এই বলে দাদু এতক্ষণ চুপ করে থাকলেন যে এরা বিরক্ত হয়ে উঠল, 'বল না তারপর কী হল? গবেষণাটা কী অন্তত সেটুকু বল।'

দাদু উঠে পড়ে চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'ও সাধুচরণ, ও নটবর, পণ্ডিতমশায়ের বিকেলের দুধ-সন্দেশ দিয়ে এলি না!' বলে পিট্টান।

দেখে দেখে গা জ্বলে। আধ ময়লা, ছেঁড়ামতো জামা-কাপড় গায়ে ; এ-বাড়ি থেকে চার বেলা খাবার না গেলে উপোস, সে নাকি আবার পৃথিবীতে যুগান্তর ঘটাবে! থেকে থেকে উঁচুনীচু দু-সারি দাঁত বের করে বলে 'ও লাটু, তোর কাছে বড্ড ঋণী হয়ে যাচ্ছি যে রে। তা ভাবিসনে, সব শোধ করে দেব ; তার চেয়েও ঢের বেশি দেব। আমার গবেষণার ফল-পাকড় তোর এই নাতি দুটোকে দিয়ে যাব—'

সঙ্গে সঙ্গে ভজু পল্টু পণ্ডিতমশায়ের কাঁধে ঝুলে পড়ল, 'বলুন, পণ্ডিতমশাই, কীসের গবেষণা। আমরা রোমাঞ্চ-সিরিজ পড়ি কী না, এ-সব ব্যাপার বড্ড ভালো লাগে। যতটুকু করেছেন, ততটুকুই বলুন।'

পণ্ডিতমশাই ঘাড় ঝাঁকি দিয়ে ওদের ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'আঃ, ঝামেলা করো না। সবটা বলতে পারলে যুগ-পরিবর্তন। অর্ধেকটা বললে সর্বনাশ!—ও লাটু আমার ফতুয়াটা পাচ্ছিনে। কী জানি হয়তো—' এই বলে জিব কেটে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। ধাপ্পা দেবার আর লোক পেলেন না?

কিন্তু দাদু কিচ্ছু শোনেন না। উলটে বলেন, 'বড়োলোকের ছেলে, দুর্দিনে পড়েছে, তোরাও যদি ওকে টিটকিরি দিস, আমার কিছু বলবার থাকে না।' মনে হল বেশ দুঃখিত হয়েছেন।

ওরা একদিন সকালে গিয়ে পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি দেখে সেটি স্রেফ একটি ধ্বংষস্তূপ। পল্টু বলল, 'ঘাঁটলে ওর মধ্যে থেকে অশোকের শিলালিপি বেরিয়ে পড়াও বিচিত্র নয়।' গবেষণা হয় গোয়াল-ঘরে। সেটি আষ্টে-পৃষ্টে বন্ধ, দরজা-জানলা লোহার তৈরি—নিশ্চয় দাদুর খরচায়—ভেতর থেকে কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তবু কেমন মনে হচ্ছিল থেকে থেকে মাটিটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। চারপাশের গাছপালাও কেমন শুকনোপানা।

তবু পল্টু বলল, 'বুড়ো হয়ে গাছ মরেছে। গত পঞ্চাশ বছর তো কেউ জল কিংবা সার দেয়নি।' মোট কথা পাখিও চোখে পড়ল না। ওরা বাড়ি ফিরে এসে দাদুকে সে-কথা বলতেই তিনি বললেন, 'হুঁম। ওখানে যেতে মানা করিনি? একেবারেই নিরাপদ নয়। তখন তোদের মা-বাবাদের কী বলব বল দিকিনি!'

ওরা তো হাঁ! ওই শুটকো খেমো লোকটা বেড়াল দেখলে মুচ্ছো যায়—ওর বাড়িতে যাওয়া নিরাপদ নয়! দাদু বলে কী! তবে মাটিটা কাঁপছিল সত্যি, হয়তো ডাইনামো চালাচ্ছেন পণ্ডিত। যা ক্যাবলা দেখতে, ফেটেফুটে যাওয়া বিচিত্র নয়! খুব হাসাহাসি করল ওরা পণ্ডিতকে নিয়ে।

এরপর পর-পর কতকগুলি এমন ব্যাপার ঘটল যে কিছুদিন পণ্ডিতমশায়ের কথা ওদের মনেই হল না। প্রথম দিন আদালত থেকে ক-জন লোক এসে দাদুকে কী সব বলে গেল। শুনে দাদু শুয়ে পড়লেন, খেলেন-দেলেন না, কথাও বললেন না। সন্ধেবেলা জলখাবার খেতে পণ্ডিতমশাই এসে ব্যাপার দেখে বললেন, নিশ্চয় সেই জামিনের ব্যাপার! বলিনি আত্মীয়াই হক আর যে-ই হক, লাখ টাকার জামিন কক্ষনো হয়ো না। লাখ টাকা দিতে হলে ঘটিবাটি বেচতে হবে! তা সে তো শুনলে না!'

ভজু পল্টু তো অবাক। বেশ বলেছেন পণ্ডিত! নিজে এদিকে দাদুর মাথায় হাত বুলিয়ে কম সুবিধে করে নিচ্ছেন না। পণ্ডিতমশাই বলে চললেন, 'আরও হাজার পঞ্চাশেক হলেই আমার এটাও কমপ্লিট হয়। তখন আর দেখতে হবে না। তোর সব দুশ্চিন্তা দূর করে দেব।'

দাদু এতক্ষণে কথা বললেন, 'আর ততদিন?' ভজু পল্টু এক সঙ্গে বলল, 'কেন আমরা আছি, দাদু!' দাদু একটু হাসলেন। হঠাৎ পণ্ডিত বললেন, 'ভালো কথা। তোর আবার ভাবনা কীসের? সেই কিপ্টে মামাতো দাদা না তোকে তার যথাসর্বস্ব লিখে দিয়ে গেছেন! রেডিয়োতে বলল তিনি সগগে গেছেন।'

পণ্ডিতমশাই জল খাবার খেয়ে হাসতে হাসতে বিদায় নিলে ভজু পল্টু বলল, 'সত্যি, দাদ? তোমার মামাতো ভাই তোমাকে সব দিয়ে গেছেন?

দাদু বললেন, 'তার নিজের এক দুর্দান্ত ভাই আছে। জেলে জেলে জীবন কাটায়। চোর, ঠক, ঠ্যাঙাতে—' এই অবধি বলতে না বলতে বাইরে থেকে তিনটে বিশ্রী চেহারার লোক ঢুকল। প্রত্যেকের হাতে ছোরা। দাদু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এ কি, মোহন! তুমি কবে ছাড়া পেলে?'

সবচেয়ে বিশ্রী যার চেহারা, সে কাষ্ঠ হেসে বলল, 'না, পেলে তোমার বোধ হয় সুবিধে হত? এখন ভালোয় ভালোয় সেই তিনজনের সই দেওয়া কাঁচা দানপত্রটি বের করে দাও দিকিনি, নইলে নাতিদের জন্য শোক করতে হবে।'

সঙ্গী দুটি দরজাটা বন্ধ করে তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। বিশ্রী লোকটা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাত পেতে বলল, 'কই, দাও দিকিনি, আমি ধৈর্যের জন্য বিখ্যাত নই।'

দাদু ভজু পল্টুকে বললেন, 'নড়িস নে।' তারপর দেরাজ খুলে দলিল খুঁজতে লাগলেন। মোহন লোকটার তেড়িবেড়ি বেশি, 'ন্যাকামো হচ্ছে নাকি? দাও শীগগির—' তারপরেই মনে হল পেছনের জানলার দিক থেকে এক ঝলক আলো দেখা গেল। চোখ ঘষে ভজু পল্টু দেখল সেই তিনটে লোক অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে দাদু লাফিয়ে উঠলেন, 'হরি! হরি! এ কী কাণ্ড করলে!' বলে ছুটে বেরিয়ে এলেন। চারদিক অন্ধকার, চুপচাপ, কেউ কোথাও নেই!

দাদু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। ডাক্তার, হাসপাতাল, ওষুধপত্র করে বাকি রাতটা কাটল। সেই লোকগুলির কথা কাউকে বলা হল না।

সকালে দাদুকে অনেকটা সুস্থ দেখে, ওরা কৌতূহল রাখতে না পেরে সটাং হরি পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে হাজির হল।

সব শান্ত, চুপচাপ, দু-একটা পাখি ওড়া-উড়ি করছে আর গোয়ালঘরের জায়গাটা একটা ফাঁকা শূন্য মাঠ। হরি পণ্ডিতকেও কোথাও দেখতে পেল না। ওঁরা ভাঙাচোরা বাড়িতে কেউ কোনো দিন ছিল বলে মনে হল না।

সুস্থ হয়ে বাড়ি এসে দাদু ওদের বললেন, 'যা হবার তা হয়ে গেছে। এই নিয়ে তোরা আর কাউকে কিছু বলিস নে। হরির গবেষণা এতটা এগিয়ে ছিল যে আলোর রশ্মি দিয়ে সব কিছুকে অণুতে পরিণত করে দিতে পারত। আবার পড়ে দেবার কাজটি শেষ হয়নি। আর হবেও না।

ভজু পল্টু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কিন্তু উনি গেলেন কোথায়? কত খুঁজলাম, পেলাম না।' দাদু একটা বড়ো খাম খুলতে খুলতে বললেন, 'গেছে মহাশূন্যে। গবেষণার শেষে আঁক মিলছিল না।' এই তো গেল ব্যাপার। বাকি শুধু রইল দাদুর সম্পত্তি পাওয়ার সুখবর। তার অর্ধেক দিয়ে হরি পণ্ডিতের পোড়া বাড়ির জায়গায় একটা বিজ্ঞান কেন্দ্র করে দিয়েছেন।

কান্না নেই

জয়দীপ চক্রবর্তী

বারান্দার এককোণে ব্রজমোহন ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ আকাশ দেখছিলেন। আগেও দেখতেন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে বিশেষ একটা নক্ষত্র অথবা গ্রহ-উপগ্রহের ওপর নজরদারি করবার জন্য। কিন্তু আজকের এই আকাশ দেখাটা একটু অন্যরকম।

ব্রজমোহন ষাট পেরিয়ে গেছেন ক'মাস হল। মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের চাকরি থেকে সদ্য অবসর নিয়ে চলে এসেছেন তাঁর এই গ্রামের বাড়িতে। এখন যেটুকু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, বাড়ির ছোটো ল্যাবরেটরির মধ্যেই। ব্রজমোহন বাইরে বড়ো একটা বেরোন না, আসলে সময়ই পান না। শুধু সকালবেলার উঠি-উঠি রোদ্দুরের মধ্যে ঘন্টাখানেক হাঁটাচলা করার পুরনো অভ্যেসটা তিনি এখনো ছাড়তে পারেননি। আগে একাই বেরোতেন, আজকাল তাঁর সঙ্গী হয়েছে পিকু, এখানে বেড়াতে আসা তাঁর তোরো বছরের নাতি।

আজকে চুপচাপ বসে আকাশ দেখতে দেখতে ব্রজমোহনের পুরনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।... তাঁর ঠাকুমার কথা। অনেকদিন আগে যখন তিনি পিকুর চেয়েও ছোটো, তাঁর ঠাকুমা আকাশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে তাঁকে তারা দেখাতেন, তারা চেনাতেন। কোলের ওপর বসিয়ে নিয়ে বলতেন, 'বিজু, মানুষ হ' ভাই, মানুষকে ভালোবাসতে শেখ। যদি পারিস তবে, একদিন আকাশের তারা হয়ে জ্বলতে পারবি।' ব্রজমোহনের ঠোঁটের কোণে এক অনির্বচনীয় হাসির ঝিলিক খেলে গেল। আত্মহারা হয়ে তিনি হঠাৎ তারাগুলির মধ্যে তাঁর ঠাকুমার মুখ খোঁজার অলীক খেলায় মেতে উঠলেন।

আকাশের গায়ে চোখ বুলতে-বুলতে এক জায়গায় এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন ব্রজমোহন। পশ্চিম আকাশে চাঁদের থেকে হাত পাঁচ-ছয় দূরে একটা বেশ বড়ো এবং উজ্জ্বল নক্ষত্র ক্রমাগত জ্বলছে, নিভছে, বড়ো হচ্ছে, ছোটো হচ্ছে. রং পালটাচ্ছে। ব্রজমোহন দু'হাত দিয়ে চোখ রগড়ালেন। ভুল দেখছেন না তো? কিন্তু তারাটা একই রকম ব্যবহার করতে লাগল তাঁর দিকে চেয়ে। ভারি অবাক হলেন ব্রজমোহন। এমনটা তো কখনো ঘটতে দেখেননি। পড়ি-কি-মরি করে তিনি ছুটলেন তাঁর ল্যাবরেটরির দিকে। তড়িঘড়ি দিক ঠিক করে নিয়ে চোখ রাখলেন টেলিস্কোপের কাচে। কিন্তু কিছুই তাঁর চোখে পড়ল না আর। পশ্চিম আকাশ একেবারে ফাঁকা, শুনশান।

সারারাত ধরে আর ঘুম হল না ব্রজমোহনের। সারাজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা জড়ো করেও ওই ঘটনার কোনো কূল-কিনারা করতে পারলেন না তিনি। তবে একটা ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত যে, ওটা কোনো নক্ষত্র বা গ্রহ-উপগ্রহ নয়। তবে কি...

অন্যদিনের মতো আজও ব্রজমোহন পিকুর হাত ধরে পথে বেরিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আজ তিনি কেমন যেন বিমনা। পথ চলতে প্রায়ই ঠোকর খাচ্ছেন। পিকু বেশ বুঝতে পারছিল, আজ তার দাদু ঠিক স্বাভাবিক নন। অন্যদিন দাদু হাঁটতে-হাঁটতে তার সঙ্গে অনর্গল কথা বলেন, অথচ আজ একেবারে চুপ। সকাল থেকেই গোমড়ামুখে কী যে ভাবছেন মানুষটি!—ব্যাপারটা পিকুর ভালো লাগে না। খানিকটা অভিমানভরেই দাদুর হাত ছাড়িয়ে সে অনেকখানি এগিয়ে যায়। রাস্তা পেরিয়ে টুক করে ঢুকে পড়ে পাশের জঙ্গলে। তারপর আনমনে এগিয়ে যেতে থাকে উদ্দেশ্যহীন, জংলি পথ ধরে। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর পিকুর মনে হল যে, আজ দাদু তার সঙ্গে নেই। এদিকে খেয়ালবশে বনের অনেকটাই ভেতরে ঢুকে পড়েছে সে। এখানে জঙ্গল বেশ ঘন। বড়ো-বড়ো গাছ একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে সোজা ওপরদিকে উঠে গেছে। ঢেকে দিয়েছে আকাশ। এখানে কোনো পাখির ডাকও নেই। কেমন যেন অস্বাভাবিক থমথমে ওই জায়গাটা। পিকুর এবার

গা-ছমছম করে উঠল। সে বুঝতে পারল জঙ্গলের এত ভেতরে ঢুকে পড়াটা তার ঠিক হয়নি। বেশ বিব্রত বোধ করল পিকু। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, দাদু নিশ্চয়ই এতক্ষণে চিন্তা শুরু করে দিয়েছেন তার জন্য। পিকু পেছন ফিরে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

দু-এক পা এগিয়েই পিকু বুঝতে পারল যে, সে পথ হারিয়েছে। আর তখনই তার নজরে পড়ে গেল আশ্চর্য জিনিসটা। টেনিসবলের মতো দেখতে উজ্জ্বল আকাশি রঙের বলটা একটা নীচু ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি মারছিল। পিকু সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গেল জিনিসটার দিকে। কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকে পড়ল ওটার ওপর। তারপর অবাক হয়ে দেখল একটা মৃদু বিপ-বিপ শব্দের সঙ্গে ধীরে ধীরে ওই অদ্ভুত বলটা তার রং পালটাচ্ছে। পিকু দু'হাত দিয়ে তুলে নিল বলটা। চোখের কাছে এনে দেখল ওর ওপর রংবেরঙের অসংখ্য ছোটো-ছোটো বোতাম একটা অদ্ভুত জ্যামিতিক নকশার আকারে সাজানো রয়েছে। কোনো কিছু না ভেবেই পিকু হঠাৎ একটা সবুজ বোতাম টিপে দিল।

ব্রজমোহনের হঠাৎ খেয়াল হল পিকু অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে নেই। ঠিক কতক্ষণ আগে যে ছেলেটা একা হয়ে গেল, মনে করতে পারলেন না তিনি। তবুও মনে মনে হিসেব কষে দেখলেন অন্নত ঘন্টাখানের হয়ে গেছে পিকু তাঁর কাছছাড়া। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন ব্রজমোহন। ছেলেটা তো এমন করে না কখনো! এদিকে রোদ চড়ে গেল, ফেরার সময়ও পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। রাস্তার দু'দিকে যতদূর চোখ যায় তার মধ্যে পিকুকে খুঁজে পেলেন না তিনি। দু'পাশের জঙ্গলের দিকে চেয়ে এবার বেশ ভয় পেয়ে গেলেন ব্রজমোহন। ছেলেটা ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল না তো! যতটা গলা তোলা যায় ততখানি গলা চড়িয়ে জঙ্গলের দিকে চেয়ে তিনি ডাক ছাড়লেন, 'পিকু-পিকা, ই...'

জঙ্গলের গাছে গাছে ঠোক্কর খেয়ে সেই ডাক প্রতিধ্বনি তুলল, কিন্তু পিকুর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে-দিতে বাড়ির পথ ধরলেন ক্লান্ত ব্রজমোহন। ভাবলেন, পিকু এতক্ষণে বাড়ি ফিরে গেছে নিশ্চয়ই।

বাড়ি ফিরে যখন শুনলেন তাঁর নাতি ফিরে আসেনি, আর ঘড়ির কাঁটাও চলতে-চলতে প্রায় এগারোটায় গিয়ে পৌঁছল, ব্রজমোহন রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন। চুপচাপ নিজের ল্যাবরেটরিতে ঢুকে টেবিলের ওপর মাথা রেখে তিনি ভাববার চেষ্টা করলেন এর পর কী করা উচিত। হঠাৎ তাঁর কানের কাছে একটা অদ্ভুত একটানা আওয়াজ শুনতে পেলেন। একসঙ্গে কয়েকশো মশার সম্মিলিত ওড়ার শব্দের মতো তীক্ষ্ণ। ব্রজমোহনের মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করল। মনে হল এই একটানা শব্দের স্রোত তাঁর মাথার মধ্যে ঢুকে কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেতে লাগল। তারপর একসময় একেবারে থেমে গেল। ব্রজমোহন আবিষ্ট হয়ে ভাববার চেষ্টা করছিলেন ব্যাপারটা কী হল, এমন সময় তাঁর মাথার মধ্যে কে যেন সুরেলা গলায় কথা বলে উঠল, 'ব্রজমোহনবাবু, নাতির জন্য কী আপনার খুব চিন্তা হচ্ছে?'

ব্রজমোহন হঠাৎ মাথার মধ্যে এই কণ্ঠস্বর শুনে ভীষণ রকম চমকে উঠলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি মনস্থির করে ফেললেন যে, ঘাবড়ে গেলে চলবে না। কণ্ঠস্বর যারই হোক না কেন, সে তাঁর নাতির প্রসঙ্গে কথা বলছে।

ব্রজমোহন শান্ত গলায় বললেন, 'তা তো একটু হচ্ছেই, হওয়াটাই স্বাভাবিক কিনা!'

কণ্ঠস্বর একই রকম সুরেলা গলায় বলল, 'চিন্তা করে লাভ নেই, সে আর ফিরবে না।'

ব্রজমোহন থতোমতো খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

'আমরা তাকে নিয়ে গেছি।' তার মাথার মধ্যে থেকে উত্তর এল।

'আপনার পরিচয় জানতে পারি?' ব্রজমোহন কাঁপা-কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

'জানলেও বুঝতে পারবেন না।'

'তবু জানতে চাই।'

'আমরা মগজ। আপনাদের থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে আমাদের দেশ।'

ব্রজমোহন ঠিক ধরতে পারলেন না ব্যাপারটা। তাই প্রসঙ্গ থেকে সরে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'পিকুকে নিয়ে আপনারা কী করতে চান?'

'পরীক্ষা।' মগজ ছোট্ট উত্তর দিল।

'কী পরীক্ষা?' ব্রজমোহন জানতে চাইলেন।

'আমি জানি না।'

'কে জানে?'

'মগজ ওয়ান।'

'আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বলুন।' মগজ চুপ করে গেল।

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতা। তারপরেই ব্রজমোহনের মাথার মধ্যে সুরেলা কণ্ঠ আবার কথা বলে উঠল। 'মগজ ওয়ান বলছি।'

ব্রজমোহন অবাক হলেন। আগের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে এর কোনো তফাত নেই।

'আমাদের বৈশিষ্ট্যগত কোনো পার্থক্য আপনি খুঁজে পাবেন না।' ব্রজমোহন কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই মগজ ওয়ান উত্তর দিয়ে দিল। তারপর বলল, 'আপনার নাতি সম্পর্কে কী জানার আছে, তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।'

ব্রজমোহন মনে-মনে নিজেকে তৈরি করে নিলেন। তারপর বেশ কড়া সুরেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার নাতিকে নিয়ে আপনারা কী করতে চান?'

'আপনার নাতিকে নিয়ে আমরা কিছু করতে চাই না।' মগজ ওয়ান উত্তর দিল, 'আমরা শুধু ওর হৃদয়টাকে নিয়ে আমাদের গবেষণাগারে রেখে দিতে চাই।'

'মানে?' বেশ ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্রজমোহন।

'তা হলে শুনুন, আপনাকে বিস্তারিত বলি।' মগজ ওয়ান তার কথা শুরু করল।

'আমাদের ইতিহাস আপনাদের চেয়ে অনেকই প্রাচীন। আমাদের বিজ্ঞানও। আপনাদের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আজ যে জায়গায়, আমরা সেই অবস্থা কাটিয়ে এসেছি কয়েক শতাব্দী আগেই। ক্রমাগত জ্ঞানচর্চার ফলে এখন আমাদের শরীর ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লুপ্ত হয়ে গেছে। আমরা আজ শুধুই মগজে রূপান্তরিত। আমাদের খাদ্যাভাব নেই। স্থানাভাব নেই। আমাদের অভাব নেই, হিংসা নেই। আমাদের কেবল চিন্তা আছে, বুদ্ধি আছে, আর আছে কাজ। কর্মপদ্ধতিতে আমরা যন্ত্রসভ্যতাকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। আমরা এক-একজন মগজ আপনাদের কয়েক লক্ষ কম্পিউটারের চেয়েও দ্রুত চিন্তা করতে পারি।'

ব্রজমোহন এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে সব কথা শুনে যাচ্ছিলেন। এবার গলাখাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা আমাদের চেয়ে সত্যিই যদি এতখানি এগিয়ে, তবে আমাদের এই পৃথিবীতে এসে হানা দিলেন কেন? আর কেনই বা জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের পিকুকে?'

মগজ ওয়ান কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আমরা কোনো কিছুই জোর করে করি না ব্রজমোহনবাবু। আপনার নাতিকেও আমরা নিশ্চয়ই আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব, যদি সে আমাদের সঙ্গে যেতে না চায়।'

ব্রজমোহনবাবু যেন কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'ও কিছুতেই এই সোনা পৃথিবী ছেড়ে যেতে চাইবে না। পৃথিবীর ভালোবাসার টান তার অভিকর্ষ বলের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। দেখবেন ওকে আপনারা কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবেন না।'

পিকুর যখন জ্ঞান ফিরল, সে একেবারে হতভম্ব! কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর আস্তে-আস্তে তার সংবিৎ ফিরল। মনে পড়ে গেল সবকিছু। জঙ্গলের মধ্যে পথ হারানো, রহস্যময় রঙিন বল, বোতাম টেপা...

বোতামটা টিপে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী যেন হয়ে গেল—পিকুর মনে পড়ল। মনে হয়েছিল কে যেন টেনে ওকে শূন্যে তুলে নিয়েছিল। ব্যাস, তারপরেই সব ঝাপসা!

পিকু ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। ওর মনে হল ও যেন ঠিক থেমে নেই। পিকু সন্তর্পণে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। দেখল ধোঁয়ার মতো একটা স্বচ্ছ আবরণ তাকে ঘিরে রয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও ও সেই আবরণ ছুঁতে অথবা ভেদ করতে পারল না। ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল পিকু। তন্ময় হয়ে ভাববার চেষ্টা করল ও কোথায় আছে। হঠাৎ মাথার মধ্যে একটা একটানা তীক্ষ্ণ শব্দের স্রোত অনুভব করল ও। ক্রমশ সেই শব্দগুচ্ছ কথায় রূপান্তরিত হয়ে গেল।

'পিকু তুমি ঠিক আছ তো?'

পিকু মজা পেল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে, আমার নাম জানলেন কেমন করে?'

'আমরা সব জানতে পারি।' পিকুর মাথার মধ্যের শব্দতরঙ্গ কথা বলে উঠল।

'আপনি কী জানেন আমি এখন কোথায় আছি?' পিকু জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের গবেষণাগারে, তোমাদের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে।'—উত্তর এল।

পিকুর ঠিক বিশ্বাস হল না। মনে হল সে বোধ হয় স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু তার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। মাথার মধ্যে সুরেলা কণ্ঠস্বর কথা বলে উঠল, 'তুমি মোটেই স্বপ্ন দেখছ না পিকু, সামনে তাকাও—' পিকু সামনে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। অসংখ্য রঙিন তারা মিটমিট করছে তার সামনে, কিছুদূরে দু-দু'খানা চাঁদ জ্বলজ্বল করছে আকাশের গায়ে। পিকুর ভালোলাগার মরে যেতে ইচ্ছে করল।

'তুমি এখানে থাকতে চাও পিকু?' তার মাথার মধ্যে থেকে প্রশ্ন ভেসে এল।

'চাই।' পিকু স্বপ্নাবিষ্টের মতো জবাব দিল।

ব্রজমোহনের কানের মধ্যে পিকুর গলায় এই 'চাই' শব্দটা যেন হঠাৎ প্রতিধবনিত হয়ে শুরু করল। খানিকটা অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'এটা কী পিকুর গলা?'

'হ্যাঁ, এটা পিকুরই গলা। ও আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজি হয়েছে।' মগজ ওয়ান উত্তর দিল।

হতাশ বলেন ব্রজমোহন। বিষণ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ওকে নিয়ে কী পরীক্ষা করতে চান আপনারা?'

মগজ ওয়ান বলতে শুরু করল—'আসলে দীর্ঘদিন ধরে আমরা একটা জিনিসের বড়ো অভাব বোধ করছি, একটা অনুভূতি, যাকে আপনারা ভালোবাসা বলেন। আমরা মগজ, আমাদের হৃদয় নেই। তাই আমাদের দেশে ভালোবাসাও নেই। অথচ আমাদের মেধা আমাদের জানাচ্ছে যে, ভালোবাসা না থাকলে আমরাও হয়তো একদিন ধবংস হয়ে যাব। আমরাও আজ বুঝতে পারছি যে আমাদের দেশে প্রতিটি মগজের মধ্যে ভালোবাসার অনুভূতি যোগ করা উচিত। তাই আমরা পৃথিবীতে এসেছিলাম ভালোবাসার উপাদান-মৌল সংগ্রহ করতে।'

ব্রজমোহন বিস্ময়-জড়ানো কণ্ঠে বললেন, 'তারপর?'

মগজ ওয়ান বলে চলল, 'পৃথিবীতে এসে আমরা কিছুটা হতাশই হলাম। দেখলাম ভালোবাসার আকাল শুরু হয়ে গেছে পৃথিবীতেও। দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করে আমরা বুঝলাম যেটুকু ভালোবাসা এখানে এখনও বেঁচে আছে তার সিংহভাগটাই লুকনো আছে ওই গ্রহের শিশুদের হৃদয়ে। আমরা প্রায় নিশ্চিত যে, প্রকৃত ভালোবাসার নির্যাস আমরা পেতে পারি কেবলমাত্র শিশুদের হৃদয় থেকেই।' মগজ ওয়ান কয়েক মুহূর্ত চুপ করল। তারপর বলল, 'পিকুর হৃদয় থেকে ভালোবাসার নমুনা সংগ্রহ করে আমাদের গবেষণাগারে তার বিশ্লেষণ করে আমরা আমাদের দেশে কৃত্রিম ভালবাসা তৈরি করতে চাই।'

ব্রজমোহনের মনটা বড়ো ভারী হয়ে গেল। বুকটা তাঁর টনটন করে উঠল পিকুর জন্য। তীব্র বেদনায় হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'পি—কু—'

পিকুর বেশ ভালো লেগে গিয়েছিল জায়গাটা। একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধে মশগুল হয়ে উঠেছিল সে। হঠাৎ তার বুকের মধ্যে থেকে তীব্রস্বরে কে যেন ডেকে উঠল, 'পিকু—পিকা-ই—'

চমকে উঠল পিকু। এ ডাক চার চেনা ; এই কণ্ঠস্বর তার দাদুর। মুহূর্তে সব আনন্দ মুছে গেল তার। আকাশের সব রঙিন তারা একটার পর একটা খসে পড়ল তার চোখের সামনে থেকে। বুকের ভেতর থেকে এটা তীব্র কান্না পাক খেতে খেতে ওপরে উঠে এসে মুহূর্তে ভাসিয়ে দিল দু'চোখ। কে যেন বুকের ভেতর ধাক্কা মারতে মারতে ক্রমাগত বলতে লাগল, 'পিকু, তুমি একা,—পিকু তুমি একা—'

কান্নাভেজা গলায় চিৎকার করে উঠল পিকু, 'আমাকে ফিরিয়ে দাও, আমাকে ফিরিয়ে দাও, আমি পৃথিবী ছেড়ে যেতে চাই না—আমি আমার দাদুকে ছেড়ে যেতে চাই না—আমি আমার দাদুকে ছেড়ে যেতে চাই না—'

মগজরা এমনটা ভাবেনি। পৃথিবী থেকে তারা ভালোবাসা সংগ্রহ করতে এসেছিল। তারা ভাবতেও পারেনি ভালোবাসার জন্য মানুষকে কত কষ্ট পেতে হয়, কী পরিমাণ চোখের জল ঝরাতে হয়। কষ্টকে ওরা ভয় পায়, কান্নাকে ওরা ভয় পায়। ভালোবাসার লোভে পৃথিবীতে এসে ওরা ওদের দেশে কান্না বয়ে নিয়ে যেতে চায় না।

ব্রজমোহনের মাথার মধ্যে মধ্যে কথা বলে উঠল, 'ব্রজমোহনবাবু, আপনার নাতিকে ফিরিয়ে নিন, ও কাঁদছে। আমরা কান্না সহ্য করতে পারি না।'

পিকুর চারপাশ থেকে স্বচ্ছ ধোঁয়ার আবরণটা ফিকে হতে-হতে একেবারে মিলিয়ে গেল। সে চোখ খুলে দেখল সামনে তার দাদু দাঁড়িয়ে আছেন, চোখে জল। পিকু একছুটে তার দাদুকে জড়িয়ে ধরল দু'হাত দিয়ে।

পশ্চিম আকাশে একটা উজ্জ্বল আলো ক্রমশ ছোটো হতে-হতে একেবারে মিলিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন ব্রজমোহন। তারপর পিকুকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'দাদু, কান্না আছে বলেই আমরা একসঙ্গে আছি, দুঃখ আছে বলেই আমরা এত আনন্দে বেঁচে আছি।'

রং বদলায়

সঙ্কর্ষণ রায়

জিপে জয়ন্তী পাহাড়ের জোয়াই শহর থেকে শিলচরের দিকে যাচ্ছি। চেড়াই বেয়ে ওঠার পরে উতরাই দিয়ে নেমে যেতে শুরু করেছি। শিলং থেকে জোয়াই পর্যন্ত পাইনবনের মধ্য দিয়ে এসেছি। জোয়াই থেকে শিলচরের পথে এই উতরাইয়ের মধ্যে বনের চেহারা বদলাতে শুরু করেছে। পাইন গাছের জায়গা নিয়েছে বড়ো আকারের লাম্পাতি ও পানিসাজ। তাদের ফাঁকে-ফাঁকে আছে বাঁশগাছ, ফার্ন ও অর্কিড।

একটি সরু উপত্যকার মধ্যে এই বন যেখানে খুব ঘন হয়ে উঠেছে, সেখানে একজন খাসিয়া বুড়ি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত তুলে আমার জিপ থামাল। গাড়ি থেকে নেমে আমি বুড়িকে প্রশ্ন করি, 'কী ব্যাপার, আমার জিপ থামালে কেন? কী চাও তুমি?'

'আমার ছেলেকে চাই,' বুড়ি ব্যাকুল স্বরে বলল, 'এই বনের মধ্যে আমার ছেলে হারিয়ে গিয়েছে। দু'দিন আগে ওই ঝরনার ধারে গিয়েছিল সে, সেখান থেকে সে উধাও হয়ে গিয়েছে।'

বলে, সে তার ডান হাতটা তুলে রাস্তার ধারের ঝরনাটিকে দেখাল।

'তোমরা থাক কোথায়?' আমি প্রশ্ন করি।

'এখানেই,' বুড়ি জবাব দিল, 'এখানে এই বনের মধ্যে আমার ছেলের সঙ্গে ক্যাম্প করে আছি। এখানে আমার ছেলে জড়িবুটি, শ্যাওলা, আগাছা ইত্যাদির নমুনা তুলছে। পিলিংয়ে ওদের ল্যাবরেটরি আছে, এইসব নমুনা সেখানে নিয়ে গিয়ে সে পরীক্ষা করবে।'

'এমনও তো হতে পারে যে, তোমার ছেলে নমুনাগুলি নিয়ে সোজা শিলং চলে গিয়েছে....।'

'না-না, কক্ষনো না। আমাকে না বলে সে কোথাও যাবে না। তা ছাড়া যেখানেই যাক, তার স্কুটারে চেপে যাবে। স্কুটার তো তাঁবুর বারান্দাতেই রয়ে গিয়েছে। এই বনের মধ্যেই আছে সে—ওকে খুঁজে বের কর...।'

'বনের মধ্যে আমি পাথর খুঁজছি, মানুষ খোঁজা তো আমার কাজ নয়।

'পাথর খোঁজার সঙ্গে ওকেও খুঁজতে পার, কেননা ও পাথরের কাছাকাছি ছিল। চল, তোমাকে জায়গাটা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বলে বুড়ি, আমাকে হাত ধরে জিপ থেকে নামাল, তারপর টেনে নিয়ে চলল গাছপালার আড়ালে চাপা-পড়া ঝরনাটির দিকে।

ঝরনার ধারে যেখানে সবুজ শ্যাওলা ধূসর রঙের পাথরকে সরের মতো ছেয়ে ফেলেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'এখানেই ছিল সে। আমি ওকে ছুরি দিয়ে শ্যাওলা কেটে তুলতে দেখেছি। সে আমাকে বলেছিল যে, এই পাথরের স্তূপ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ সেন্টিমিটার অন্তর-অন্তর শ্যাওলার নমুনা তুলে নিয়ে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করবে।'

'কেন?' আমি প্রশ্ন করি, 'কী করে শ্যাওলা পরীক্ষা করে?'

'ওই শ্যাওলার মধ্যে নাকি নতুন ধরনের ব্যাকটিরিয়া আছে। এই ব্যাকটিরিয়াকে সে চিনে নিতে চায়। পরশু দিন ওর সঙ্গে এখানে এসেছিলাম, আমার ইচ্ছে ছিল ওকে ওর কাজে সাহায্য করি। কিন্তু ও বলল যে, একাই ওর কাজ করবে। তারপর আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিল ক্যাম্পে, কিন্তু ফিরে এল না...।' বলতে বলতে বুড়ির বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

ঝরনার কাছে গিয়ে শ্যাওলা-ধরা পাথরের স্তূপ ও লতাঝোপের মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজি আমি। পাথরের পর পাথর, ফার্ন, অর্কিড. ঘাস ও ঘাসফুলের পাশাপাশি রড়োডেনড্রনের গুচ্ছ চোখে পড়ে। কিন্তু জনপ্রাণীর কোনো চিহ্ন নেই। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, একটা টিকটিকি বা গিরগিটিও নেই, পোকামাকড়, পিঁপড়েও দেখছি না, সবার ওপরে নেই কোনো পাখি।

হঠাৎ মনে এল রবীন্দ্রনাথের একটি গানের প্রথম পঙক্তি : বনে যদি ফুটল কুসুম, নেই কেন সেই পাখি?'

সত্যিই তো, বনে এত ফুল ফুটেছে, কিন্তু পাখি নেই কেন? পোকামাকড়, টিকটিকি, কাঠবিড়ালি, এরাই বা কোথায়? এমন তো হওয়ার কথা নয়। বনের মধ্যে গাছপালার সঙ্গে পশুপাখি, কীটপতঙ্গের সহাবস্থান তো স্বাভাবিক ব্যাপার। তারা সব গেল কোথায়? গেলই বা কেন?

তারা নেই বলে কী বুড়ির ছেলেও নেই?

বুড়ির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'এখানে ঠিক কোথায় ছিল তোমার ছেলে? মানে কোথায় সে শ্যাওলা তুলছিল?'

'এই তো এখানে,' বলে বুড়ি রড়োডেনড্রনের গুচ্ছের পাশে একটি পাথরের চাতালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'এই তো লাল ফুলের পাশে কাল পাথর, তার সামনেই...,' বলতে বলতে বুড়ির মুখের কথা মুখেই থেকে যায়, হঠাৎ তার ছোটো-ছোটো চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

'দেখেছ বাছা,' বুড়ি রূদ্ধশ্বাসে বলে ওঠে, 'এখানে লাল ফুল কীরকম বেগুনি হয়ে উঠেছে, ফুলের রং বদলাচ্ছে। কিন্তু ফুলের কী রং বদলায়?'

প্রশ্নটা বিঁধে যায় আমার মনের মধ্যে। ফুল ফোটে, বাতাসে গন্ধ বিলয়, ঝরে পড়ে, কিন্তু তার রং কী বদলায়?

রং বদলানো উচিত নয়, কিন্তু তবু যে রং বদলাচ্ছে তা তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার চোখের সামনে।

'কী রকম ভুতুড়ে ব্যাপার দেখেছ তো,' বুড়ির গলার স্বর কেঁপে ওঠে, 'ফুলের রং বদলায়, সঙ্গে-সঙ্গে আমার ছেলে অদৃশ্য হয়। নিশ্চয়ই কোনো ডাইনির কীর্তি এটা।'

'ঠিক বলেছ,' আমি বললাম, 'তবে এ-ডাইনি হচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস। সালফার ডায়োক্সাইড নামে এক ধরনের বিষাক্ত গ্যাস আছে, গন্ধক পুড়ে তার সৃষ্টি। সালফার ডায়োক্সাইড ফুলের রং বদলাতে পারে লাল ফুল তার ছোঁয়ায় ক্রমে-ক্রমে সাদা হয়ে উঠতে পারে। এই গ্যাসের উগ্র গন্ধ সইতে পারেনি। এখানকার পশুপাখি, পোকামাকড়, তোমার ছেলেও হয়তো। আচ্ছা তোমার ছেলের নাম যেন কী?'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'হঠাৎ থ্যাঙ্কস জানাবার কী হল। তোমার ছেলের নাম জানতে চাইছি বলে আমাকে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছ তুমি?'

'না না, আমার ছেলের নামই থ্যাঙ্ক ইউ। বাছা, তুমি কি বলতে চাও-যে, গন্ধক পুড়ে তৈরি হওয়া গ্যাস থ্যাঙ্ক ইউকে অদৃশ্য করে দিয়েছে?'

'না না, তা নয়। আমার মনে হচ্ছে, গন্ধকের গ্যাস সইতে না পেরে পালিয়েছে থ্যাঙ্ক ইউ।'

'পালাল কোথায়?' গ্যাস সইতে পারেনি তো ক্যাম্পে চলে এলেই পারত।'

'ক্যাম্প পর্যন্ত যেতে পারেনি হয়তো।'

'তবে কি পড়ে গিয়েছে নীচের খাদের মধ্যে,' আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে বুড়ি।

'চেঁচিও না,' আমি বললাম, 'দেখছি সে গেল কোথায়। তোমার ছেলেকে দেখার আগে দেখা দরকার গ্যাস এখনও আছে কী না!'

চোখে দেখার আগে গন্ধেই টের পাই যে, গ্যাস আছে। চোখেও দেখি তাকে। সাদা ধোঁয়ার মতো বেরিয়ে আসছে পাথরের স্তর ভেদ করে।

সালফার ডায়োক্সাইডের উৎস তা হলে এই পাথর। পাথরের মধ্যে চাপা-থাকা গন্ধক পুড়ে সালফার ডায়োক্সাইডের সৃষ্টি, পাথরের ফাটল দিয়ে তা বেরিয়ে আসছে।

সালফার ডায়োক্সাইড বেরিয়ে আসছে, কাজেই পাথরের কাছে ঘেঁষতে পারি না। কিন্তু একটু তফাতে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পাথরটাকে চিনতে পারি। বেলেপাথর। বেলেপাথরের স্তরের নীচে কয়লার স্তরের আভাস পাই। এ-অঞ্চলে কয়লার মধ্যে গন্ধক আছে। গন্ধক আছে পাইরাইট রূপে। অর্থাৎ পাইরাইট গন্ধকযুক্ত খনিজ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কয়লার স্তরের মধ্যে গন্ধক পুড়ছে কী করে? পাইরাইট পুড়ছে, তাই গন্ধক পুড়ছে। কিন্তু পাইরাইট নিজের থেকে পুড়তে পারে না। অতএব ধরে নিতে হয় যে, কয়লা পুড়ছে। কয়লার স্তরের সঙ্গে-সঙ্গে পাইরাইট পুড়ছে, পাইরাইটের গন্ধক পুড়ে সালফার ডায়োক্সাইড সৃষ্টি হচ্ছে।

কিন্তু কয়লা পুড়ছে কী করে? কয়লার স্তরের মধ্যে কি স্বতঃস্ফূর্ত দহন চলছে? এ-প্রশ্নের জবাবের চেয়ে অবশ্য থ্যাঙ্ক ইউকে খুঁজে বের করা অনেক বেশি জরুরি। কোথায় থ্যাঙ্ক ইউ? ঝোপেঝাড়ে, পাথরের স্তূপগুলির আনাচে-কানাচে বিস্তর খোঁজাখুঁজি ঝরনাতলার খাদের নীচে নেমেও দেখি। কিন্তু কোথাও কোনো চিহ্ন নেই তার। চিৎকার করে ডাকি, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।'

উত্তরে শুধু প্রতিধ্বনি ফিরে আসে, থ্যাঙ্ক ইউ।

হঠাৎ বুড়ি উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'থ্যাঙ্ক ইউ নেই, কিন্তু তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ আমার কানে আসছে। মনে হচ্ছে থ্যাঙ্ক ইউ ঘুমিয়ে পড়েছে। কাছেই কোথাও ঘুমিয়ে আছে সে।'

বুড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাস শুধু নয়, চাপা একটা গোঙানির মতো আওয়াজও আমার কানে এল।

এই শব্দ অনুসরণ করে রডোডেনড্রনের গুচ্ছের পাশে একটা গুহার সামনে এসে দাঁড়াই। বুড়ি বলল, 'এই গুহার মধ্যেই সে আছে বলে মনে হচ্ছে। চলো, ভেতরে ঢুকি।'

'না,' বুড়ির হাত ধরে আমি বললাম, ''সালফার ডায়োক্সাইডের গন্ধ এখানেও পাচ্ছি, এর মধ্যে ঢোকা নিরাপদ নয়।''

'কিন্তু থ্যাঙ্ক ইউ যে ঢুকে পড়েছে!'

'একটু অপেক্ষা করো বুড়িমা। জোয়াই থেকে গ্যাস-মাস্ক নিয়ে আসি, তারপর ঢুকব এর মধ্যে।'

জোয়াই থেকে গ্যাস-মাস্ক ছাড়া আমার এক ডাক্তার বন্ধুকে নিয়ে আসি। গ্যাস-মাস্ক মুখে দিয়ে আমরা দুজনে ঢুকে পড়ি গুহার মধ্যে।

আন্দাজে ভুল করেনি বুড়ি, ওই গুহার মধ্যেই ছিল থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু ঘুমিয়ে নয়, অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল গুহার বেলেপাথরের মেঝের ওপরে।

থ্যাঙ্ক ইউয়ের জ্ঞান ফেরার পরে তাকে আমি প্রশ্ন করি, 'তুমি কী সালফার ডায়োক্সাইড থেকে বাঁচার জন্য গুহার মধ্যে ঢুকেছিলে?'

'না,' মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে জবাব দিল থ্যাঙ্ক ইউ, 'গুহার মধ্যেও গ্যাস আছে, কাজেই গ্যাস থেকে বাঁচার জন্য গুহার মধ্যে ঢুকিনি। রডোডেনড্রন ফুলের মতো পাথরের গায়ে গজানো শ্যাওলারও রং বদলেছে সালফার ডায়োক্সাইডের ছোঁয়া লেগে। ওই গুহার মধ্যে শ্যাওলার মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ব্যাকটিরিয়া আছে বলে আমার ধারণা।'

থ্যাঙ্ক ইউয়ের ধারণা যে ভুল নয়, তার প্রমাণ তাদের শিলংয়ের ল্যাবরেটরিতে পায় সে। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার করে যে সালফার ডায়োক্সাইড গ্যাসের প্রভাবে রং-বদলানো শ্যাওলার মধ্যে। এ এক অদ্ভুত ধরনের ব্যাকটিরিয়া, যার খাদ্য গন্ধক। কয়লাকে গন্ধকযুক্ত করার জন্য কাজে লাগানো হতে থাকে এই ব্যাকটিরিয়া।

উড়ুক্কু লাটিম ও কাটরুবুড়ো

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সবুজ পাহাড়ের ঢালে খাঁজকাটা কয়েক টুকরো ভুঁই। পাশ দিয়ে ঝরঝর করে নেমে যাচ্ছে একটা ঝরনা। সেই জলে ভুঁইগুলির চাষ করে লোকটা। উঁচু দিকটায় একটা কাঠ-বাঁশ-খড়ের টং। সেটাই তার ঘর।

সকালে কাঁধে বন্দুক আর ব্যাগে ডজনখানেক ছররা গুলি নিয়ে বেরিয়েছিলুম তিতির মারতে। সঙ্গে আমার প্রিয় কুকুর জিম। নীচের উপত্যকায় ঘাসের জঙ্গলে নাকি অনেক তিতিরের ডেরা।

ঝরনার ধারে যেতেই লোকটার সঙ্গে দেখা। মাথায়-সাধুবাবাদের মতো চুড়োবাঁধা প্রচণ্ড সাদা চুল আর তেমনি দাড়ি। খালি গা, খালি পা, পরনে একফালি ন্যাতার মতো কাপড় জড়ানো। হাতে খুরপি। ঝুপসি জামুনগাছের তলায় দাঁড়িয়ে তাকে একটা সিগারেট দিলুম। নিজে একটা ধরিয়ে নিলুম। তারপর তিতিরের খবর জানতে চাইলুম। তখন সে ভাঙা-ভাঙা হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে একটা অদ্ভুত গপ্প শোনাল।

নীচের সমতল উপত্যকায় দিব্যি চাষ করা যেত। কিন্তু এই যে সে পাহাড়ের গায়ে উঠে এসে ভুঁই করেছে কেন, সেটা আমার জানা উচিত, বিশেষ করে আমি যখন নীচের ঘাসের জঙ্গলে তিতির মারতে যাচ্ছি। বছর কয়েক আগে ওই ঘাসজমি ছিল তার চাষের ভুঁই। ফসল ফলত অঢেল। ঝরনাটা ওখানে নদী হয়েছে। সেই নদীর চড়ায় এক রাত্তিরে স্পষ্ট দেখল কী, একটা পেল্লায় লাটিমের মতো আজগুবি জিনিস আকাশ থেকে নেমে এল। বনবন করে সেটা ঘুরছিল। ঘুলঘুলির মতো ফোকর ছিল লাটিমটার চারদিকে। আর সেখান দিয়ে ঠিকরে পড়ছিল রং-বেরঙের আল। কিছুক্ষণ তুলকালাম ঝড় বইছিল। অথচ আকাশ ফাঁকা। ঝলমলে তারা জ্বলছে। ঝড়টা থামলে লাটিমটার ঘুরপাক থামল, অথবা লাটিমটার ঘুরপাক থামলে ঝড়টা থামল। তখন সাহস করে লোকটা টং থেকে নেমে নদীর ধারে গেল ব্যাপারটা জানতে। সেইসময় লাটিমের ফোকর থেকে দুটো বেঁটে, পেটমোটা, কালো দু'ঠেঙে প্রাণী বেরোল। তারপর সটান তার কাছে চলে এল। নদীতে তখন জল ছিল না। তারা তার কাছ-বরাবর এল। তারপর যা বলল, তা হচ্ছে, কে-ক্কে-ক্কে-ক্কে...কি-ক্কি-ক্কি-ক্কি...ডা-ড্ডা-ড্ডা-ড্ডা...ডি-ড্ডি-ড্ডি-ড্ডি...

'বল কী! তা, তুমি কী বললে?'

'আমি কী বলব?' লোকটা একটু হাসল, 'আমি তো ভয়ে কাঠ। মুখে কথাটি নেই। ওরা একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। লাটিমটার ফোকর গলিয়ে ঢুকে পড়ল। তখন আবার সেটা বনবন করে ঘুরতে লাগল। ফোকর দিয়ে তেমনি রং-বেরঙের আল ঠিকরে পড়তে থাকল, তারপর ফের শনশন করে দারুণ ঝড়। লাটিমটা মাটিছাড়া হয়ে চোখের পলকে উড়ে আকাশের তারার সঙ্গে মিশে গেল। ঝড়টাও থেমে গেল।'

লোকটা একা এই পাহাড়-জঙ্গলে থাকে। সে যে গপ্পটা বলল, তা নিশ্চয় 'ইউফো' বলতে যা বোঝায়, তা-ই। এরকম একটা নিরক্ষর লোক, যে জীবনে কখনো শহরে গেছে কী না সন্দেহ, তার মুখে ইউফো-বৃত্তান্ত শুনে আমি তো তাজ্জব। লোকটা আমাকে পইপই করে নীচের উপত্যকায় যেতে বারণ করে চলে গেল। জিম ঝরনার ধারে একটা পাথরে বসে নিশ্চয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিল, এমন তার ভঙ্গি। ডাকলুম, 'জিম, চলে আয়।'

জিম যেন একটু বিরক্ত হয়েই আমার সঙ্গ ধরল। সেই লোকটা তার চাষের ভুঁইয়ে বসে লক্ষ করছিল, আমি কী করি। না, তাকে খুশি করার জন্য নয়, কিংবা ভয় পেয়েও নয়। আমি বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের কাছে ফিরে যাচ্ছিলুম। ওপাশে নীচু টিলার গায়ে তাঁর বাড়ি। সে বড়ো অদ্ভুত বাড়ি। যেন কিউবিক চিত্রকলা। টিলাটা ঘন সবুজ। তার গায়ে ওই বাড়িটায় রং-বেরঙের ত্রিভুজের জটিলতা। বাইরের লোকের পক্ষে দরজা খুঁজে

পাওয়া কঠিন। তা ছাড়া আরও ব্যাপার আছে। দরজা জানা থাকলেই হল না, সেখানে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে হবে। তা হল, 'হিং টিং ছট!' অমনি দরজা খুলবে।

সেই আলিবাবা ও চল্লিশ চোর গপ্পের 'চিচিং ফাঁকে'র মতো আর কী। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত রসিক মানুষ। সেটা কোনো কথা নয়। ওঁর কিছু গোপন কাজকর্মের ব্যাপার আছে। বহু বছর ধরে এই নির্জন জঙ্গলে এলাকার বহু আলোকবর্ষ দূরের কোনো গ্যালাক্সিতে কোথাও সভ্য প্রাণী আছে কি না ঢুঁড়ে-ঢুঁড়ে হন্যে হচ্ছেন। কাজেই তাঁকে এই লাটিম-ইউফোর ঘটনাটি বলা দরকার।

জটিল জ্যামিতিক আঁকিবুকির মতো বাড়িটার দরজার সামনে গিয়ে বললুম, 'হিং টিং ছট! 'অমনি দরজা খুলে গেল। আমরা ঢুকলে বন্ধ হয়েও গেল। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তকে খুঁজে পেলুম ওঁর ল্যাবরেটরিতে। আমাদের দেখে একটু অবাক হয়ে বললেন, 'এত শিগগির ফিরে এলেন যে! পেলেন তিতির?'

বললুম, 'একটা খবর আছে। ঝরনার ধারে একটা লোক ইউফো দেখার গপ্প বলল। তাই শুনে....'

কথা কেড়ে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত বললেন, 'কাটরু তো? ও একটা ধড়িবাজ। উড়ুক্কু লাটিমের গপ্প ও এ-পর্যন্ত অসংখ্য শিকারিকে বলেছে। আসলে ও চায় না, উপত্যকায় কেউ পাখি মারুক। পাখি মারা ওর পছন্দ নয়। আপনি লক্ষ করেননি, পাখিগুলি ওকে ভয় পায় না। ওর কাঁধে বা মাথায় বসে থাকে।'

'কিন্তু ইউফো ব্যাপারটা ওর মতো লোকের কল্পনা করা তো অসম্ভব। ও যে বর্ণনা দিল, তার সঙ্গে অনেক বিলিতি সায়েন্স-ফিকশনে পড়া মহাকাশযানের আশ্চর্য মিল।'

কথাটা বলে আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালুম।

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত একটা কম্পিউটারের সামনে বসে কয়েকটা বোতাম টেপাটিপি করতে করতে বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্তে তিতির মারতে যান। শুধু একটা বিষয়ে সাবধান। সেবারকার মতো মহাজাগতিক কাল-ঘুড়ির পাল্লায় পড়বেন না। আর জিমকে সঙ্গ-ছাড়া করবেন না। ওকে সেবার অনেক কষ্টে উদ্ধার করেছিলুম, মনে আছে তো?'

মনে পড়ে গেল। সে অবশ্য আলাদা গপ্প। একই মফৎসল শহরের বাসিন্দা ছিলুম আমি ও বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত। খেলার মাঠে অবেলায় পড়ে-থাকা একটা কাল-ঘুড়ির ভেতর জিম অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ঘুড়িটা নাকি এক ধরনের খুদে 'ব্ল্যাক হোল'। কোনো দূরের গ্যালাক্সি থেকে উড়ে এসেছিল। শব্দ যেমন রেকর্ড করা যায়, তেমনি জীবজন্তু ওর পাল্লায় পড়লে রেকর্ড হয়ে যায়। কী জটিল সমস্যা! রেকর্ড থেকে শব্দ উদ্ধারের মতো। তখন তাদের উদ্ধার করতে হয়। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত না থাকলে জিমকে আমি ফিরেই পেতুম না।

সেই ঝরনার ধার দিয়ে ফের যেতে যেতে কাটরুবুড়োকে খুঁজলুম। দেখতে পেলুম না। হয়তো টঙে উঠে ছাতুটাতু খাচ্ছে।

জিম খুব উৎসাহী। একটু এগোলেই ধমক দিচ্ছিলুম। বলছিলুম, 'সাবধান জিম! ব্ল্যাক হোল কী সাংঘাতিক জিনিস ভুলে যেও না। একটা বিশাল গ্যালাক্সি কোটি-কোটি বছর বিকিরণ ঘটাতে ঘটাতে যখন ফতুর হয়ে যায়, তখন তার ঘনত্ব বাড়তে বাড়তে আর গুটিয়ে যেতে যেতে এতটুকুনটি হয়ে পড়ে। তখন কী হয় জান? তার নাগালে যা কিছু গিয়ে পড়ে, সে একঝিলিক আল। হোক কী উপ-পারমাণবিক কণিকাই হোক, শুয়ে নেয়। যেন রাক্ষুসে হাঁ। টুপ করে ধরে গিলে খায়। সাবধান!'

সমতলে ঘাসের বনে পৌঁছনো অবধি জিমকে ব্ল্যাকহোল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলুম। সে আমার পায়ের কাছ থেকে যেভাবে মুখ তুলে তাকাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল পুরোটাই বুঝেছে। মাঝে-মাঝে সে আমার দু'পায়ের ফাঁকে

ঢুকে পড়ছিল। হুঁ, ওর মনে পড়েছে সেবারকার সাংঘাতিক ঘটনাটা।

ঘাসের বনের শিশির সবে শুকিয়েছে। ঘাসফড়িংরা বেরিয়ে এসে ঘাসের পাতায় বসে রোদ নিতে নিতে কিরকির করে গান গাইছে। প্রজাপতিরা চনমন করে উড়ে বেড়াচ্ছে। এখানে-ওখানে উঁচু গাছপালার জটলা। সেখানে পাখি ডাকছে। অন্য পাখি মারব না। কেনই বা মারব? তিতিরের মাংস সুস্বাদু। তাই তিতির পেলেই মারব। তিতির থাকে ঘাসের বনে। কখনো আকাশে উড়ে ডাকতে থাকে ট্টি ট্টি ট্টি...ট্টি ট্টি...ট্টি...

কিন্তু কোথায় তিতির? পায়ের শব্দ পেলেই গুড়ি মেরে দৌড়নো অভ্যাস আছে ওদের। তাই খুব নজর রেখে এগোচ্ছি। ঘাসের ভেতর কালো-কালো পাথর ছড়ানো। তারপর সামনে পড়ল নদী। সেই ঝরনাটা এখানে ছোট্ট নদীটি হয়ে পাথর আর বালির চড়ার ফাঁক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। জিমকে কাঁধে তুলে পাথরে পা রেখে-রেখে নদী ডিঙিয়ে গেলুম। তারপর ওপারে ঘাসের বনে পৌঁছতেই কাটরুবুড়োর মুখোমুখি।

সে নিষ্পলক চোখে আমাকে দেখছিল। বলল, 'তো আপ মেরা মানা না শুনা?'

বললুম, 'কাটরু, তুমি যাই বল, অন্তত একটা তিতির আমি মারবই।'

'ঠিক হ্যায়। মারিয়ে।' বলে সে হাততালি দিয়ে মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করতে থাকল। তারপর যা দেখলুম, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না।

একটা দুটো করে তিতিরের একটা ঝাঁক বেরিয়ে এল ঘাসের বন থেকে। ওর মাথায়, কাঁধে, কোমরে, পায়ের নীচে তিতির আর তিতির। জিম অনবরত মুখ ভেঙাতে থাকল ওদের। তারপর একসঙ্গে অতগুলি তিতিরের ডাক ট্টি ট্টি ট্টি...ট্টি ট্টি ট্টি...আমার কান ঝালাপালা একেবারে।

কাটরু বাঁকা হেসে বলল, 'কী হল? বন্দুক ছুঁড়ুন!'

শরৎকালের উজ্জ্বল রোদে এই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটছে আমার সামনে বড়োজোর মিটার দশ-বারো দূরে। কাটরুকে দেখাচ্ছে এই জঙ্গলেরই একটা গাছ, নাকি খুব পুরনো, আদিম আর রহস্যেভরা পৃথিবীর কোনো আজব দুঠেঙে প্রাণী! তারপর যেন চাক মুখেও তিতিরের ডাক শুনতে পেলুম ট্টি ট্টি ট্টি...ট্টি ট্টি ট্টি...ট্টি ট্টি ট্টি...ট্টি ট্টি ট্টি...

সাহস উবে গেল। জিমকে কাঁধে তুলে নিয়েই অ্যাবাউট টার্ন করে নদী পেরিয়ে দৌঁড় দৌঁড় দৌঁড়।

ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তকে দেখলুম বিড়বিড় করে কী আওয়াচ্ছেন, আর চুল খামচে ধরে চোখ বুজে নাক কুঁচকে ফেলছেন। আমার ও জিমের দিকে লক্ষই নেই। কান করে শুনি, কী অবাক! বিজ্ঞানীপ্রবর আওড়াচ্ছেন, 'কে-ক্কে-ক্কে-ক্কে... কি-ক্কি-ক্কি-ক্কি-ক্কি-ক্কি-ক্কি... ডা-ড্ডা-ড্ডা-ড্ডা-ড্ডা... ডি-ড্ডি-ড্ডি- ড্ডি-ড্ডি...'

ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়লুম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'ওঃ!'

চন্দ্রকান্ত ঘুরলেন। বললেন, 'ট্টি-ট্টি-ট্টি-ট্টি-ট্টি?'

'হ্যাঁঃ!'

'কাটরু?'

'হুঁঃ!'

চন্দ্রকান্ত উঠে এলেন আমার কাছে। ওঁকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। চাপা স্বরে বললেন, 'কাটরু সম্পর্কে আমার ধারণা বদলাতে বাধ্য হয়েছি। একবছর এখানে এসেছি। অথচ ওর সম্পর্কে কিছু তলিয়ে ভাবিনি। লাটিমের গল্পটা ও আমাকেও বলেছিল। তো কিছুক্ষণ আগে আপনি ফের ওর গল্পটা বলে যাওয়ার পর ফোনেটিক ডি-কোডিং যন্ত্রটার সামনে বসলুম। আমাদের এই গ্যালাক্সিতে যতরকমের শব্দ হওয়া সম্ভব, তার মানে শব্দতরঙ্গের হ্রস্বতম থেকে দীর্ঘতম স্তর অব্দি, ওই এফ-ডিতে ফিড করিয়ে সংশ্লেষণের মাধ্যমে উৎস নির্ণয় করা যায়।'

মাথা আরও ঝিমঝিম করতে লাগল কথাটা শুনে। বন্দুকটা পাশে দাঁড় করানো, জিম আমার উরুর ওপর। বেচারা তখনও কাঁপছে। বললুম, 'কাটরু আমার ঘিলু উপড়ে নিয়েছে চন্দ্রকান্তবাবু। মুণ্ডুটি শুকনো লাউ-এর খোল। ট্টিং ট্টিং ট্টিং বাজনা ছাড়া আর কিছু নেই। আস্ত একতারা বানিয়ে দিয়েছে আমাকে।'

বিজ্ঞানী বললেন, 'ট্রি-ট্রি-ট্রিতে যাচ্ছি। কে-ক্কে-ক্কে থেকে শুরু করা যাক। এফ-ডি থেকে কী বেরোল জানেন? দেখাচ্ছি।' বলে একটা কম্পিউটার থেকে জিভের মতো বেরিয়ে থাকা লম্বাটে কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে এলেন। গ্রাফের ছক কাটা কাগজটাতে লাল একটা আঁকাবাঁকা রেখা। 'কিছু বুঝলেন?' চন্দ্রকান্ত মিটিমিটি হেসে প্রশ্ন, করলেন।

মাথা নেড়ে বললুম, 'নাঃ, জ্যামিতি আমার মাথায় ঢোকে না।'

'জ্যামিতি নয়, অঙ্ক।'

'অঙ্কে স্কুলে বরাবর গোল্লা পেতুম।'

চন্দ্রকান্ত হতাশ মুখে বললেন, 'তা হলে তো মুশকিল। যাই হোক, উড়ুক্কু লাটিমটা যে আমাদের গ্যালাক্সির, তাতে আমি নিঃসন্দেহ। আর ওই কাটরু সম্পর্কে আমার ধারণাও বদলানো দরকার। কাটরু.... ক-আ-ট-র-উ... কে-এ-টি-আর-ইউ...কা-ক্কা-ক্কা...ট-ট্ট-ট্ট... রু-রু-রু...'

বিড়বিড় করতে করতে বিজ্ঞানী উঠে দাঁড়ালেন। আবার গিয়ে বসলেন সেই এফ-ডি যন্ত্রটার সামনে। খটাখট বোতাম টিপতে থাকলেন। টিভির মতো ছোট্ট চৌকো কাচের পর্দায় লাল-নীল-সবুজ রঙের ফুটকি আর তরঙ্গরেখা ফুটে উঠল। মিলিয়ে গেল। আবার ফুটে উঠল, আবার মিলিয়ে গেল। তারপর আচমকা উঠে বেরিয়ে গেলেন চন্দ্রকান্ত। আমি তো থ।

কিন্তু জিমের সবটাতেই নাকগলানো চাই। সে আমার উরুর ওপর থেকে তুড়ুক করে লাফ দিয়ে চন্দ্রকান্তের পিছনে দৌড়ল। 'জিম, জিম, ব্ল্যাক হোল!' ওকে ভয় দেখাতে দেখাতে আমিও পা বাড়ালুম। কিন্তু দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই জিম বন্ধ দরজায় আঁচড় কাটছে। হাসতে হাসতে বললুম, 'কী? বেরো এবারে। বুদ্ধু কোথাকার! বল দরজা খোলার মন্তর! পারবি বলতে হিং চিং, ছট?'

এই রে! কেলেঙ্কারি করে ফেললুম তো। সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে গেল। আর জিমও একলাফে বাইরে।

বাইরে গিয়ে জিমকে দেখতে পেলুম না। ডাকতে থাকলুম, 'জিম, জিম, জিম!' সাড়া না পেয়ে ভয় হল। জিমটা যে বরাবর বড্ড বোকা! চারদিকে ছোটো ও বড়ো সবুজ পাহাড়, মধ্যিখানে উপত্যকা। কাটরুবুড়োর টংটা দেখা যাচ্ছিল। একটু পরে দেখি, সেখান থেকে কাঠের মই বেয়ে নেমে আসছেন বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত। ওঁকে দেখে ঢাল বেয়ে ঝোঁপ-জঙ্গল ভেঙে হন্তদন্ত এগিয়ে গেলুম। কাটরুর চাষের জমিতে পৌঁছলে চন্দ্রকান্ত আমাকে দেখে একটু হাসলেন। হন্তদন্ত বললুম, 'জিমকে দেখেছেন?'

চন্দ্রকান্ত এ-কথায় কানই দিলেন না। বললেন, 'ঠিকই ধরেছি। কাটরুর জমিতে এই সবুজ উদ্ভিদগুলি লক্ষ করুন। আমরা ফসল বলতে যা বুঝি, এগুলি মোটেও তা নয়। ধান নয়, গম নয়, বাজরা নয়, ভুট্টা নয়, অড়হর নয়—তার মনে পাহাড়ি মাটিতে যা ফলে, তার কোনোটাই নয়। অথচ এগুল ফসলই।' বলে উনি ঘাসের মতো দেখতে একটা গুছি থেকে শিষ ছিঁড়ে নিলেন। তারপর আপনমনে খিকখিক করে হেসে উঠলেন।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিমকে খুঁজতে খুঁজতে আনমনে বললুম, 'হাসছেন কেন?'

'ভুল হয়ে গেছে। আসলে এগুলিকে বলে কাংনিদানা। পাখিকে খাওয়ানো হয়। এ আপনি শহরের পশুপাখির খাদ্যভাণ্ডার পেয়ে যাবেন।' চন্দ্রকান্ত শিষটা ফেলে পা বাড়ালেন। 'চলুম ফেরা যাক। কাটরু আমাকে ভয় পায়। তাই গা-ঢাকা দিয়েছে। কী হল? আসুন।'

'জিম আপনার পেছন-পেছন এসেছে। তাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

চন্দ্রকান্ত গলায় ঝোলানো বাইনোকুলারে চোখ রেখে জিমকে খুঁজতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, 'মাই গুডনেস! কী অবাক, কী অবাক! আসুন তো দেখি।'

ওঁকে অনুসরণ করে সেই ঝরনার ধারে গেলুম। সত্যি অবাক হওয়ার মতো দৃশ্য। জামুনগাছটার তলায় কাটরুবুড়ো বসে আছে। তার কাঁধে হতচ্ছাড়া জিম, যেন নিঃশব্দে হেসে অস্থির হচ্ছে একপাল ধেড়ে ও

বাচ্চা হরিণ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর পাখি। রং-বেরঙের সবরকম পাখি এসে জড়ো হয়েছে জামুনগাছে, তলার ন্যাড়া মাটিতে, কাটরুর চারপাশেও এমনকী জিমের কাঁধেও একটা কাঠঠোকরা!

কিন্তু সব্বাই চুপ, সব্বাই। চুপ আর নিথর। যেন ছবি। একটু দূরে আমরা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম। চন্দ্রকান্ত আমার কাঁধ ধরে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসলেন। ঝোপের আড়াল থেকে দেখতে থাকলুম সেই আশ্চর্য দৃশ্য। একটু পরে হঠাৎ দেখি, কাটরু যেন কাটরু নয়, প্রাচীন যুগের এক মুনিঋষি—না, তাও নয়। আমারই চোখের ভুল। ও এই জঙ্গলেরই একরকম গাছ। ওর গায়ের খসখসে রুক্ষ চামড়া আস্ত বাকল, ওর পা দুটো শেকড়, হাত দুটো ডাল, আর আঙুলগুলি চিরোল পাতা। ওর চুড়োবাঁধা চুল একরাশ সাদা ফুল। আর...

চন্দ্রকান্তের চিমটি খেয়ে চমকে উঠলুম। ঝরনার পাথর ডিঙিয়ে একটা চিতাবাঘ আসছে। সর্বনাশ! কুকুর চিতার প্রিয় খাদ্য। জিম, বুদ্ধু গবেট হাঁদারাম! যেন চিতাটাকে 'ওয়েলকাম' বলার মতো হাঁ করেছে। চিতাটা এসে হরিণের পালের একটু তফাতে পেছনের দু'ঠ্যাঙ মুড়ে বসে একটা প্রকাণ্ড হাই তুলল। কী সাংঘাতিক দাঁত!

তারপর দেখতে দেখতে এসে জুটল একদঙ্গল কাঠবেড়ালি, খরগোশ, গন্ধগোকুল, বেজি। এমনকী ঝরনার জল থেকে উঠে এল কয়েকটা কোলাব্যাং, একজোড়া ভোঁদড়।

তারপর যা দেখলুম, ভয়ে কাঠ। একটা শঙ্খচূড় সাপ এসে একমিটার উঁচু হয়ে চক্কর তুলল।

আর মাথা ঠিক রাখা গেল না। বন্দুকে ছররা গুলি পোরা ছিল। চন্দ্রকান্ত বাধা দেবার আগেই বন্দুক তুলে হ্যামার টেনে ট্রিগারে চাপ দিলুম। লক্ষ ছিল সাপটার চক্কর। চন্দ্রকান্তের ধাক্কায় নলটা গেল উঠে। কিন্তু সামান্য ছররা গুলির যা আওয়াজ হল, আরও অবিশ্বাস্য। চারদিকের পাহাড়ে তুমুল প্রতিধ্বনি উঠল। সেকেন্ডে তুলকালাম অবস্থা। চিতাটা লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল। হরিণ, খরগোশ, গন্ধগোকুল, ভোঁদড় নিমেষে উধাও। কোলাব্যাংগুলি ঝরনায় ঝাঁপ দিল। আর পাখপাখালি চ্যাঁচামেচি করতে করতে ঝাঁক বেঁধে উড়ে পালাল। শুধু শঙ্খচূড় সাপটা পালিয়ে গেল না। তেড়ে এল আমাদের ঝোপের দিকে। সেই সময় একপলকের জন্য কাটরুকে দেখলুম উঠে দাঁড়িয়েছে। দুটো চোখে নীল আগুন। ও চোখ মানুষের নয়, আমাদের ঝোপটার দিকে দৃষ্টি। তার কাঁধ আঁকড়ে বিশ্বাসঘাতক জিম! সে ঘেউ-ঘেউ করে আমাকেই ধমক দিচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চললেন। রোগাটে গড়ন হলে কী হবে, অসম্ভব জোর তো ওঁর শরীরে! খাপ্পা হয়ে বললুম, 'সাপটাকে মারতে দিন। তাড়া করে আসছে যে!'

চন্দ্রকান্ত হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'ছেড়ে দিন! সব বুঝতে পেরেছি। এভরিথিং ক্লিয়ার! বলে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে ঢাল বেয়ে দৌড়ে চললেন।

জিমের জন্য মনখারাপ। ল্যাবরেটরির পাশে বেডরুমে শুয়ে আছি। ভীষণ ক্লান্তও বটে। ঝরনার ধারে জামুনতলার দৃশ্যটা চোখে ভেসে আসছে। অবাক হতে গিয়ে জিমের জন্য রেগে যাচ্ছি। শুধু একটাই আশা, ওই সবতাতে-নাক-গলানো স্বভাবের খুদে বুদ্ধুটাকে সেবারকার মতো এবারও বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত উদ্ধার করতে পারবেন।

ল্যাবরেটরি থেকে এসে গেলেন বিজ্ঞানীপ্রবর। মুখে মিটিমিটি হাসি। 'ভাববেন না। বাড়ির চারধারে লেসার-রশ্মির বেড়াজাল ঘিরে দিয়ে এলুম। সাপ কেন, পোকামাকড়ও দেওয়াল ছুঁলে ছাই হয়ে যাবে।' বলে ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন।

চমকে উঠে বললুম, 'সর্বনাশ! জিম ফিরে এলে যে....'

কথা কেড়ে দুলতে-দুলতে চন্দ্রকান্ত বললেন, 'টি-ডি, অর্থাৎ টেলি-ডিটেক্টরে দেখে এলুম আপনার জিম কাটরুর টঙে বসে কাংনিদানা খাচ্ছে।'

'সে কী! কাংনিদানা তো ঘাসের বীজ। জিম ঘাসের বীজ খাচ্ছে?'

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চোখ বুজে একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'খাক না। ভালো লাগছে বলেই খাচ্ছে। নইলে কি খেত? তবে ব্যাপারটা, হল, কাটরুর পরিচয় আমি অনেক ক্যালকুলেশন করে জানতে পেরেছি। ও একজন নির্বাসিত প্রাণী। আমাদের সৌর-জগতেরই একটা উপগ্রহে ছিল ওর বাড়ি। তাই ওর চেহারা মানুষের মতো। একই সোলার সিস্টেমে একই ধরনের প্রাণী জন্মাবে, একই ধারায় বিবর্তন ঘটবে, এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্লুটো নামে একটা গ্রহের কথা তো জানেন?'

আনমনে বললুম, 'হুঁ।'

'প্লুটোর একটামাত্র উপগ্রহ আছে। তার নাম রাখা হয়েছে 'কারন'। CHARON ইংরেজি বানান। শব্দটা এসেছে গ্রিক পুরাণ থেকে। হিন্দু পুরাণে যেমন বৈতরণী নদী, গ্রিকে তেমনি স্টিক্স নদী, মরার পর মানুষকে ওই নদী পার করে পাতালে পৌঁছে দেয় কারন। আক্ষরিক অর্থে খেয়া-মাঝি। বিজ্ঞানীদের মতে, প্লুটোর ওই উপগ্রহ আসলে একটা গ্রহ। প্লুটোর খপ্পরে পড়ে আমাদের চাঁদের দশা হয়েছে। চাঁদকেও তো ইদানীং কেউ-কেউ সেইরকম বন্দি-গ্রহ বলছেন। তবে কারণ যে বন্দি-গ্রহ, তার প্রমাণ তার ভর প্লুটোর মাত্র এক দশমাংশ। এদিকে চাঁদের...'

বিরক্ত হয়ে বাধা দিলুম, 'জিমকে কীভাবে উদ্ধার করা যাবে, তাই বলুন।'

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। 'চলে যান না। কাটরু সম্ভবত অহিংস প্রাণী। গিয়ে বুঝিয়ে বলুন। ক্ষমাটমা চান।'

'কিন্তু শঙ্খচূড় সাপটা হয়তো ওত পেতে আছে।'

বিজ্ঞানীপ্রবর চোখ বুজে কী ভেবে বললেন, 'এক মিনিট। আপনাকে আমার লেসার-পিস্তলটা দিচ্ছি। সাবধান, ওটা অটোমেটিক। হ্যামার টানতে হয় না। সাপটা দেখলে ট্রিগারে চাপ দেবেন। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তা ছাড়া দরকার হলে কাটরুকেও থ্রেটন করবেন। কিন্তু সাবধান। ওকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।'

উঠে দাঁড়ালেন চন্দ্রকান্ত। ফের বললেন, 'কিছুক্ষণের জন্য বাড়ির লেসার-রশ্মির বেড়াজাল অফ করে রাখছি, আপনি ফিরে না-আসা অব্দি।'

দুঃখের মধ্যে হাসি আসছিল। কাটরু নাকি প্লুটোর উপগ্রহের নির্বাসিত প্রাণী। দিব্যি ভাঙা হিন্দি-বাংলা বুলি বলতে পারে লোকটা। পশু-পাখি ওকে ভালোবাসে, ওর কাছে আসে, এতে আর এমনকী অস্বাভাবিকতা আছে? নির্জন প্রকৃতির মানুষ। পশু-পাখির ক্ষতি করে না। বহু বছর ধরে দেখে দেখে পশু-পাখিরা ওর কাছঘেঁষা হয়েছে। আসলে আমরা নতুন কোনো ঘটনা বা দৃশ্যের সামনে পড়লে মনের চোখ দিয়েই দেখি। যা দেখছি না, তাও দেখি, রং চড়িয়ে দেখতে ভালোবাসি বলেই।

কাটরু সম্পর্কে এই ব্যাখ্যাটা দাঁড় করালুম মনে-মনে। কিন্তু নজর তীক্ষ্ণ। লেসার-পিস্তল-বাগানো হাত। ফোঁস করলেই ট্রিগারে চাপ দেব। কিন্তু কোথায় বদমাশ শঙ্খচূড়টা? কাটরুর ভুঁই অব্দি দিব্যি আসা গেল। টং নিঝুম খাঁখাঁ। ডাকলুম, 'কাটরু, কাটরুখুড়ো!' খুড়ো বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। নাকি হিন্দিতে 'কাটরুমৌসা'—কাটরুমেসো বলে ডাকব? ঠিক আছে। গলা ঝেড়ে ডাকলুম, 'কাটরুমৌসা, তুম কিধার হো? সাড়া না পেয়ে ডাকলুম, 'জিম, জিম।' তাও সাড়া নেই।

কাঠের মই বেয়ে চঙে উঠে উঁকি মেরে দেখি, ঘাসের তৈরি কুঁড়েঘরটার ভেতর কেউ নেই। ঘাসের বিছানা পাতা। ঘাসের বালিশ। একখানা পাথরের থালা আর ডেকচি গড়নের পাত্র। থালায় কাংনিদানা পড়ে আছে খানিকটা। ডেকচিতে জল।

এদিকে-ওদিকে খুঁজতে থাকলুম উঁচু টঙের ওপর থেকে না কাটরু না জিম। উপত্যকা, চারপাশের ছোটোবড়ো সবুজ পাহাড়, সবখানে নির্জনতা ছমছম করছে। হাওয়া-বাতাস বন্ধ। কিন্তু কী সুন্দর প্রকৃতির এই সাজানো বাগান। দাগড়া-দাগড়া সবুজ রঙের ওপর সাদা হলুদ-লাল ছোপ। ওগুল ফুল। নদীর দিকটাতে কাশফুল থরেবিথরে সাজানো। তারপর ক্রমশ পোকামাকড়ের ডাক আর পাখির ডাক কানে আসতে লাগল। শিউরে উঠলুম। এ এক আশ্চর্য অনুভুতি। প্রকৃতির একটা গোপন কেন্দ্রে এসে পড়েছি, যেখানে লক্ষকোটি প্রাণ সাড়া তুলেছে। এত প্রাণ, এত রং এত সুর।

নেমে আসছি টং থেকে, তখন আমি যেন অন্য মানুষ। ভাবের ঘোরে উদাসীন। এখন যদি শঙ্খচূড়টা ফোঁস করে তেড়ে আসে, বলব, 'লক্ষ্মী ভাইটি আমার। আয়, দুজনে মিতে পাতাই'।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, আর আমি তিতির মারব না। কোনো পাখিকেই মারব না। জানোয়ার দেখলে বলব, 'হ্যাল্লো, ব্রাদার অর সিস্টার! হাউ ডু য়ু ডু?'

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত বাড়ির ছুঁচল ছাদ থেকে বাইনোকুলারে আমাকে লক্ষ করছিলেন। এবার খুব হাত নেড়ে ডাকতে লাগলেন। ঢাল বেয়ে উঠে বাড়িটার কাছে যেতেই শুনলুম, 'আপনার কুকুরটা খুঁজে পেলেন না তো? পাবেন না। এই মাত্র ক্যালকুলেশন করে দেখলুম, কাটরুর কাঁধে চেপে পশ্চিপাহাড়ের ওধারে চলে গেছে।'

'জিম যা খুশি করুক। হিং টিং ছট!'

দরজা খুললে ভেতরে গেলুম। একটু পরে ছাদ থেকে চন্দ্রকান্ত নেমে এলেন। মুখটা গম্ভীর বললেন, 'গুরুতর ব্যাপার। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আপনি যাওয়ার পর প্লুটোর ওই উপগ্রহের সঙ্গে ট্যাকিওনের সাহায্য যোগাযোগ করেছিলুম। 'ট্যাকিওন' বোঝেন? বোঝেন না। একরকম কণিকা, যার গতিবেগ আলোর সমান। সেকেন্ডে ২৯৯৭৯২.৫ কিলোমিটার। কোনো Mass বা ভর নেই। তো কারন উপগ্রহ থেকে পালটা সংকেত ধরা পড়ল। কারন পৃথিবীর মতো ফুল অভ লাইফ। হ্যাঁ, মানুষের মতো দ্বিপদ বুদ্ধিমান প্রাণীও আছে। সংকেত ডি-কোড করে বুঝলুম, ওরা শিগগির রওনা দিচ্ছে। যদি কোনো অঘটন না ঘটে, আজ রাত্তিরেই ওরা এসে পড়বে।'

'আপনি কী ডাকলেন ওদের?'

'হ্যাঁ।' চাপা স্বরে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত বললেন। 'কাটরুকে ওরা ফেরত নিয়ে যাক। বড্ড ঝামেলা করে ও মাঝে-মাঝে। তার চেয়ে বড়ো কথা, আমি নিরিবিলিতে অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্সের যেসব গোপন পরীক্ষা করছি, অন্য

গ্রহ বা উপগ্রহের বাসিন্দা তা টের পাক, এটা আমি চাই না। কে বলতে পারে, ওরা ঈর্ষাকাতর হয়ে আমার এই ল্যাবরেটরি জ্বালিয়ে দেবে না?' চন্দ্রকান্ত অনর্গল বলতে থাকলেন এইসব কথা।

আমার মনে রীতিমতো বৈরাগ্যভাব এখন ইচ্ছে করছে আমিও কাটরু হয়ে যাই। গাছপালার ভেতর ঘাসের মাঠে ঝরনার ধারে কাটরুর মতো খালি-গা খালি-পা হয়ে কোমরে একফালি মাত্র কৌপীন জড়িয়ে ঘুরে বেড়াই। জঙ্গল একটুখানি সাফ করে তার মতো কাংনিদানার চাষ করি। পাখিদের জন্য, স্রেফ পাখিদের জন্যই। কারণ, মুঠো মুঠো কাংনিদানা ছড়ালেই ওরা এসে যাবে আমার কাছে। আপন হয়ে যাবে। আমাকে ঘিরে কিচিরমিচির করবে। আমিও কিচিরমিচির করব। তিতির হয়ে ডাকব, ট্রি ট্রি ট্রি। ট্রি ট্রি ট্রি! আমার গায়ে-মাথায় তিতিরের ঝাঁক। আর আমি তখন এক 'পাখিবাবা'! কী মজাই না হবে।

চন্দ্রকান্তের ডাকে ঝিমুনি কেটে গেল। 'আসুন, লাঞ্চ সেরে নিই। নিরিমিষ কিন্তু! বলেছিলেন তিতিরের মাংস খাওয়াবেন। আপনিই ফেল করেছেন!' বিজ্ঞানীপ্রভারের সঙ্গে ডাইনিং-রুমে ঢুকলুম। প্রচুর খিদে পেয়েছে বটে।

চন্দ্রকান্তের হিসেবে কারন উপগ্রহের স্পেসশিপ পৌঁছুবে কাঁটায়-কাঁটায় দশটা বত্রিশ মিনিট একুশ সেকেন্ডে। আঁধার রাত। হাওয়াবাতাস নেই। উপত্যকার আকাশে জ্বলজ্বল করছে লক্ষ কোটি তারা। নদীর ধারে পাথরের আড়ালে দুজনে ওত পেতে বসে আছি। শঙ্খচূড়টার ভয়ে আমাদের পরনে স্পেসস্যুটের মতো পোশাক। ছোবল দিলে বৈদ্যুতিক শক খাবে নিজেই। চন্দ্রকান্ত হাতে একটা টর্চের সাইজ যন্ত্র নিয়ে বসে আছেন। আমাকে নজর রাখতে বলেছেন আকাশে। হাতঘড়িতে দশটা বত্রিশের ঘরে রেডিয়াম-কাঁটা। সেই সময় একবার ঘুরে কাটরুর টঙের দিকটা দেখে নিলুম। টঙের সামনে খুঁটিতে লণ্ঠন জ্বলছে। কারন থেকে যারা আসছে তারা কাটরুকে ধরে নিয়ে যাবে। তখন জিমকে উদ্ধার করা সহজ হবে তো? জিমকে সুদ্ধু ধরে নিয়ে গেলে কেলেঙ্কারি!

আবার আকাশের দিকে তাকালুম। হঠাৎ দেখি একটা তারা ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠছে। বড়ো হতে হতে সেটা নেমে আসছে। এইসময় শনশন করে বাতাস উঠল। বাতাসটা বাড়তে লাগল। বাড়তে বাড়তে তুলকালাম ঝড়। এমন ঝড় যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে সবকিছু। আমরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম দুজনে। সেই প্রকাণ্ড তারাটা এবার লাল-নীল-হলুদ-সবুজ-বেগুনি রং বদলাতে বদলাতে ঠিক আমাদের মাথার ওপর এসে স্থির হল এক সেকেন্ডের জন্য। তারপর সামনের বালির চড়ায় বালি উড়িয়ে নামল। বনবন করে ঘুরতে থাকল। কাটরু যা বলেছিল, ঠিক তেমনটি। প্রকাণ্ড লাটিম। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, ওটা বাইরের কিছুকে আলোকিত করছে না। অথচ প্লেনের জানালার মতো টুকরো-টুকরো ফোকর দিয়ে রং-বেরঙের আলো বেরোচ্ছে। চক্কর থামার পর একটা ফোকর দিয়ে দুটো কাল নাদুসনুদুস বেঁটে পুতুল গড়নের প্রাণী বেরোল। কাটরুর বর্ণনায় একটুও গণ্ডগোল নেই দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তকে উঠতে দেখে আমিও উঠে দাঁড়ালুম। আর দুঠেঙে প্রাণী দুটো এসে ধাতব কণ্ঠস্বরে বলে উঠল, 'কে-ক্কে-ক্কে-ক্কে... কি-ক্কি-ক্কি- ক্কি-ক্কি... ডা-ড্ডা-ড্ডা-ড্ডা... ডি-ড্ডি-ড্ডি-ড্ডি!'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'কা-ক্কা-ক্কা-ক্কা... ট-ট্ট-ট্ট-ট্ট... রু-রু-রু-রু-রু!'

প্রাণী দুটো আঁধারে রং-বেরঙের আলোর পুতুলের মতো কাটরুর টং লক্ষ করে উড়ে গে। চন্দ্রকান্ত বললেন, 'ওদের স্পেসশিপটা একটু দেখে আসা যাক।'

চন্দ্রকান্ত যখন উড়ুক্কু লাটিমটার কাছে, তখন টঙের দিক থেকে জিমের গলা শুনতে পেলুম। প্রচণ্ড ধমক দিচ্ছে। হাঁদারামকে ধরে নিয়ে যাবে ভেবে অস্বস্তি হচ্ছিল। হঠাৎ সেইসময় সেই প্রাণী দুটো সুড়ুত করে ভেসে নদীর ওপর দিয়ে উড়ুক্কু লাটিমের কাছে ফিরে এল। চন্দ্রকান্ত 'কি-ক্কি-ক্কি' করে উঠলেন। ওরা কোনো জবাব না দিয়ে ফোকর গলিয়ে লাটিমে ঢুকল। অমনি বনবন করে সেটা ঘুরতে লাগল। আবার সেই ঝড়। আবার শুয়ে পড়লুম। উড়ুক্কু লাটিমটা বোঁও করে আকাশে উঠে ছোটো হতে হতে নিমেষে তারার সঙ্গে মিশে গেল। ঝড় থামলে চন্দ্রকান্তের কাতর ডাক শুনলুম, 'হেল্প মি। জলে পড়ে গেছি।'

জলে স্পেসস্যুট-পরা বিজ্ঞানীপ্রবরের অবস্থা করুণ। টেনেটুনে ওঠালুম। বললেন, 'ওরা অমন করে পালিয়ে গেল কেন বলুন তো?'

টঙের দিক থেকে জিমের গলা ভেসে আসছে। সমানে ধমক দিচ্ছে এখনও। হুঁ, উদ্ভুট্টে প্রাণী দুটোর পড়ি-কি-মরি করে পালানোর রহস্য বোঝা গেল। পা বাড়িয়ে বললুম, 'আমার ধারণা, কারন-উপগ্রহে কুকুর নেই।'

চন্দ্রকান্ত ব্যস্তভাবে বললেন, 'ক্যালকুলেশন করতে হবে। চলুন শিগগির!'

কী ভেবে টঙের কাছাকাছি গিয়ে ডাকলুম, 'কাটরুমৌসা, কাটরুমৌসা!'

চন্দ্রকান্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ। করছেন কী? ও সব টের পেয়ে গেছে। এখন আমাদের নাম্বার ওয়া এনিমি!'

ওঁকে গ্রাহ্য না করে টঙের দিকে চললুম। বিজ্ঞানী খাপ্পা হয়ে চলে গেলেন। টঙের নীচে দাঁড়িয়ে আবার ডাকলুম, 'কাটরুমৌসা, ঘাট মানছি। আর কখনো বন্দুক ছুঁড়ব না। জিমকে ফেরত দাও।'

কাটরুর সাড়া পেলুম না। কিন্তু জিমকে সে ফেরতই দিল বলতে হবে। জিম টঙের মই বেয়ে নেমে এসে আমার পায়ের ফাঁকে ঢুকে কুঁইকুঁই শব্দ করতে থাকল। হুঁ, সেও বলছে, ঘাট মানছি। আর কক্ষনো এমনটি হবে না। ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে চন্দ্রকান্তের বাড়ি পৌঁছলুম।

বিজ্ঞানীপ্রবর ল্যাবরেটরিতে ছিলেন। হাসিমুখে বললেন, 'আপনি ঠিক বলছিলেন। কারনে এ-জাতীয় চতুষ্পদ প্রাণী নেই। তাই ওরা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। যাই হোক, আপনি জিমকে নিয়ে দেশে ফিরলে তখন ফের ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। কাটরুকে আমার মোটেও পছন্দ হয় না।'

আর-একটু আছে। সেটাই আসল গপ্প। তা বলার জন্যই এতখানি লম্বাচওড়া পরিপ্রেক্ষিত।

পরদিন সকালে কাটরুর সঙ্গে কথা বলার জন্য ওর টঙের দিকে যাচ্ছি। সঙ্গে জিম। হাতে বন্দুক নেই। সাপের ভয়ও নেই কারণ কাটরু আমার ওপর খুশি হয়েছে। নইলে জিমকে ফেরত দিত না।

কিন্তু কী অবাক, কোথায় টং? ভেঙেচুরে পড়ে আছে মাকড়সার জালে ঢাকা চালছপ্পর, কাঠের মই, সবকিছুই। আর সেখানেই রাতারাতি গজিয়ে গেছে একটা গাছ। একমাথা সাদা ফুল। ধূসর বাকলে রাতের শিশির। শিশির তার পাতায়, ফুলে। গাছটার গায়ে হাত রাখতেই মনে হল দারুণ জ্যান্ত, কোনো প্রাণীর শরীরে হাত রাখলে যেমন লাগে। চমকে উঠে পিছিয়ে এলুম। বললুম, 'কাটরুমৌসা, কেন তুমি গাছ হয়ে গেলে বল তো? বেশ তো ছিলে মানুষের মতো।' জিমও গাছটার দিকে তাকিয়ে লেজ নেড়ে কুঁইকুঁই করতে থাকল।

গাছের পাতায় একঝাঁক পাখি এসে বসল। অমনি ঝরঝর করে ঝরে পড়ল রাতের শিশির। দুঃখিত মনে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের বাড়ির দিকে পা বাড়ালুম। ওঁকে জানানো দরকার কারন উপগ্রহের নির্বাসিত মানুষ কাটুরু পৃথিবীর এক গাছ হয়ে গেছে। কাজেই এ-নিয়ে আর মাথা ঘামানো নিষ্ফল।

কাকাতুয়া ডট কম

প্রচেত গুপ্ত

টিকলুর মেজমামা একেবারে ভেঙে পড়েছেন। ভেঙে পড়বারই কথা। তেইশ দিন হতে চলল, ঝুঁটি একটা কথাও বলেনি। আর বলবে বলে মনেও হচ্ছে না। প্রথম প্রথম কথা শেখানোর সময় সে মুখ তুলে তাকাত। আজকাল হাই তোলা ধরনের অপমানজনক একটা ভঙ্গি করছে। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

একেবারে শুরুতে মেজমামা ভেবেছিলেন, পরিবেশ নতুন। মানিয়ে নিতে সময় লাগছে। কিছু দিন যাক, ঠিক হয়ে যাবে।

কিছু দিন গেল, কিন্তু কিছুই ঠিক হল না। মুখে শুধু 'ট্যাঁ', 'খক', 'ফস' ধরনের আবোল তাবোল আওয়াজ! মেজমামা এবার ভাবলেন, শরীরটরির খারাপ। দেখা গেল তাও নয়। সবই চলছে ঠিকঠাক। দু'বেলা পেটপুরে খাওয়া, সকালে বিকেলে ফল। দুপুরে ঠান্ডা-গরম জলে স্নান। ভোরে দাঁড়ে বসে ডিগবাজি খেয়ে আর ডানা ঝাপটিয়ে হালকা ব্যায়াম। তা হলে?

তা হলে কী, সেটাই বুঝতে পারছেন না মেজমামা। রাগে দুঃখে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। বাড়িতে কাকাতুয়া আছে, কিন্তু সে কথা বলে না। এর চেয়ে লজ্জার আর কী থাকতে পারে?

টিকলুর মেজমামিমা বললেন, শিক্ষা হল তো? তখনই আপত্তি করেছিলাম।

কথাটা ঠিক, বাড়িতে কাকাতুয়া রাখার ব্যাপারে মেজমামিমার গোড়া থেকেই আপত্তি ছিল। তিনি ঠান্ডা মাথায় টিকলুর মেজমামাকে কথাটা বুঝিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আগেকার দিনে বড়ো বড়ো বাড়ি ছিল। ছিল বড়ো বড়ো ঘর। লম্বা লম্বা বারান্দা। বিশাল উঠোন। আর ছাদগুলি চওড়ায় এমন হত যে, মাঠের বদলে অনেক সময় পাড়ার ছোটোখাটো ফুটবল ম্যাচ ছাদেই হয়ে যেত। তখন বাড়িতে খানকতক পশুপাখি পুষলে কোনে অসুবিধেই ছিল না। তখন এক-একটা বাড়িতে দশ-বারোটা বিড়াল কোনো ঘটনাই নয়। দুপুরবেলা বারান্দায় লাইন দিয়ে, লেজ গুটিয়ে বসে তারা মাছের কাঁটা খেত। আজকাল বড়ো বাড়ির ব্যাপারটাই উঠে গিয়েছে। এখন হল ফ্ল্যাট সিস্টেম। ফ্ল্যাটে সবকিছু হয় মাপমতো। খাট, চেয়ার, টেবিল, কম্পিউটার থেকে শুরু করে ফুলদানি, অ্যাকোয়ারিয়াম এমনকী, মানুষের পর্যন্ত আগে থেকে মাপ নিয়ে, নকশা এঁকে সব ঠিক করা থাকে। সেখানে দুম করে জীবজন্তু ঢোকানো চলে না। তা ছাড়া পাখিটাখি পোষার হবি আজকাল উঠে যেতে বসেছে। এমনকী, ছোটোরা পর্যন্ত আসল জীবজন্তুর বদলে আজকাল জীবজন্তুর রোবট পোষে। এত বড়ো একটা মানুষ পাখি পুষেছে শুনলে সকলেই হাসবে।

এত আপত্তির একটাও টিকল না। কাকাতুয়া আনা ফাইনাল হয়ে গেল। মামিমা তখন মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন। শেষ অস্ত্র। মামাকে হুমকি দিলেন। বললেন, তা হলে তুমি বেছে নাও, এই ফ্ল্যাটে কে থাকবে? আমি, না তোমার কাকাতুয়া?
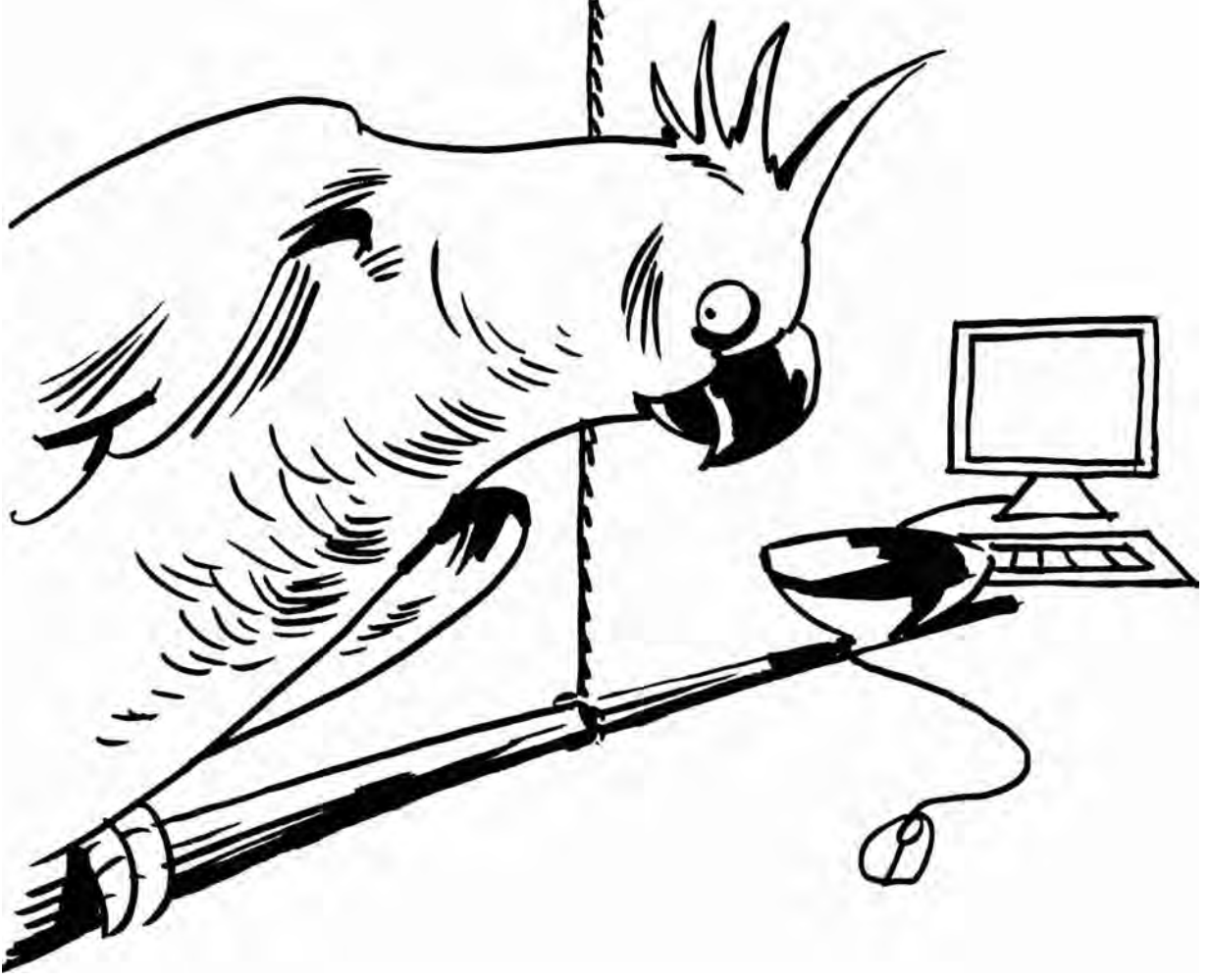
মামিমা আশা করেছিলেন, এই হুমকি শুনে মেজমামা দুঃখ-দুঃখ গলায় বলবেন, এটা তুমি কী বলছ! সামান্য একটা পাখির জন্য তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। না, না, এ কখনো হতে পারে না। থাক, কাকাতুয়া পুষে কাজ নেই। এত বছর যখন কাকাতুয়া ছাড়া থাকতে পেরেছি, বাকি দিনগুলও পারব।

আশ্চর্যের বিষয়, হুমকি শোনার পর মেজমামা সেরকম কিছু বলবেন না! উলটে মুচকি হেসে বললেন, কথাটা খারাপ বলনি। ক'টা দিন বোনের বাড়িতে কাটিয়ে আসতে পারো। বল তো, আমি নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব। আর সেই ক'টা দিন আমি না হয় পাখিটাকে ট্রেনিং দেব। ফাঁকা বাড়িতে ট্রেনিং দেওয়া সুবিধে।

মামিমা বুঝতে পারলেন, এই মানুষকে আর কিছু বলে লাভ নেই।

আসলে টিকলুর মেজমামার কাকাতুয়ার শখ সেই ছেলেবেলা থেকে। স্কুলে পড়ার সময় ভোম্বলের পিসির বাড়িতে একবার দেখেছিলেন। সেই পাখি মেজমামাকে দেখে ঘাড় কাত করে বলল, অ্যাই ছেলে, হোমটাস্ক হয়েছে? হোমটাস্ক না করে খেলে বেড়াচ্ছ যে বড়ো?

কাকাতুয়াটার কথার মধ্যে একটা ধমক ধমক ব্যাপার থাকলেও মেজমামা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তখনই ঠিক করেছিলেন, তিনিও একটা কাকাতুয়া পুষবেন।

বাবার বকুনিতে সেই শখ তখন মেটেনি। এত বছর পর মেটালেন।

পাখি যেদিন বাড়িতে এল সেদিন মেজমামিমা সত্যি সত্যি বোনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তবে বাড়ি ছেড়ে যাননি, গিয়েছিলেন রান্না শিখতে। তিনি মাঝেমধ্যে বোনের কাছে রান্না শিখতে যান। এক-একদিন এক-এক রকম রান্না। সেদিন শিখলেন চকোলেট কেক। এতে একটু সময় লাগে। কেক ফ্রিজে ঢুকিয়ে ঠান্ডা করার

ব্যাপার আছে। তাই বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল। পাখি আসার কথা তিনি জানতেন না। বেল টিপতে দরজা খুলল কাজের মেয়ে বুনি। একগাল হেসে বলল, বউদি, এসে গিয়েছে।

মেজমামিমা অবাক হয়ে বললেন, এসে গিয়েছে! কে এসে গিয়েছে?

বুনি বড়ো করে হেসে বলল, ঝুঁটিপিসি। ঝুঁটিপিসি এসে গিয়েছে।

মেজমামিমা অবাক হলেন, ঝুঁটিপিসি! ঝুঁটিপিসি কে? ঝুঁটি নামে টিকলুর মেজমামার কোনো বোন আছে বলে তো তাঁর মনে পড়ছে না!

তিনি ভুরু কুঁচকে ঘরে ঢুকলেন এবং ঢুকেই চমকে উঠলেন!

বসার ঘরের ঠিক মাঝখানে বদখতভাবে একটা দড়ি টাঙানো। সেই দড়িতে ঝুলছে পিতলের দাঁড়। আর দাঁড়ে বসে আছে কাকাতুয়া! ঝলমল করছে। গায়ের রং ধবধবে সাদা। সেই সাদার মধ্যে একটা গোলাপি আভা যেন লুকোচুরি খেলছে! তাকিয়ে থাকলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আর তার চেয়েও চোখ জুড়োনো হল মাথার ঝুঁটি! একেবারে লাল টকটক করছে যে! সেই ঝুঁটি এতই সুন্দর যে, একবার দেখলে মন ভরে না। মনে হয়, আরও একবার দেখি।

টিকলুর মেজমামিমারও তাই মনে হল। তবু তিনি মনকে শক্ত করে মুখ ফেরালেন। দুর্বলতা দেখানো উচিত নয়।

মামিমাকে দেখে খানিকটা নার্ভাস হয়েই মেজমামা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন, ভেবেছিলাম দু'দিন দেরি করব। মনে হচ্ছে, করলে বড়ো একটা বোকামি হয়ে যেত। এত ভালো পাখিটা হাতছাড়া হয়ে যেত। ঠিক যেমন খুঁজছিলাম। এ হল তোমার মাল্লাকান কাকাতুয়া। ভারি ভদ্র আর বুদ্ধিমান। তার চেয়েও বড়ো কথা হল, কথা বলায় একেবারে মাস্টার। কথা একবার শুরু হলেই হল। চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে। তখন থামার জন্যে হাতে-পায়ে ধরতে হবে। হা হা। আনতে আনতে একটা নামও ঠিক করে ফেলেছি। ডাকনাম অবশ্য। ভালো নাম তোমার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করব। ডাকনামটা শুনবে?

মেজমামিমা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন। মানুষটা পাগল হয়ে গেলেন নাকি? মনে হচ্ছে তাই। মানুষের ডাকনাম হল, পাখির কখনো ডাকনাম হয়! তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, না, আমি শুনব না। ভালো নাম, ডাকনাম কোনোও কিছুই শুনতে চাই না।

মেজমামা গদগদ গলায় বললেন, আহা, শোনোই না। ডাকনাম, দিয়েছি ঝুঁটি।

মেজমামিমা চোখ পাকিয়ে বুনির দিকে তাকালেন। ও, এই কারণে বিচ্ছু মেয়েটা বলছিল, ঝুঁটিপিসি এসেছে!

মেজমামা গর্বিত হেসে বললেন তুমি যতই রাগ করো, ঝুঁটিকে দেখতে কিন্তু ভারি সুন্দর। তাই না?

মামিমা নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, হ্যাঁ তাই। তবে তাতে কিছু এসে যায় না। সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগারও দেখতে সুন্দর। তার মানে এই নয় যে, তাকে বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে এবং সোফায় বসিয়ে খেতে খেতে গল্প করতে হবে।

মেজমামা বললেন, আহা, তুমি তো এখন শুধু এর রূপটুকুই দেখেছ, এর গুণের পরিচয় তো এখনও পাওনি। আমি যেরকম ভেবেছি, তার আদ্দেকটাও যদি পাখিটাকে শেখাতে পারি, তা হলেই সকলে একেবারে চমকে যাবে।

কথাটা মিথ্যে নয়। টিকলুর মেজমামা ঝুঁটিকে নিয়ে যা পরিকল্পনা করেছিলেন তা ভীষণ মারাত্মক। গুরুত্ব অনুযায়ী পরিকল্পনাগুলি সাজালে এরকম হবে—

পরিকল্পনা : (এক) মোট আড়াইশো টেলিফোন নম্বর মুখস্থ। এর মধ্যে দেড়শো ল্যান্ড ফোনের, বাকি একশো মোবাইল ফোনের নম্বর।

পরিকল্পনা : (দুই) বাজারদর থেকে আবহাওয়ার খবর, খেলাধুলার উপর দু'-একটা ভাষণ তৈরি করে শিখিয়ে রাখা হবে। বড়ো কিছু নয়। দশ-বারো লাইনের ছোটো ছোটো ভাষণ। এর ফলে হঠাৎ বাড়িতে

কোনো অতিথি চলে এলে, তাঁর সঙ্গে অন্তত কিছুক্ষণ কথা চালাতে পারবে। এই যেমন, আলুর দাম, পৃথিবীতে গরম কেন বাড়ছে, মোহনবাগানের টিম বদল, এইসব। ট্রেনিং এমনভাবে হবে, যাতে ভাষণের মাঝখানে সে ঘাড় বেঁকিয়ে অতিথিকে জিজ্ঞেস করে, চা খাবেন? না, কফি?

পরিকল্পনা : (তিন) রোজ সকালে খবরের কাগজ দেখে সেদিনের টিভি প্রোগ্রামের কয়েকটা কানের কাছে আওড়ে দিতে হবে। ক'টার সময় কোনো চ্যানেলে টেনিস, কোন চ্যানেলে ক্রিকেট, কোন চ্যানেলে সিনেমা। সন্ধেবেলা জিজ্ঞেস করলেই বলে যাবে গড়গড় করে।

পরিকল্পনা : (চার) পরিকল্পনা আছে, কুইজের একটা ট্রেনিং দিতে। এটা একেবারে টিকলুর জন্য ভেবেছেন মেজমামা। টিকলু আর তার বন্ধুরা এলে ঝুঁটি হবে কুইজ মিস। কোনো সন্দেহ নেই, ব্যাপারটা দারুণ মজার হবে। তবে সমস্যা একটা আছে। প্রশ্নের জায়গায় আগে উত্তরগুলি যদি বলে ফ্যালে!

পরিকল্পনা : (পাঁচ) কুইজের পরিকল্পনা যেমন টিকলুর জন্য, তেমনই এই পরিকল্পনাটা হয়েছে মেজমামিমার কথা ভেবে। এর জন্য ঝুঁটির ট্রেনিং হবে গোপনে। মেজমামিমা যখন বাড়িতে থাকবেন না, সেই সময়। কয়েকটি রান্নার বই আনা হবে। সেখান থেকে বাছাই করে রেসিপি মুখস্থ করানো হবে ঝুঁটিকে। রবিবার সকালে মেজমামিমা যখন রান্নাঘরে ঢুকবেন, বাইরে দাঁড়ে বসে ঝুঁটি বলবে, এবার তিন চামচ চিনি দাও। তারপর এক বাটি দুধ। একটা ডিম ফাটিয়ে...।

পরের দিন ভোর থেকেই ট্রেনিং শুরু হয়ে গেল। মেজমামা তিন দিনের ছুটি নিয়েছেন অফিস থেকে। পাখি যার কাছ থেকে আনা হয়েছে, সে বলে দিয়েছে, শুরুটা ধীরেসুস্থে হওয়াই ভালো। একটু একটু করে। দেখবেন, প্রথমেই ঘাবড়ে না যায়। সহজ-সরল কথা শেখাবেন।

সেইমতো প্রথম ট্রেনিংয়ের কথাটা সহজ-সরলই বাছলেন মেজমামা। কথাট এরকম, আহা! রান্না বড়ো খাসা!

মেজমামার ইচ্ছে ছিল, মামিমাকে পাখির প্রথম বুলি হিসেবে এটাই শোনাবেন। কাকাতুয়ার মুখে রান্নার প্রশংসা শুনে মামিমার রাগ একেবারে জল হয়ে যাবে।

কিন্তু ইচ্ছে ইচ্ছেই রয়ে গেল। এক ঘন্টা, দু'ঘন্টা, তিন ঘন্টা করে গোটা দিনটাই চলে গেল। ঝুঁটি চুপ করে রইল! একেবারে যাকে বলে স্পিকটি নট! দুপুরে ছোলা সেদ্ধ, পেঁপে, আধখানা কলা দিয়ে লাঞ্চ সেরে ঢেঁকুর তোলা ধরনের একটা ভঙ্গি করল। তারপর ঘাড় কাত করে ঘুমিয়ে পড়ল।

মেজমামা খাঁচার সামনে টুল পেতে বিকেল পর্যন্ত বিড়বিড় করলেন, আহা! রান্না বড়ো খাসা। আহা! রান্না...

বুনি আড়াল থেকে ঘটনা দেখে ঘাবড়ে গেল প্রচণ্ড। রান্নাঘরে গিয়ে বড়ো বড়ো চোখ করে মামিমাকে বলল, দাদার মনে হয় মাথা গরম হয়েছে। জল ঢালা দরকার বউদি।

সত্যি সত্যি মাথা গরম হওয়ার কথা। কিন্তু মেজমামা মাথা ঠান্ডা রেখে চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিন দিন গেল। চার দিন গেল। একটা গোটা সপ্তাহ চলে গেল।

ঝুঁটি মুখ ফুটে একটি কথা বলল না!

মেজমামা অফিসের ছুটি বাড়িয়ে নিলেন। ট্রেনিংয়ের সময় বাড়ল। গোটা বাক্যের বদলে 'হ্যাল', 'গুড মর্নিং', 'টা টা' ধরনের কথা দিয়ে চেষ্টা চলল ক'দিন। তাতেও কিছু হল না।

মেজমামিমা বললেন, এবার তুমি থামবে? একই কথা বলতে বলতে হয়। তুমি পাগল হয়ে যাবে, নয়তো শুনতে শুনতে আমি পাগল হয়ে যাব। কেন বুঝতে পারছ না তুমি বিরাট ঠকেছ। লোকটা তোমাকে একটা অতি গবেট এবং মূর্খ কাকাতুয়া গছিয়ে দিয়েছে। অনেক হয়েছে, এবার চুপ কর। এর মধ্যেই বুনির অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে। দেখছি, মেয়েটা সারাদিন নিজের মনে বিড়বিড় করে, 'গুড মর্নিং' 'হ্যাল' 'টা টা'। 'গুড মর্নিং...' এরপর তো আমিও শুরু করব।

ঝুঁটি আসার ঠিক বাইশ দিনের মাথায় মেজমামা রাতে একটা ভয়াবহ স্বপ্ন দেখলেন। ঝুঁটির মূর্খামি নিয়ে স্বপ্ন! স্বপ্নটা এরকম—দাঁড়ে মাথা নামিয়ে ঝুঁটি বসে আছে। তার ঠোঁটে ধরা একচিলতে কাগজ। বুনি হাত বাড়িয়ে সেই কাগজের টুকরোটা নিল। তারপর চিৎকার করে বলল, বউদি, শিগগির এস, ঝুঁটির পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে! ঝুঁটির পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে!

মেজমামা তাড়াতাড়ি কাগজের টুকরো কেড়ে নিলেন। আরে, সত্যি তো! পরীক্ষার রেজাল্টই তো বটে! একটা বিষয়েও পাস করেনি ঝুঁটি! সব বিষয়ে লাল কালির দাগ। সবচেয়ে বেশি নম্বর যা পেয়েছে, তা হল একশোর মধ্যে সাত!

মামা ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে ঘাম মুছলেন নিজের মনেই বললেন, কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর!

অফিস যাওয়ার পথেই মামার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল। অনেক হয়েছে, আর নয়। পাখি ফেরত যাবে। যার কাছ থেকে এনেছিলেন, ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন তাকে। কালই দিয়ে আসবেন। কথাটা ঠিকই। আজকালকার দিনে পাখি পোষা মানায় না। ছেলেবেলার সাধ মিটল না বলে মেজমামার মনটা বেশ খারাপ হল বটে, তবে অফিসের কাজের চাপে একসময় ভুলেও গেলেন।

মনে পড়ল সেই বাড়ি ফেরার পর।

মামিমা চা দিতে এসে অবাক হয়ে বললেন, কী হল তোমার? ঝুঁটিকে কথা শেখাবে না?

মেজমামা ভাবলেন, পাখি ফেরতের সিদ্ধান্তটা ঘোষণা করে ফেলা যাক। তারপর ভাবলেন থাকুক। চুপিচুপি নিয়ে এসেছিলেন, কাল ফেরতও দিয়ে আসবেন চুপিচুপি। মুখে বললেন, আজ একটুও সময় নেই। ক'দিন ছুটি নিয়ে মুশকিল হয়ে গিয়েছে। অফিসে কাজ জমে গিয়েছে। বাড়িতেও ফাইল নিয়ে এসেছি। রাত পর্যন্ত

কম্পিউটারে কাজ করব। এখন আর বিরক্ত কোরো না। বুনিকে বল, ঝুঁটিকে যেন আজ রাতে ও-ই খেতে দিয়ে দেয়।

সত্যি সত্যি টেবিলে ফাইল ছড়িয়ে কাজে বসে গেলেন মেজমামা। বাড়িতে ঝুঁটিকে আনার পর কম্পিউটারে হাত দেওয়ার সময়ই পাননি ধুলো ঝেড়ে কম্পিউটার চালু করলেন।

একটু দূরে দাঁড়ে দোল খেতে খেতে ঝুঁটি কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে আছে। মনিটরের আবছা নীল আলোয় তার চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে।

মেজমামা ফিসফিস করে বললেন, একবার ওঠো। শিগগিরই ওঠো একবার।

মেজমামিমা ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ক'টা বাজে? এত রাতে কী হল আবার! বিপদ আপদ কিছু?

মেজমামা ফিসফিস করে বললেন, সাংঘাতিক কাণ্ড! ওই ঘরে গিয়ে একবার দেখবে চলো, কী হয়েছে। খটখট আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে পাশের ঘরে গেলাম। গিয়ে যা দেখলাম, তা মারাত্মক। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, যা দেখলাম সেটা সত্যি নয়, আমার চোখের ভুল। তাই তোমাকে ডাকলাম।

মেজমামিমা দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত একটা। না, পাখি পাখি করে মানুষটার মাথা সত্যি খারাপ হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে।

ঘুমঘুম চোখে তিনি পাশের ঘরে গেলেন এবং চমকে উঠলেন! এ যে অসম্ভব!

দাঁড় থেকে নেমে টেবিলে বসে আছে ঝুঁটি! শুধু বসে নেই, তার সামনে মেজমামার কম্পিউটারটা খোলা।

মেজমামা উত্তেজনায় কাঁপছেন। চাপা গলায় বললেন, মনে হচ্ছে ঠোঁট দিয়ে কোনোভাবে সুইচ অন করে ফেলেছে।

দু'পা এগোতেই দেখা গেল, ঘটনা অত সহজ নয়। ঝুঁটি মুখ নীচু করে তার বাঁকানো শক্ত ঠোঁট দিয়ে কি-বোর্ডের সুইচ টিপছে। আওয়াজ হচ্ছে খট, খট, খট...।

ও কি খেলা করছে?

পা টিপে টিপে আরও কাছে গেলেন দু'জন। না, ঝুঁটি খেলছে না, সে লিখছে! টাইপ করার ভঙ্গিতে মানুষের আঙুলের মতো তার ঠোঁট চলছে! পরদায় ইংরেজি হরফে যা ভেসে উঠছে, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, তুমি কেমন আছ? আমি ভালোই আছি। এদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা অতি উৎকৃষ্ট। ভয় হচ্ছে, ওজন না বেড়ে যায়! কম্পিউটারটা খেয়াল করিনি বলে এতদিন মেল পাঠাতে পারিনি। এবার থেকে নিয়মিত মেল পাঠাব...।

মেজমামার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি মামিমার কানে কানে বললেন, কিছু বুঝতে পারছ? বুঝতে পারছ কিছু? মার্ভেলাস! অসাধারণ! ঝুঁটি কম্পিউটারে চ্যাট করছে! ইস, আমারই বুঝতে ভুল হয়েছিল। ঝুঁটি এ-যুগের কাকাতুয়া কোন দুঃখে মুখে কথা বলবে? তারা কথা বলবে কম্পিউটারে।

আমরা টিকলুকে ধরেছিলাম, শনিবার স্কুল ছুটির পর ওর মেজমামার বাড়িতে আমাদের নিয়ে যেতে হবে। আমরা ঝুঁটির কম্পিউটারে চ্যাট করা দেখব। টিকলু জানিয়েছে, সেটা সম্ভব নয়। কম্পিউটার চ্যাট একটা ব্যক্তিগত বিষয়। সেটা অন্য কারও দেখা উচিত নয়। তবে সে কথা দিয়েছে, আমাদের ঝুঁটির ই-মেল নম্বরটা দেবে। ইচ্ছে করলে, আমরা নিজেদের কম্পিউটার থেকে তার সঙ্গে গল্প করতে পারি।

রাত এগারোটার পর মেজমামা নাকি নিয়ম করে ঝুঁটিকে এক ঘন্টার জন্য কম্পিউটার ছেড়ে দিচ্ছেন।

ভূত ধরলেন বিনোদবিহারী

উল্লাস মল্লিক

প্রোফেসর বিনোদবিহারীর টেনশন শুরু হল। টেনশন হলেই তাঁর হার্টবিট বেড়ে যায়, প্রবল ঘাম হয় এবং বাঁই-বাঁই করে মাথা ঘুরতে থাকে। মোটের ওপর, কাজকর্ম ভন্ডুল। অথচ সময়টা এমনই যে, কাজ না করলে সব গুবলেট হয়ে যাবে। নিজের সুনাম যাবে, সরকার আর দেশের পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

বিনোদবিহারী ঠিক করলেন, হার্টটা বদলে নেবেন। যদিও তাঁর হার্টটা এক্সপায়ারি ডেট ফেল করেনি, কিন্তু একটু আগেভাগেই বদলে নেওয়া ভালো। বেশ কিছুদিন হল বড্ড ধকল যাচ্ছে এটার ওপর। কারণটা আর কিছুই নয়, একজোড়া ভূত। একজোড়া ভূত জোগাড় করতে গিয়ে প্রোফেসর বিনোদবিহারী একেবারে নাজেহাল। এই একুশশো তিপ্পান্ন সালে সরকার থেকে ঠিক করা হয়েছে, বাংলাদেশের কিছু ঐতিহ্যশালী কিন্তু লুপ্তপ্রায় জিনিসের একটা মিউজিয়াম বানাবে। যেমন, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। একসময় ওয়েস্ট বেঙ্গলের দক্ষিণ দিকে সুন্দরবন নামে অতি বিশাল এক ম্যানগ্রোভ অরণ্য ছিল। সেখানেই দেখা যেত অনিন্দ্যসুন্দর রাজকীয় শৌর্যের এই প্রাণীটিকে। কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য সুন্দরবন এখন জলের তলায়। আর রয়াল বেঙ্গল টাইগারও বিলুপ্তির পথে। একজোড়া রয়াল বেঙ্গল রাখা হচ্ছে মিউজিয়ামে। তেমনই ন্যাদোস মাছ। অতি সুস্বাদু এই মাছ একসময় বাংলার খাল-বিলে কিলবিল করত। কিন্তু এখন গোটা দেশ চুঁড়ে ফেললেও চোখে পড়ে না। বহু কষ্টে কয়েকটা মাত্র জোগাড় করে রাখা হচ্ছে মিউজিয়ামের অ্যাকোয়ারিয়ামে। টিকিট কেটে জনসাধারণকে দেখতে হচ্ছে ন্যাদোস মাছ।

প্রোফেসর বিনোদবিহারীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভূতের। বাংলার ভূতের সুনাম একসময় ছড়িয়ে ছিল সারা দুনিয়ায়। কত রকম ভূত যে ছিল এখানে! তাদের আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্রও কত রকমের! ব্রহ্মদৈত্যের মেজাজের সঙ্গে মেছো ভূতের মেজাজ একেবারেই খাপ খায় না। মামদোর ভাবগতিক আবার সম্পূর্ণ আলাদা। শাঁকচুন্নি আর পেতনির মধ্যেও বিস্তর ফারাক। কিন্তু সেসব দিন গিয়েছে। চারদিকে এত গিজগিজে লোক, থাম্বা থাম্বা অট্টালিকা, ঝকমকে আলো যে, ভূতেরা একটু-একটু করে কমতে-কমতে এখন একেবারে তলানিতে। তাই সরকার থেকে প্রোফেসরকে বলা হয়েছে, 'খুঁজেপেতে একজোড়া জোগাড় করে আনুন, এনি টাইপ অফ গোস্ট, অফ এনি স্পিসিস।'

বিনোদবিহারী কয়েকজন সহকারীকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। অতি সংবেদনশীল জি ডি ডি (গোস্ট ডিটেক্টর ডিভাইস) নিয়ে তারা চুঁড়ে ফেলছে গোটা দেশ। এই জি ডি ডি এমন যন্ত্র, যেটা কাছাকাছি ভূত থাকলে তার অস্তিত্ব নিখুঁতভাবে জানিয়ে দেয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। রোজ ব্যর্থ সংবাদ আসছে, 'না স্যার, ভূতের গন্ধটুকুও নেই কোথাও।'

প্রোফেসর বিনোদবিহারী ঠিক করলেন অ্যাসিস্ট্যান্টদের উপর ভরসা না করে নিজেই মাঠে নামবেন। কিন্তু তার আগে হার্টটা বদলে নেওয়া দরকার। ওয়েস্ট বেঙ্গলের হার্ট-ব্যাঙ্কের ওপর খুব একটা আস্থা নেই তাঁর। এখানকার হার্টগুলো একটু পলকা ধরনের, খুব একটা চাপ সহ্য করতে পারে না। সম্প্রতি পঞ্জাবে ভালো একটা হার্ট-ব্যাঙ্ক হয়েছে, যে-কোনো হার্টের ওপর একশো বছরের ওয়ারান্টি দেওয়া হচ্ছে। নিজের সৌরচালিত ছোট্ট গাড়িটা বের করলেন বিনোদবিহারী। এখন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে সেভেন-টাওয়ার ফ্লাইওভার, অর্থাৎ একটা ফ্লাইওভারের ওপর আর-একটা, এইভাবে পরপর সাতটা। গাড়ি চালিয়ে সবচেয়ে ওপরেরটায় চলে এলেন বিনোদবিহারী। তারপর চারশো পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিতে গাড়ি ছোটালেন অমৃতসরের দিকে।

হার্ট-ব্যাঙ্কের প্যাকিং জোনে গাড়ি পার্ক করে একটু এগোতেই প্রোফেসর গোবিন্দলাল বর্মনের সঙ্গে দেখা। গোবিন্দলাল বর্মনের ওপর ভোঁদড়ের দায়িত্ব ছিল। যত দূর জানেন বিনোদবিহারী, গোবিন্দলাল লুপ্তপ্রায় বাংলাদেশি ভোঁদড় জোগাড় করে ফেলেছেন। নিউউ চ্যানেলগুলোতে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল সংবাদটা। কারণ আর কিছুই নয়, কয়েকটি বিতর্কিত প্রশ্ন উঠেছিল ভোঁদড় দু'টোকে নিয়ে। গোবিন্দলাল ভোঁদড় দু'টোকে ধরেছিলেন আফ্রিকার জঙ্গল থেকে। প্রশ্ন উঠেছিল, আফ্রিকার জঙ্গলে বাংলাদেশি ভোঁদড় আসে কী করে? শেষে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, স্টিভ হ্যামিলটন নামে এক খামখেয়ালি সাহেব ছিলেন বহু বছর আগে। জন্তুজানোয়ার নিয়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত পরীক্ষা চালাতেন। যেমন কুমিরের জ্বর মাপতেন, বাঁদরের ব্লাডপ্রেশার দেখতেন, ছাগলের লিভার ফাংশান টেস্ট করতেন। সেসব আবার তৎকালীন কিছু চ্যানেল প্রচারও করত। তা সেই সাহেব গবেষণার কাজে ক'টা বাংলাদেশি ভোঁদড় দেশে নিয়ে যান। এই ভোঁদড় দুটো তাদেরই সাক্ষাৎ বংশধর, এতদিন কোনো রকমে টিকেছিল ওখানে।

গোবিন্দলালকে দেখে কৌতূহল দমন করতে পারেন না বিনোদবিহারী। বললেন, 'আপনি এখানে যে! আপনারও হার্টের প্রবলেম নাকি?'

গোবিন্দলাল বললেন, 'আমার নয়, মায়ের।'

'আপনার মায়ের!' একটু অবাক হয়ে গেলেন প্রোফেসর বিনোদবিহারী।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোবিন্দলাল যা বললেন তার মর্মার্থ এই যে, তিনি যখন ভোঁদড় ধরতে আফ্রিকায় গিয়েছিলেন তখন তাঁর মা বাড়িতে বসে চিন্তা করে—করে হার্টটাকে ড্যামেজ করে ফেলেছেন। ওই দুর্গম জঙ্গলে ছেলে কী করছে, এই ছিল তার রাতদিনের চিন্তা। গোবিন্দলাল যত তাঁকে বোঝান যে, আফ্রিকার সে জঙ্গল আর নেই, সেখানেও এখন মানুষ বসতি গড়েছে, এমনকী বিদ্যুৎ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। তা কে কার কথা শোনে! দিনরাত শুধু চিন্তা করেছেন ছেলের জন্য।

বিনোদবিহারী বললেন, 'মায়ের মন তো, ছেলেপুলের জন্য আনচান করবেই। যাক! আপনার আসল কাজ তো উদ্ধার হয়ে গিয়েছে। আমার যে এদিকে কী অবস্থা কী বলব!'

'আপনার তো ভূত?'

'হ্যাঁ,' বিনোদবিহারী হতাশার সঙ্গে বললেন, 'ভূত বোধ হয় ভূভারতে আর একটাও নেই! যে জিনিস নেই, সে জিনিস কেমন করে ধরে আনি বলুন তো? এদিকে মিউজিয়াম অথরিটি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, রোজ তাগাদা দিচ্ছে।'

একটু কী যেন চিন্তা করে গোবিন্দলাল বললেন, 'আছে, ভূত আছে।'

'কোথায়?' খুব ব্যগ্র হয়ে বিনোদবিহারী জিজ্ঞেস করলেন।

গোবিন্দলাল বললেন, 'আমার মামার বাড়ি বনগাঁর দিকে। কিছুদিন আগে আমার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ও বলল, ওখানে একটা পোড়ো বাড়িতে একদল ভূত এখনও আছে। তবে তারা খুবই ভিতু প্রকৃতির। ভয়টয় দেখানো দূরের কথা, নিজেরাই সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত থাকে। জনসমক্ষে কখনো আসে না। শুধু সুযোগ পেলে মাঝে মাঝে গৃহস্থের বাড়ি থেকে মাছ ভাজাটাজা চুরি করে নিয়ে যায়। ক'দিন আগেই তো, রান্নাঘরে খুটুর-খুটুর শব্দ শুনে বড় মাসিমা উঁকি দিয়ে দেখেন, কালোমতো কেউ-একটা উবু হয়ে বসে মাছভাজা খাচ্ছে। চোর-ছ্যাঁচড় হবে ভেবে বড়ো মাসিমা 'চোর-চোর' চিৎকার করে উঠলেন। সেই চিৎকার শুনে ভূতটা এত ঘাবড়ে গেল যে, বলার নয়! সোজা বড়ো মাসিমার পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'আমি চোর নই কর্তামা, ভূত। বিশ্বাস করুন, ভূত! ভ্যানিশ হওয়ার মন্ত্রটা একদম ভুলে গিয়েছি।'

'প্রথমে বড়ো মাসিমা বিশ্বাস করেননি। তিনি চুলের মুঠি ধরে লোকটাকে টেনে তুলতে গেলেন। আর অমনি কী আশ্চর্য ব্যাপার, মুণ্ডুটা ধড় থেকে খুলে এল বড়ো মাসিমার হাতে। সে এক সাংঘাতিক দৃশ্য। মুণ্ডহীন ধড়টা জোড় হাত করছে, আর ধড়হীন মুণ্ডুটা ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। এবার একটু ভয় পেয়ে

গেলেন বড়ো মাসিমা। মুণ্ডুটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন হাত থেকে। অমনি তাড়াহুড়ো করে সেই ধড় মুণ্ডুটা হাতে নিয়েই পাঁইপাঁই ছুট লাগাল।'

সব শুনে বিনোদবিহারী গোবিন্দলালের হাত দু'টি চেপে চেপে ধরে বললেন, 'ভাই, প্লিজ!একটু নিয়ে চলুন আপনার মামার বাড়ি। বড়ো উপকার হয়।'

'সে তো যাওয়া যেতেই পারে,' বিনোদবিহারী ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'তবে চলুন, আজই যাই, দেরি করা ঠিক হবে না।'

একটু চিন্তা করে গোবিন্দলাল বললেন, 'কিন্তু আজ তো ইডেনে ফাইভ-ফাইভ ক্রিকেটের ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল। ইন্ডিয়ার সঙ্গে হন্ডুরাসের খেলা। একটু মাঠে যাব ভেবেছিলাম!'

বিনোদবিহারী চুপ করে গেলেন। এই এফ-ফাইভ ক্রিকেটটাকে তিনি একদম দেখতে পারেন না। এটা খেলা নয়, সার্কাস, শুধু ধুমধাড়াক্কা চালানো। তিনি টি-টোয়েন্টির মতো ধ্রুপদী ক্রিকেটের ভক্ত। কিন্তু এখন টি-টোয়েন্টির বাজার নেই। টি-টোয়েন্টি দেখতে বসলে লোকের নাকি হাই ওঠে।

বিনোদবিহারী বললেন, 'আপনার ম্যাচ শেষ ক'টায়?'

'ন'টায়।'

'তা হলে চলুন, তারপর যাই। বনগাঁ আর কতক্ষণ লাগবে? ধর্মতলা থেকে মেট্রো করে সোজা বনগাঁ চলে যাব।'

রাতের খাওয়া দাওয়া বেশ ভারী হয়ে গেল বিনোদবিহারীর। গোবিন্দলালের দুশো তিন বছর বয়সি দিদিমা চমৎকার কিছু পদ রান্না করেছিলেন। নারকোল দেওয়া লাউঘন্ট, ছোলা দেওয়া কুমড়োর ছক্কা, বকফুল ভাজা দিয়ে অনেক ভাত খেয়ে ফেললেন বিনোদবিহারী। সিন্থেটিক ফুড খেয়ে-খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গিয়েছে। এমন সুস্বাদু খাবার বহুদিন খাওয়া হয় না। এদের ছাদের ওপর একটা কিচেন গার্ডেন আছে। পালা-পার্বণে কিংবা অতিথি-অভ্যাগত এলে দিদিমা রান্না করেন এসব।

খাওয়াদাওয়ার পর বেরিয়ে পড়লেন দু'জন। একটু এগিয়েই দেখা গেল সেই বাড়ি। আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে, বড়োসড়ো দোতলা বাড়িটা। পলেস্তরা-খসা দেওয়াল। কোথাও ছাদ ভাঙা, কোথাও দেওয়ালে ধস। বহুদিন শরিকি মোকদ্দমা চলেছে বলেই বাড়ির এমন জরাজীর্ণ দশা। সাবধানে ভিতরে ঢুকলেন দু'জন। ভিতরে বড়ো-বড়ো গাছের জঙ্গল। ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কিছু একটা ডেকে উঠল কোথাও। বিনোদবিহারী জি ডি ডি সিগনাল দিতে শুরু করলেন। একটা গাছে ঝুপঝাপ করে নড়ে উঠল কিছু। সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাগ থেকে ম্যাজিক-টর্চটা বের করলেন বিনোদবিহারী। বিশেষ প্রযুক্তিতে তৈরি এই টর্চের আলো এমনই যে, ভূতের চোখে পড়লে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিছুক্ষণ নড়াচড়া করার ক্ষমতা থাকে না। সামনের সেই ঝাঁকড়া গাছটায় টর্চের আলো ফেললেন বিনোদবিহারী এবং ভারি অবাক হয়ে গেলেন। দু'টো বাচ্চা ভূত গাছের ডালে দোল খাচ্ছে। রোগা পিঙপিঙে চেহারা। গায়ে পাটকিলে রঙের বড়ো-বড়ো লোম। অনেকটা হনুমানের বাচ্চার মতো দেখতে। শুধু মুখ আর হাত-পায়ের চেটোগুলো সাদা। ম্যাজিক-টর্চের আলো চোখে পড়তেই টুপটুপ করে গাছ থেকে মাটিতে পড়ে গেল ভূত দু'টো। বিনোদবিহারী দৌড়ে গেলেন ; ব্যাগ থেকে লম্বা একটা কন্টেনার বের করে অ্যান্টি-ভ্যানিশিং-স্প্রে ফসফস করে ছিটিয়ে দিলেন ভূত দু'টোর গায়ে। সাতাশ রকম জড়িবুটির সঙ্গে ওঝাদের হাঁচি আর কাপালিকের হাই মিশিয়ে তৈরি এই মিশ্রণ সম্প্রতি উবুন্ডুর এক বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন। এর এমনই আশ্চর্য গুণ যে, ভূতের গায়ে স্প্রে করে দিলে তার চব্বিশ ঘন্টা হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা লোপ পায়।

গোবিন্দলালও চলে এসেছেন কাছে। ব্যাগ থেকে একটা থলে বের করে ভূত দু'টোকে বিনোদবিহারী ভরে ফেললেন তার মধ্যে। গোবিন্দলাল বললেন, 'সাবধান, বাচ্চা ভূত কিন্তু খুব কামড়ায়!'

বিনোদবিহারী বললেন, 'চব্বিশ ঘন্টা ওরা কিছু করতে পারবে না!'

গোবিন্দলাল বললেন, 'কী, বলেছিলেন না আপনাকে, আছে এখানে...।'

গোবিন্দলালের হাত দু'টো ঝাঁকিয়ে বিনোদবিহারী বললেন, 'মেনি মেনি থ্যাঙ্কস! আপনার ঋণ কোনো দিনও ভুলব না।'

ঠিক তখনই কুঁই-কিক, কুঁই-কিক করে করুণ একটা কান্নার মতো শব্দ শোনা গেল। জি ডি ডি সিগনাল দিতে শুরু করেছে আবার। বিনোদবিহারী তাড়াতাড়ি ম্যাজিক-টর্চের আলো ফেললেন শব্দ অনুসরণ করে। শব্দটা থেমে গেল, কিন্তু কিছু চোখেও পড়ল না। একটু পরে আবার অন্যদিক থেকে এল সেই কান্নার মতো শব্দ। এবারেও ম্যাজিক-টর্চ জ্বেলে কিছু দেখতে পেলেন না বিনোদবিহারী।

গোবিন্দলাল বললেন, 'এটা মনে হচ্ছে মা-ভূতটা। আপনি ঠিক করে ম্যাজিক-টর্চ ফেলে ধরে ফেলুন ওটাকে।'

চুকচুক করে মুখ দিয়ে আফশোস সূচক শব্দ করে বিনোদবিহারী বললেন, 'আসলে টর্চের চার্জটা কমে গিয়েছে। চার্জারটাও ভুলে ফেলে এসেছি কলকাতায়। মা-ভূতটা চালাক খুব, আলো ফেললেই চলে যাচ্ছে রেঞ্জের বাইরে।'

গোবিন্দলাল বললেন, 'তা হলে?'

'তা হলে আর কী?' বিনোদবিহারী বললেন, 'আমার দু'টো ভূত দরকার ছিল, পেয়ে গিয়েছি। কাজ মিটে গিয়েছে আমার। চলুন।'

ঘুম ভেঙে গেল বিনোদবিহারীর। সবেমাত্র ঘুমটা এসেছিল, তখনই সেই 'কুঁইকিক' কান্নার শব্দ। কে যেন বাড়ির চারদিকে ঘুরে-ঘুরে কাঁদছে। কাল শুতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল তাঁর। বাড়ি ফেরার পর জনেজনে থলের মুখ খুলে ভূত দেখাতে হল। বাড়ির বাচ্চারা তো আবার থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আদরও করে দিল ভূতগুলোকে। গোবিন্দলাল শুয়েছেন দিদিমার কাছে। অনেকদিন পর মামার বাড়ি এসেছেন, তাই দিদিমার

কাছে শুয়ে ভূতের গল্প শোনার লোভ সামলাতে পারেন না। একা একটা ঘরে শুয়েছেন বিনোদবিহারী। মুখবন্ধ থলেটা রেখে দিয়েছেন খাটের নীচে। উঠে পড়লেন বিনোদবিহারী। ম্যাজিক টর্চটা নিয়ে বাইরে এলেন। টর্চের আলো ফেললেন চারদিকে। আরও কমে গিয়েছে আলোর তেজ। সেই নিস্তেজ আলোয় কিছু দেখতে পেলেন না তিনি।

ঘরে এসে আবার শুয়ে পড়লেন বিনোদবিহারী। ঘুমটা সবে আসব-আসব করছে, আবার সেই করুণ কান্না!

'ধুত্তোর,' বলে উঠে পড়লেন তিনি।

সকালবেলা বিনোদবিহারীকে ঘুম থেকে তুললেন গোবিন্দলাল। বললেন, 'কী করি বলুন তো?' দিদিমা খুব করে বলছেন আজ থেকে যেতে। রাতে মালপোয়া আর পুলিপিঠে করবেন।'

বিনোদবিহারী একটা আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'মালপোয়া! আহা কী খেতে! কতদিন খাইনি! পুলিফিটেও অবশ্য খারাপ লাগে না!'

মেঝের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন গোবিন্দলাল, 'এ কী! ভূত কোথায়? বস্তার মুখ যে খোলা!'

বিনোদবিহারী বললেন, 'ছেড়ে দিয়েছি।'

'ছেড়ে দিয়েছেন!' অবাক হয়ে গোবিন্দলাল বললেন, 'কেন, ছেড়ে দিলেন কেন? এত কষ্টের জিনিস...!'

একটা হাই তুলে বিনোদবিহারী বললেন, 'ধুর! ঘুমের দফারফা করে দিচ্ছিল। আমার মশাই ঘুম না হলে মাথার ঠিক থাকে না। ঘুম জিনিসটা মালপোয়ার চেয়েও বেশি ভালোবাসি!'

খুব অবাক চোখে বিনোদবিহারীর দিকে তাকিয়ে রইলেন গোবিন্দলাল। বিনোদবিহারী বললেন, 'কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদলে কি ঘুম হয়? কিন্তু মায়ের জাত যে! ঘ্যানঘ্যান করবেই। করতেই থাকবে। ঘুম, মালপোয়া যেমন ভালোবাসি, কান্না জিনিসটা তেমনই খারাপ বাসি আমি। খু-উ-ব খারাপ বাসি। তাই ছেলে দিলাম ব্যাটাদের!

মেরু-রহস্যের একাঙ্ক

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

আমার এ কাহিনির শুরু সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে। জায়গাটার নাম অবশ্য এখন আমাদের কাছে খুবই পরিচিত—ওখানকার নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড়দের দৌলতে কিন্তু ক'জন ভারতীয় ওদেশে গেছে বা ওখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে আছে জিজ্ঞেস করলে মুশকিলে পড়ব, কারণ সে খবর আমার জানা নেই। তবে আমার এ গল্পের তিন নায়ক রঞ্জন, সুজন সিং আর রামচন্দ্রন তিন জনেই জন্ম থেকেই ওদেশের বাসিন্দা।

নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে ওরা ভারতের তিন প্রান্তের লোক—রঞ্জন বাঙালি, সুজন সিং পাঞ্জাবি আর রামচন্দ্রন তামিলনাড়ুর লোক। কিন্তু হলে কী হবে, ওরা সকলেই ছেলেবেলা থেকেই স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত। তবে বাড়িতে অবশ্য নিজের নিজের মাতৃভাষায়ই কথা বলতে হ'ত, নইলে বাবা-মা রাগ করতেন, বলতেন বিদেশি ভাষা তো এখানে না বলে উপায় নেই কিন্তু তাই বলে নিজেদের ভাষা ভুলে যাওয়া মানে তো নিজেদের মনুষ্যত্ব ভুলে যাওয়া। এছাড়া ওরা তিন বন্ধু মাঝে মাঝে পরস্পরের মাতৃভাষাতেও কথা বলত। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হওয়ার ফলে তিনজনেই একে অপরের ভাষা একটু একটু শিখে ফেলেছিল।

ওঃ, জায়গাটার নামই এতক্ষণ বলা হয়নি। দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাপ খুললেই দেখা যাবে ব্রেজিলেরও নীচে এক ফালি লম্বা রাজ্য বরাবর সমুদ্র পর্যন্ত নেমে এসেছে। ব্যাস, ওইখানেই দক্ষিণ আমেরিকা খতম। আরও বেশ কিছুটা নীচে নামলে অবশ্য সমুদ্রের মধ্যে আর একটা ছোটো দ্বীপ পাওয়া যাবে যার নাম গ্রেহাম আইল্যান্ড। এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ দেশটার নাম আরজেন্টিনা—ওস্তাদ ফুটবল খেলোয়াড়ের দেশ।

তাই বলে মনে করো না রাজ্যটি খুব ছোটো। বছর কয়েক আগে ওর জনসংখ্যা ছিল দুই কোটি একত্রিশ লক্ষের মতো। এখন বোধ হয় আড়াই কোটি ছাড়িয়ে গেছে। বড়ো বড়ো পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা আর গভীর জঙ্গলে ভরা না থাকলে আরও বাড়ত। ইউরোপ থেকে স্পেনের লোকেরা গিয়ে প্রথম ও দেশটি আবিষ্কার করে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের যুদ্ধে হারিয়ে দেশটি দখল করে নেয়। প্রায় তিনশো বছর স্প্যানিশরাই রাজত্ব করে ওখানে। তার শ' দেড়েক বছর পরে দেশটি স্বাধীন হয়ে যায়। কিন্তু হালচালে স্প্যানিশদের প্রভাব ততদিনে এদেরকে ছেয়ে ফেলেছে। এখন স্প্যানিশ ভাষাই হয়ে গেছে ওদের নিজস্ব ভাষা এবং যাকে বলে রাষ্ট্রভাষা।

তোমরা হয়তো ভাবছ গল্প করার নামে আমি তোমাদের আরজেন্টিনার ইতিহাস-ভূগোল শেখাতে বসেছি। না না, মোটেই তা নয়। আমার এ গল্প ওই তিনটি ছেলেকে নিয়ে। আর তাদের এক বস্তুকে নিয়ে। অবশ্য ওদের ঠিক ছেলে বলা চলে না, তিনজনেই বড়ো হয়ে যৌবনে পৌঁছেছে, লেখাপড়ায় পাট শেষ হয়ে গেছে। দিনজনেই উচ্চশিক্ষিত আর কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে পড়ায়। সকলেই বিজ্ঞানী, তার ওদের বিষয় এক নয়।

ভারতীয় হয়েও ওরা ছেলেবেলা থেকে আরজেনটিনা বাসী হল কী করে এ প্রশ্নটা স্বভাবতই মনে আসে। উত্তরটা কিন্তু তেমন কঠিন নয়। ওদের তিন জনেরই বাবা আরজেনটিনার ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের অফিসে কাজ করেন। ছোটোখাটো কাজ নয়, বেশ উঁচু পোস্টেই, অনেক বার বদলির কথা উঠেছে কিন্তু জায়গাটা ওঁদের খুব ভালো লাগায় ওঁরা সেই বদলির আদেশ বার বার ঠেকিয়ে রেখেছেন। এখন আর তাই ও নিয়ে কর্তৃপক্ষ কোনো গোলমাল করেন না। ফলে রাজধানী বুয়েনস আয়ার্সেই ওঁরা স্থায়ী ভাবে রয়ে গেছেন। ফলে রঞ্জন, সুজন সিং আর রামচন্দ্রনেরও জীবন ছোটোবেলা থেকেই ওই বুয়েনস আয়ার্স শহরেই কেটেছে। লেখাপড়াও সব ওখানে। স্প্যানিশ ভাষা ওরা ওখানকার লোকদের মতোই ফড় ফড় করে বলে যেতে পারে।

পরিচয় তো দিলাম, কিন্তু গল্প কোথায়? দাঁড়াও, আসছি। নামেই গল্প, আসলে ওরা জানে ওগুলি গল্প নয়, স্রেফ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং এরকম অভিজ্ঞতা অল্প লোকের জীবনেই ঘটেছে। ওরাও কল্পনা করেনি কোনো দিন।

বুয়েনস আয়ার্সে স্থায়ী ভাবে থাকলেও ওদের তিন জনেরই ছিল বেড়াবার প্রচণ্ড নেশা। দক্ষিণ আমেরিকার কোনো জায়গা ওরা দেখতে বাদ দেয়নি। ঘুরেছে ওখানকার সর্বোচ্চ পর্বত শিখর একোনকাগুয়ায়ে, ঘুরে বেড়িয়েছে প্যাটাগোভিয়ার গভীর জঙ্গলে। যেখানে সবাই বেড়াতে যায় সে সব জায়গায় না গিয়ে যেখানে কেউ কোনোদিন যায় না এরকম জায়গায় ঘুরে বেড়ানোতেই যেন ওদের আনন্দটা বেশি।

পৃথিবীর ম্যাপ খুললেই দেখবে আরজেনটিনার এক পাশে রয়েছে বিরাট প্রশান্ত মহাসাগর আর নীচের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ কিছুটা গেলেই রয়েছে গ্রেহাম আইল্যান্ড। ব্যাস, তার আর একটু নীচেই রয়েছে অ্যান্টার্কটিক ওশান। যাকে বাংলায় আমরা বলি দক্ষিণ মেরু সাগর। না, সাগর নয়,—মহাসাগর। সাগর হচ্ছে সী-আর মহাসাগর আরও আরও বড়ো। তাই তাকে বলা হয় ওশান।

ওই ওশানের পরেই রয়েছে অ্যান্টার্টিকা অঞ্চল—অর্থাৎ দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু অঞ্চল। সুমেরু অর্থাৎ উত্তর মেরুর মতো দক্ষিণ মেরু কিন্তু ঠান্ডায় জলজমা বরফের রাজ্য নয়। বরফ দিয়ে মোড়া ঠিকই, কিন্তু ওর নীচে রয়েছে জল নয়, স্থল। তাই ওকে বলা হয় মহাদেশ। অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ইত্যাদির মতো ওকে দক্ষিণ মেরু মহাদেশ বললে ভুল হয় না। তাই এ যুগের ভৌগোলিকরা ওকে বলেন পৃথিবীর ষষ্ঠ মহাদেশ।

মহাদেশ হলেও ওর নীচে ডাঙার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া ভার। শুধু বরফ আর বরফ। সে বরফ কতদূর পর্যন্ত চলে গেছে আর কতখানি পুরু তার হদিস পাওয়াও কঠিন, যদিও বর্তমানে ওই মহাদেশটিকে নিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রচুর গবেষণা চালাচ্ছেন। ভারত থেকেও বেশ কয়েক বার বিজ্ঞানীর দল ওখানে কাটিয়ে এসেছেন। এমনকী ভবিষ্যতের জন্য তাঁবু খাটিয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও বসিয়ে রেখে এসেছেন আর সেখানে ভারতীয় পতাকা তুলে জায়গাটার নাম দিয়ে এসেছেন দক্ষিণ গঙ্গোত্রী।

ওরা ঠিক করেছে এবার ওরা যাবে ওই অ্যান্টার্কটিক মহাদেশ দেখতে।

রঞ্জন বলল, এখন তো ওখানে গ্রীষ্মকাল। ছ মাস ধরে তো চলবে দিন। চল, এবার আমরা ও দেশটাই ঘুরে আসি।

রামচন্দ্রন হেসে বলল, 'দিন ঠিকই। কিন্তু ওখানকার গ্রীষ্মকালের শীতও আমাদের দেশের শীতকালের দশগুণ বাড়া। সহ্য করতে পারবি তো?'

রঞ্জন হেসে বলল, 'তার জন্য দস্তুর মতো তৈরি হয়ে যেতে হবে। একটি বাঙালি মেয়ে, এখন তিনি কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়,—বোধ হয় কলকাতার কাছে যাদবপুর,—জিওলজি অর্থাৎ ভূবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা। তিনি পর্যন্ত ওখানে ঘুরে এসেছেন, আর আমরা পারব না?'

রামচন্দ্রন একটু থতোমতো খেয়ে বলল, 'তা বটে। তবে—'

রঞ্জন বাধা দিয়ে বলল, 'ওসব তবে টবে নয়। একটু খরচা বেশি হবে। জামাকাপড়, সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করতে হবে, খানিকটা পথ তো বরফ-কাটা জাহাজে যেতে হবে, তার জন্যও কিছু খরচ আছে। তাছাড়া বরফের রাজ্যে পৌঁছলে আজকাল কেউ বেশি পথ পায়ে হাঁটে না, একটা হেলিকপ্টারও ভাড়া করতে হবে, আর—'

রামচন্দ্রন বাধা দিয়ে বলল, 'আর রাত কাটাবার জন্য তাঁবু—'

রঞ্জন হেসে বলল, 'আছি তো সবাই বাপের হোটেলে। টাকাও কিছু জমিয়েছি সকলেই। কিছুটা খরচ কর। সবই ব্যাঙ্কে জমালে পৃথিবীতে থাকার কোনো মানেই হয় না। তাছাড়া এই-ই তো, টাকা খরচ করবার সময়। বয়স বেড়ে গেলে এসব উৎসাহ কি আর থাকবে?'

সুজন সিং এতক্ষণ চুপ করে ছিল, রামচন্দ্রনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আমার তো মনে হয় খরচ আমাদের পকেট থেকে সামান্যই যাবে। আমরা তো সাধারণ বেড়ানেওয়ালা হয়ে যাব না—একটা বৈজ্ঞানিক অভিযানও চালাব সেই সঙ্গে। আমাদের এমব্যাসি থেকেই হয়তো খরচটা পেয়ে যেতে পারি।'

'আর আরজেনটাইন সরকারের কাছে জানালে তাঁরাও কি কিছু সাহায্য করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন। পৃথিবীর নানা দেশের সরকার এ ধরনের বৈজ্ঞানিক অভিযানের জন্য যত টাকা খরচ করছেন, অন্তত নিজেদের প্রেস্টিজের খাতিরেই হয়তো আরজেনটাইন সরকারও তাদের শামিল হবেন। তাছাড়া আমরা নিজেরা যাই হই না কেন, এ দেশে আমাদের কিছুটা নাম হয়েছে—কলেজে পড়িয়ে। সেটাও কি ওঁরা ভেবে দেখবেন না?'

রঞ্জন বেশ জোর গলায় বলল।

রামচন্দ্রন একটু বোকা হাসি হেসে বলল, 'বেশ, তা যদি করতে পারিস আমার আপত্তি কী? আমি তো কাপুরুষ নই!'

'এইবার পথে এস দাদা!' রঞ্জন আর সুজন সিং একসঙ্গে বলে উঠল। 'তাহলে আজ থেকেই জোগাড়যন্ত্র শুরু করি।'

সুজন সিং-এর বুদ্ধিই শেষে কাজে লাগল। ওখানকার এমব্যাসি প্রস্তাবটা যেন লুফে নিলেন, আরজেনটাইন সরকারও রাজি হয়ে গেলেন—তবে শর্ত হিসেবে তাঁদের নিজেদের দু'-একজন লোককেও সঙ্গে নিতে হবে এই অভিযানের জন্য। তাঁরা লোক খুঁজতে লাগলেন—এও সেই প্রেস্টিজের খাতিরে। নইলে টাকাটা চাইবেন অথচ নাম হবে শুধু বিদেশি একটা এমব্যাসির এটা শুনলে দেশের লোক কী বলবে?

অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি লোককে পাওয়া গেল—রঞ্জনই খুঁজে বার করল। তাদেরই ইউনিভার্সিটির এক ছোকরা প্রফেসর—হ্যায়িস হেরাজিনি। একেবারে খাঁটি আরজেনটাইন। দুঃসাহসী বলে তার সুনাম আছে, তাছাড়া সে রঞ্জনদের বিশেষ বন্ধুও। তার ওপর ভালো হেলিকপ্টার চালাতে জানে। খবর শুনে সে বলল, 'নিশ্চয়ই যাব। এ সুযোগ কেউ ছাড়ে?'

তিনজনের দল চারজন হয়ে গেল। তা হোক, সরকার যখন খরচের অনেকটাই বহন করতে রাজি তখন আর ভাবনা কী?

বরফ কাটা জাহাজ একটা সহজেই ভাড়া পাওয়া গেল। ভিতরে অনেক জায়গা। ডেকে হলিকপ্টার রাখার প্রশস্ত আঙ্গিনা। আর যন্ত্রপাতি রাখবার পৃথক কেবিন। সঙ্গে দুটি তাঁবু নেবারও যথেষ্ট জায়গা আছে। আর এগুলি তো সরকারের নিজেদের ভাঁড়ারেই মজুদ থাকে।

যথাসময়ে সব রকম ভাবে তৈরি হয়ে এই ছোটো দলটি অবশেষে সত্যিই বেরিয়ে পড়ল অ্যান্টার্কটিক অভিযানের উদ্দেশ্যে। দেখতে দেখতে জল কেটে কেটে দ্রুতবেগে গ্রেহাম আইল্যান্ড পার হয়ে এল জাহাজ। এর পরই অ্যান্টার্কটিক ওশান। শীত আস্তে আস্তে বাড়ছে। জাহাজ তখনও জল কেটে কেটে চলেছে। কিন্তু না, কিছুটা পরেই মনে হ'ল সমুদ্র আর নীল নেই, তার মাঝে মাঝে সাদা সাদা বরফের ঝোপ। অবশেষে নীল রং সম্পূর্ণ মুছে গেল—সম্মুখে সবটাই সাদা বরফের ময়দান। জাহাজ সেই বরফ কেটে কেটে আরও প্রায় 2025 কিলোমিটার এগিয়ে এসে এবার একেবারে থেমে গেল। সামনে বিস্তৃত শ্বেতশুভ্র ময়দান। কোথাও উঁচুনীচু বলে মনে হল' না। আগাগোড়া পুরু বরফে এমনভাবে ছেয়ে আছে যে সে বরফ কেটে আর এক পাও এগোবার উপায় নেই। ওপরে বরফের স্তর, তার নীচেও বরফের স্তর তারও নীচে ওই একই জিনিস। বরফ কাটার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, সে সীমা বা ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে জাহাজের। এবার মালপত্র নিয়ে সেই বরফের ময়দানে নেমে পড়তে হবে।

হেরাজিনি বলল, 'আপাতত এখানেই কাছাকাছি তাঁবু দু'টো খাটানো যাক। দু'টো তাঁবুই বেশ বড়োসড়ো, ভেতরে শীত আকটাবার লাইনিংও রয়েছে, বাইরের দিকটাও ওয়াটার প্রুফ এক একটায়। দুজন করে বেশ ভালোই থাকা যাবে। কিন্তু শীত যে রকম বাড়ছে শরীরটাকে আরও গরম জামা দিয়ে না মুড়তে পারলে স্বস্তি পাচ্ছি না।' সকলেই তার কথায় সায় দিল। আরও পুরু লোমের জামা বার করে পরে নিল সবাই। দেখে মনে হ'ল মানুষ তো নয়, যেন চারটে ভাল্লুক।

'এখন তো ছ'মাস দিন চলবে, বুঝব কী করে আমাদের দেশে এখন দিন না রাত?' প্রশ্ন করল সুজন সিং।

''ঘড়ি দেখে ঠিক করতে হবে। তা ছাড়া রাতের আলো আমাদের সঙ্গে না মিললেও দিনের চেয়ে একটু ম্লান এখানে। অবশ্য আমরা হয়তো চট করে ধরতে পারব না, কিন্তু কিছু দিন এখানে থাকলে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে। তা ছাড়া আমার ঘড়িটা তো ব্যাটারি দিয়ে চলছে, ওতে শুধু সেকেন্ড, মিনিট আর ঘন্টারই চিহ্ন বসানো নেই, তারিখও বসানো আছে। চবিবশ ঘন্টা হলেই ফট করে তারিখটাও বদলে যায়। তবে আমার মনে হচ্ছে এখন আমাদের দেশে রাত্রি শুরু হয়েছে। এখানে দিনের আলো তো থাকবেই। চল যাই, শরীরটাকে আর একটু চাঙ্গা করে একটু ঘুরে আসি।'—বলল হেরাজিনি।

'চাঙ্গা করে মানে?'—প্রশ্ন করল রামচন্দ্রন।

'মানে আমার কাছে শরীর গরম করার মতো বেশ ভালো ব্র্যান্ডি আছে।'

রঞ্জন বলল, 'বিদেশে বাস করলে আমাদের কাছে ওগুলো এখনও অচল। বিশেষ করে মা ওসব বাড়িতে ঢুকতেই দেন না। তবে হ্যাঁ, একটু কফি করে নিলেই আমাদের শরীর যথেষ্ট চাঙ্গা হয়ে উঠবে।'

হেরাজিনি মুচকি হেসে বলল, 'তোমরা এখনও ওসব মানো? কিন্তু তোমাদের রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ আমি পড়েছি। রামচন্দ্র থেকে শুরু করে মুনি ঋষিরাও অনেকে ও রসে বঞ্চিত ছিলেন না। তারও আগে,—কি যেন বলে, হ্যাঁ, সোমরস। সেটাও তো ব্র্যান্ডি না হলেও ওরই সমগোত্রীয়। তা ছাড়া তোমাদের সংস্কৃতেও একটি কথা আছে কী যেন কথাটা?'

রঞ্জন হেসে বলল, 'একটা নয় দুটো, প্রথমটা হচ্ছে প্রবাসে নিয়মো নাস্তি' আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে 'যস্মিন দেশে যদাচার' বলে মানেটা বুঝিয়ে দিল।

শরীর একটু চাঙ্গা হতেই সুজন সিং বলল, 'হ্যাঁ, এবার চল, একটু চারদিকই ঘুরে আসি। দেখি বরফ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় কিনা। উত্তর মেরু বলে হয়তো একটু-আধটু জল কিংবা ভেসে বেড়ানো বরফের চাঁই-

এর দেখা মিললেও মিলতে পারত, কিন্তু এখানে ওসব বালাই আছে বলে মনে হয় না। সত্যিই এটা মহাসমুদ্র নয়, মহাদেশ।'

আন্দাজ মিনিট পনেরো হেঁটে হঠাৎ রামচন্দ্র চমকে উঠে বলল, 'আরে, এখানে এতে মানুষ এল কী করে? দেখছ না না ওই দিকে? তাকিয়ে দেখ।'

ওরা তাকিয়ে দেখল চারজনই। বেশ খানিকটা দূরে কতকগুলি মানুষ ভিড় করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, ওদের সকলেরই পোশাক এক রকম। সাদা জামার ওপর কালো ওভারকোট। প্রত্যেকেরই বেশ একটু ভুঁড়ি আছে মনে হ'ল, আর মাথায়ও সকলেই একটু বেঁটে।'

'এ কাদের দেশে এসে পড়লাম। শেষ পর্যন্তই এখানেও কি মানুষ থাকে না কি? জানতাম না তো!'

একটু পরেই মনে হ'ল ওদের মধ্যে দু'জনের বোধ হয় ঝগড়া লেগেছে। একে অপরকে ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু ধাক্কা দেবার পদ্ধতিটা ভারি অদ্ভুত। হাত-পা নেড়ে দু'জনেই দু'জনকে ওদের ওই ভুঁড়ো পেট দিয়ে প্রাণপণে ঠেলছে।

রঞ্জন এবারে হো হো করে হেসে উঠল, 'দূর, ওগুলো মানুষ হতে যাবে কেন, ওগুলো পেঙ্গুইন পাখি। ডানা দু'টো দু'পাশে ঝুলছে, ও দিয়ে ওড়া যায় না তো, তাই মানুষের মতো দু'পায়ে হাঁটে। আর লড়াই করবার সময়ে ওই রকম পেট দিয়ে গুঁতোগুঁতি করে। অন্য অস্ত্র নেই তো! পেঙ্গুইন আইল্যান্ড বলে একটা সিনেমায় আমি দেখেছি ওইভাবেই ওরা লড়াই করে।'

ওরা আরও একটু এগিয়ে গেল। পেঙ্গুইন পাখিগুলো কিন্তু ওদের দেখে মোটেই ভয় পেল না, তবে অনেকেই অবাক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল—এ কোন লোমশ জানোয়ার এল কোত্থেকে!

ওরা ওদের না ঘাঁটিয়ে দূর থেকে কয়েকটা ছবি তুলে নিয়ে অন্যদিকে মোড় ফিরল। কি জানি বাবা, যদি তাড়া করে আর পেট দিয়ে গুঁতোতে আসে! বলা তো যায় না হয়তো পেটেই সিং-এর মতো জোর ওদের। ষাঁড় ছাগল এরাও তো নিজেদের মধ্যে লড়াই করবার সময় মাথা দিয়েই ঠেলাঠেলি করে। কিন্তু কী অসাধারণ জোর সেই মাথাতেই।

এদিক ওদিক আরও দু' চারটে পেঙ্গুইন একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এবার ওরা সাহস করে ওদের আর একটু কাছে গিয়ে দেখতে লাগল। রঞ্জন বলল, 'পেঙ্গুইনও নানা জাতের আছে, তবে এ জাতের পেঙ্গুইন শুধু এখানেই বাস করে। তবে এদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে, হয়তো কিছু দিন পরেই এরা পৃথিবী থেকে লোপ পাবে। পর্যাপ্ত খাবারের অভাব এখানে।'

ওরা আর বেশিক্ষণ ঘুরল না। তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ফিরে গিয়ে কিছু খেয়ে ঘুম লাগাতে হবে। ঘড়িতে পরের দিন শুরু হলেই একটু ব্রেক ফাস্ট সেরে নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়ে আরও ভিতরের দিকে যাওয়া হবে বলে ঠিক হল।

হেলিকপ্টার উড়ে চলেছে। আকাশে সূর্যের আলো, কিন্তু মাঝ আকাশে নয়, সূর্য যেন একদিকে হেলে রয়েছে। তা যাক, অনেক দিন তো ওইভাবেই থাকতে হবে তাকে এখানে। বাতাসে ধোঁয়া নেই, ধুলো নেই অক্সিজেনটাও তাই বেশ নির্মল। বেশ ভালোই লাগছিল।

হঠাৎ দূরত্বের কাঁটা লক্ষ করে রঞ্জন বলল, 'আরে, আমরা তো প্রায় তিনশো কিলোমিটার উড়ে এলাম। আগাগোড়া একই দৃশ্য। কোনো বৈচিত্র্য নেই কোথাও। তলায় যতদূর দৃষ্টি যায় ধু ধু করছে কেবল সাদা বরফের মাঠ। আর এগিয়ে লাভ আছে?'

'আর একটু দেখি, পেট্রোল এখনও অনেকটা আছে। কিন্তু শীতটা যেন আগের চেয়ে একটু কম লাগছে না?'

তাই তো, এতক্ষণ খেয়ালেই আসেনি। ভাল্লুকের মতো গরম লোমের জামাটা এবার অনায়াসে খুলে ফেলা যায়।

সবাই নিজের নিজের ওভারকোট খুলে পাশে রেখে দিল, কিন্তু তবু মনে হ'ল শীতটা যেন এখনও কম কম লাগছে। শেষে একে একে কোট, সোয়েটার খুলে ফেলল ওরা। গায়ে রইল শুধু প্যান্ট আর টেরিকটের জামা। কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে গরম লাগছে। এ কি আশ্চর্য ব্যাপার!

সঙ্গে থার্মোমিটার ছিল, খুলে দেখে, একি, এ যে তাপমাত্রা 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস! এখানে অন্তত এ সময় শূন্য ডিগ্রির চেয়ে 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তারও নীচে থাকবে বলে ওরা ভেবেছিল। এ যে ওদের দেশের গরমকালের মতোই মনে হচ্ছে।

যতই এগুতে লাগল গরম ততই বাড়তে লাগল। শেষে ওরা গেঞ্জি পর্যন্ত খুলে ফেলে একেবারে খালি-গা হয়ে গেল। কী ব্যাপার! যতই এগুচ্ছে ততই গরম বাড়ছে। নাঃ ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে। এ যে একটা নতুন আবিষ্কার তবে কি দক্ষিণ মেরুর নানা জায়গায় নানা রকম উত্তাপ। কিন্তু তা তো হবার কোনো কারণ নেই।

একটু পরেই দেখা গেল তলাকার বরফের ময়দান আর তেমন সাদা নেই। তার নীচে মাটি দেখা যাচ্ছে। সেখানে ঘাসও গজিয়েছে। মাটি দেখে হেরাজিনি এবার হেলিকপ্টার ডাঙায় নামিয়ে আনল।

হেলিকপ্টার থেকে বেরিয়ে এল সকলেই। তখন কারও গায়ে কোনো জামা নেই। রঞ্জন বলল, 'শুনেছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যেসব আমেরিকান যুদ্ধের সৈন্য হয়ে কলকাতায় গিয়েছিল তারাও অনেকে সেখানে শীতকালেও গায়ে জামা রাখতে পারত না, সুতির প্যান্ট প'রে খালি গায়েই ঘোরাফেরা করত। শীতের দেশের লোক তো! এখানেও তো দেখছি সেই একই ব্যাপার?

একটু হাঁটতেই দেখা গেল সামনের বরফ একদম গলে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। পায়ের তলায় নরম মাটি। তার ওপর দিয়ে খালি পায়েও হাঁটা যায়। ওরা অবাক হয়ে এগিয়ে চলল।

এরপরে যে দৃশ্য ওদের চোখে পড়ল তার জন্য ওরা একটুও প্রস্তুত ছিল না। সামনে রয়েছে একটা বেশ বড়ো হ্রদ। টলটলে নীল জলে বাতাস লেগে মৃদু মৃদু ঢেউ উঠছে।

হ্রদ দেখেই রঞ্জন বলল, 'এমন সুন্দর জলে একটু নেমে স্নান করে নিলে কেমন হয়? একটু সাঁতার কাটা যাবে। আরামও লাগবে। বলেই সে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল জলে। গোটা দুই ডুব দিয়ে, খানিকটা সাঁতারও কেটে এগিয়ে চলল, সামনের দিকে। রামচন্দ্রন চেঁচিয়ে বলল, বেশি দূর যাস না। অজানা জায়গা, ভিতরে কোনো অজানা জলজন্তু থাকাও অসম্ভব নয়। মুখে বলল বটে, কিন্তু সেও সঙ্গে সঙ্গে জলে নেমে পড়ল। তারপর বাকি দু'জনও।

রঞ্জন ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, এদিককার জল যে আরও গরম! যেন কেউ উনুনে জল গরম করে সবটা ঢেলে দিয়েছে! তারপরেই 'ওরেবাপ!' বলে সে দারুণ ভয় পেয়ে পেছন দিকে ফিরতে শুরু করল। একটু কাছে এসে বলল, 'একি কাণ্ড ভাই! যতই এগোচ্ছিলাম জল ততই গরম লাগছিল। পরে মনে হ'ল সামনের জল থেকে দস্তুর মতো ধোঁয়া বেরুচ্ছে আর টগবগ করে ফুটছে সেই জল। এই ঠান্ডা বরফের রাজ্যে এ যে এক ভোজবাজি বলে মনে হচ্ছে। চল, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। আর অবগাহন স্নানে দরকার নেই। সকলেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। তার কথা শুনে, কেবল রামচন্দ্রন আর একটু পরীক্ষা করে দেখবার জন্য খানিকটা এগিয়ে গেল। আরজেন্টিনার মানুষ হলে কী হবে সে তামিলনাড়ুর ছেলে, তাদের আদি বাড়ি তিন সমুদ্রের মিলনস্থল কন্যাকুমারিকায়। দেশে তেমন না গেলেও তার বাবা মা দু'জনেই ওস্তাদ সাঁতারু। বুয়েনস আয়ার্সের কাছেই সমুদ্র। ওঁরা প্রায়ই সেখানে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে যান। ছেলেকেও সেখানেই সমুদ্রে সাঁতার কাটা শিখিয়ে দেন।

একটু পরে অবশ্য তাকেও ফিরতে হল। পাড়ে উঠে প্যান্টের পকেট থেকে বড়ো রুমাল বার করে নিংড়ে নিয়ে সকলেই গা-মাথা যতটা সম্ভব মুছে ফেলল। হেরাজিনি বলল, 'এবার তাঁবুর দিকে ফেরা দরকার। সঙ্গে যা পেট্রোল আছে তা নিয়ে আর সামনে এগোনো ঠিক হবে না, তাঁবু পর্যন্ত ফিরতে হবে তো!'

হেলিকপ্টারের কাছে এসে তারা আরও অবাক হয়ে গেল। হেলিকপ্টারের চারপাশের নরম মাটি আরও নরম হয়ে গিয়ে হেলিকপ্টারটা তার মধ্যে অনেকটা বসে গেছে। অত্যন্ত ভয়ের সঙ্গে তাড়াতাড়ি হেরাজিনি

হেলিকপ্টারটার কাছে নেমে এল, একটু পরীক্ষা করে বলল, 'প্রভু যিসাস-এর দয়ায় রোটারটা এখনও ঘুরবার মতো অবস্থায় রয়ে গেছে, আর একটু বসে গেলে আর ওকে তোলা যেত না। বলেই সে কালবিলম্ব না করে হেলিকপ্টারে উঠে বসে সেটা চালিয়ে দিল। রোটারটা যেন বার দুই থতোমতো খেয়ে শেষে ঘুরতে শুরু করল, হেরাজিনি আস্তে সেটাকে ওপরে উড়িয়ে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে নামিয়ে নিল। বন্ধুদের ডেকে বলল, 'চল, আর দেরি করা ঠিক হবে না। তাড়াতাড়ি উঠে বোস।'

তাদের চারজনের মধ্যে রামচন্দ্রন ভূবিজ্ঞানের ছাত্র। কলেজে সে জিয়োলজিই পড়ায়। দেখা গেল, আর সবাই কথাবার্তা বললেও সে যেন চুপ করে কী ভাবছে।

তাই চুপচাপ কেন রে? রহস্যের সন্ধান কিছু পেয়ে গেছিস বুঝি? তোদের জিয়োলজি কী বলে?

রামচন্দ্রন হঠাৎ যেন চমকে উঠে বলল, 'মনে হচ্ছে কিছু যেন বলে। তোরা উঠে এলে আমি আর একটু সাঁতরে গিয়ে যে আভাস পেয়েছি তা সত্যি হলে সমস্ত ব্যাপারটাই ব্যাখ্যা বেরিয়ে পড়বে। তবে দেশে গিয়ে একটু লাইব্রেরি ঘাঁটতে হবে। তারপর যা ভাবছি তা যদি সত্যি সত্যি মিলে যায় তবে একটা বড়ো থিসিস হয়ে যাবে।'

'তার মানে? একটু বল না। পুরোপুরি জিয়োলজিস্ট না হলেও আমরা সকলেই অল্পসল্প ও জিনিসটা ভেবেছি।'—বলল রঞ্জন।

রামচন্দ্রন আবার যেন কী ভাবছিল, রঞ্জনের কথা শুনে যেন আবার সংবিৎ ফিরে পেল, বলল, 'জানিস তো পৃথিবীকে আজ আমরা যেমন দেখছি চিরকাল সেটা এ রকম ছিল না। যুগে যুগে এর রূপ বদলেছে। কখনো এসেছে টেম্পারেট ক্লাইমেট অর্থাৎ মাঝামাঝি অবস্থা, —যেমন আমাদের দেশে এখন চলছে। কখনো এসেছে তুষার যুগ, কখনো এসেছে খরার যুগ—এগুলিকে আমরা ভূতাত্ত্বিক যুগ বলি। বছর দিয়ে এগুলি মাপা যায় না। কোনোটা হয়তো একবার এলে দশ লক্ষ বছর ধরে চলে, কোনোটা হয়তো আরও বেশি, কোনোটা আবার অনেক কম। খরার যুগ এলে সব কিছু শুকিয়ে যায়। জলের অভাবে গাছপালা জন্মাতে পারে না, জল খেতে না পেয়ে কত প্রাণীর বংশ এভাবে পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য লোপ পেয়ে গেছে। কেউ কেউ যুগের সঙ্গে তাল রেখে একটু একটু চেহারা বদলে অন্য চেহারাও নিয়ে টিকে গেছে। তেমনি এসেছে বারে বারে তুষার যুগ। তাও লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। ঠান্ডায় শীতে সব কিছু চাপা পড়ে ধবংস হয়ে গেছে, লোপ পেয়ে গেছে কত জাতের প্রাণী। পৃথিবীর দুই মেরুর দেশে সেই তুষারযুগ এখনও চলছে। একটু হয়তো কমেছে, কিন্তু একেবারে শেষ হয়নি। তাই পৃথিবীর এই দুটি অংশ এখনও বরফ দিয়ে ঢাকা।

'কিন্তু সব সময় এ রকম ছিল না। ধর আজ থেকে দেশ লক্ষ বছর আগের কথা। তখন এই দক্ষিণ মেরুতেও তুষার যুগ আসেনি, ছিল আমাদের মতোই টেম্পারেট ক্লাইমেট। তখন এদেশ ছিল সজীব, গাছপালাও নিশ্চয়ই ছিল, ছিল নানা জাতের প্রাণী—যার একটিও এখন দেখা যায় না। আর ছিল নদী, হ্রদ আর পাহাড়। পাহাড়গুলির মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয় ছিল আগুনে পাহাড়—যাকে আমরা বলি ভলক্যানো। সেগুলি যখন জীবন্ত ছিল তখন তা থেকে বেরিয়ে আসত রাশি রাশি ধুলো, লাভা অর্থাৎ গলা পাথর, ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস আর আগুন তো থাকবেই। তাদেরও উৎপাত বড়ো কম ছিল না। অবশ্য কালক্রমে সেগুলো সবই এখন চিরকালের জন্য নিভে গেছে। কিন্তু সব আগ্নেয়গিরিই একেবারে নিভে নাও যেতে পারে। হাজার হাজার বছর ধরে হয়তো ওই নিভন্ত অবস্থায়ই তারা থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন নতুন করে জেগে ওঠে —শুরু হয় তাদের অগ্নি উদগিরণের পালা।'

'আমার মনে হয় আমরা যে হ্রদে নেমেছিলাম সেখানেও ছিল ওই রকম একটা আগ্নেয়গিরি যেটা হাজার হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ বছর আগে নিভে গিয়েছিল। কিন্তু তার ভিতরকার আগুন হয়তো একেবারে চিরকালের জন্য নেভেনি—ছিল ঘুমন্ত অবস্থায়—ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি ডরম্যান্ট অবস্থা। তারপর এল তুষার যুগ। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিটা সেই নিভন্ত অবস্থায়ই পড়ে রইল, তার ওপর ছড়িয়ে পড়ল বরফের স্তর। কতদিন ধরে তা বলা এখন কঠিন, কিন্তু হঠাৎ একদিন তার ঘুমন্ত অবস্থার ছেদ পড়ল—শুরু হল অগ্নি

উদগিরণ। তার ওপরে তখন বরফ চাপা কিন্তু আগুনের তেজ অনেক বেশি। ওপরের বরফ গলিয়ে ফেলে সে সেই বরফকে জল করে ফেলল—যার ফলে তৈরি হল এই হ্রদ। হ্রদের আশপাশের বরফও তার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেল না। সে বরফ গলে বেরিয়ে গেল, পড়ে রইল তলাকার নরম মাটি—যার মধ্যে আমাদের হেলিকপ্টার প্রায় বসে যাচ্ছিল।

হ্রদে নেমে গরম জল দেখে আমারও হঠাৎ খুব অবাক লাগছিল। অবশ্য তার আগেই সেই গরমের তাপ আমরা হেলিকপ্টারে বসেই টের পাচ্ছিলাম। জলে নেমে আমি রঞ্জনের চাইতেও একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম। কী দেখলাম জানিস? দেখলাম একটি জায়গা থেকে বেশ খানিকটা বুড়বুড়ি উঠছে। বুড়বুড়ি ওঠা মানে ভিতর থেকে খানিকটা গ্যাস বেরিয়ে আসছে। শুধু বুড়বুড়ি নয়, তার ওপর থেকে বেরিয়ে আসছিল কালো কালো ধোঁয়া। জলের ওপর দিকে কয়েকবার আগুনের স্ফুলিঙ্গও আমার চোখে পড়ছিল। খানিকটা যেন গন্ধকের গন্ধও পাচ্ছিলাম। এই ব্যাপার ক্রমাগত চললে আশপাশের জল তো টগবগ করে ফুটবেই। রঞ্জনও তা লক্ষ করেছে। অগ্নি উদগিরণ যখন আরও বাড়বে তখন হ্রদের জল আর জল থাকবে না, বাষ্প হয়ে মেঘের আকারে উঠে যাবে। জায়গাটা হয়ে যাবে শুকনো একটা মাঠের মতো।'

'চারদিকে বরফের চাঁই, মাঝখানে এই অদ্ভুত কাণ্ড এ কেবল ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির হঠাৎ জেগে ওঠার ফল ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয় বলেই মনে হচ্ছে। যদি এ রকম একাধিক নিস্তব্ধ আগ্নেয়গিরি এখানে থাকে এবং তারা এক এক করে ফের সজীব হতে শুরু করে তা হলে কি কাণ্ডটাই না ঘটবে, এই একটা আগ্নেয়গিরির জেগে ওঠা থেকেই আমরা আন্দাজ করতে পারি। তা যদি হয় তা হলে দক্ষিণ মেরু আর তুষারাচ্ছন্ন থাকবে না, শেষ হবে তার তুষার যুগ। এ থেকে অনেক কিছু ঘটতে পারে। বরফ গলা সেই জল যদি শূন্যে বাষ্প হয়ে উঠে যায় তাহলে সমস্ত আকাশ হয়তো বছরের পর মেঘ ঢাকা পড়ে যাবে। আর যদি তার আগে এগুলো তরল অবস্থায় স্রোতের মতো বেরিয়ে আসে তাহলে ছুটে যাবে আন্টার্কটিক ওশানের দিকে। ওশান বা মহাসাগর হলেও ত জল ধরে রাখার সাধ্য তারও হবে না—সে জল বন্যার আকার নিয়ে ভাসিয়ে ফেলবে গ্রেহাম আইল্যান্ড, ভাসিয়ে ফেলবে গোটা আরজেনটাইন রাজ্য, এমনকী ব্রেজিলও চলে যেতে পারে সেই বিরাট জলরাশির তলায়।'

'তোরা ভাবছিস এসব আমার কল্পনা। এখন কল্পনা বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু সেরকম দিন যদি আসেই তখন আর তা কল্পনায় থাকবে বলে মনে হয় না—হবে রূঢ় বাস্তব ঘটনা। আমরা হয়তো দেখে যাবার জন্য ততদিন টিকে থাকব না, কিন্তু পরবর্তী যুগের ছেলেদের সে অভিজ্ঞতা হবেই।'

রামচন্দ্রন চুপ করল। হেলিকপ্টার তখন ধীরে ধীরে মাটিতে বরফের ময়দানের ওপর নেমে পড়েছে। পেট্রোলও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

এখন আমাদের অভিযান এখানেই শেষ করে আবার সব গুছিয়ে নিয়ে উঠতে হবে সেই বরফকাটা ময়দানে। তারপর বরফের বদলে আবার সেই জল আর জল। তারপর একদিন ফের আরজেনটাইনের মাটিতে গিয়ে নামতে হবে।' বলল হেরাজিনি।

রামচন্দ্রন বলল, 'একটা অভিযানে কিন্তু কিছুই হবে না। আসছে বছর কিংবা তারপরের বছর আবার আমরা এখানে আসব, আরও তৈরি হয়েই আসব। তখন হয়তো দেখা যাবে এক নতুন দৃশ্য। জেগে-ওঠা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি জায়গাটার চেহারা একদম বদলে দিয়েছে, নাকি আবার সে ঘুমিয়ে পড়েছে তার লক্ষ লক্ষ বছরের নিশ্চিন্ত ঘুমে। সে ঘুম তার কেনো একদিন ভাঙবে, আবার সে জেগে উঠবে কিছুদিনের জন্য তার দুরন্ত মূর্তি নিয়ে কে বলতে পারে।'

ঘনাদার চিংড়ি-বৃত্তান্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

'হয়তো!' হ্যাঁ, বাক্যটা ঘনাদার মুখ থেকেই উচ্চারিত হল। কিন্তু কেমন যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় ওই শব্দটুকু মুখ দিয়ে বার করেই গুম হয়ে গেলেন ঘনাদা। 'কেন হয়তো?'

কী হয়তো? কেন হয়তো? এমন অনেক প্রশ্নই তখন মনের মধ্যে তো বটেই, জিহ্বাগ্রেও যে এসেছিল, তা অস্বীকার করব না। কিন্তু ঘনাদার মুখ-চোখে একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের ছায়া দেখে তা উচ্চারণ করতে আর সাহস করিনি।

ঘনাদার মুখ দেখে তাঁর মনের ভাব বুঝব, এত বড়ো ধুরন্ধর আমরা কেউ নই। তবু মনে হচ্ছিল একটা কী বিষয়ে তিনি যেন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে মনস্থির করতে পারছিলেন না।

তাঁর মনে যে অস্থিরতাটা, সেটা এক হিসেবে 'না' আর 'হ্যাঁ'-এর দ্বন্দ্বও হতে পারে।

'হয়তো' বলে তিনি যে একটা সম্ভাবনার আভাস দিচ্ছিলেন, সেটা আমাদের কাছে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি প্রকাশ করবেন কি না, এই নিয়েই তাঁর মনে বেশ প্রবল দ্বিধা ছিল বলে মনে হয়।

শেষ পর্যন্ত এ-দ্বিধায় মীমাংসায় 'না'-র ওপরে 'হ্যাঁ'-ই যে জয়ী হল, এ আমাদের ভাগ্য।

'হ্যাঁ।' মনের দ্বিধা কাটিয়ে উঠে ঘনাদা তাঁর 'হয়তো'কে বিস্তারিত করে বললেন, 'হয়তো সে ঠিক খবরই পাঠিয়েছিল। কিন্তু...'

'কিন্তু'র পর যে দীর্ঘ নীরবতা, সেটা প্রায় যন্ত্রণায় পৌঁছে দিয়ে ঘনাদা তাঁর বক্তব্যটা পেশ করলেন। বললেন, 'কিন্তু 'কানুড়ি' থেকে ফাং-এ অনুবাদ করাতেই হয়তো ভুল হয়েছে। আর, তারপর 'হাউসা'য় তার 'কান'গুলো 'ধান' হয়ে সব এমন বরবাদ করে দিয়েছে যে, আমি সোজার বদলে উলটো খবরই পেয়েছি।'

মুখটা তাঁর পক্ষে যতখানি সম্ভব করুণ করে ঘনাদা চুপ করলেন। কিন্তু আমরা যে তখন একেবারে অকুল পাথারে! ঘনাদার প্রথম 'হয়তো'র পরেই যেটুকু ফাঁপড়ে পড়েছিলাম, 'ফাং' 'হাউসা' 'কানুড়ি'র জালে জড়িয়ে তা যে একেবারে গোলক-ধাঁধার ফাঁদ হয়ে উঠল।

কী বলছেন ঘনাদা? মানে বলতে চাইছেন কী?

সোজাসুজি সে-কথা যে জিজ্ঞেস করব, তার উপায় নেই। কারণ অমন বেয়াদপিতে উত্তর যা মিলবে, তাতে নখ কাটাতে গিয়ে আঙুল কাটিয়ে ফেলার ঝক্কি নেওয়া হবে।

তার চেয়ে ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করাই ভালো। নিজের পাকানো জট ঘনাদা সময়মতো নিজেই কি আর খুলবেন না?

সেই ধৈর্য ধরেই থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অবুঝ গৌরটার জন্যে তা থাকা আর হল কই?

'কী হাং-ফাং করছেন?' ঘনাদাকে সে একটু গরম গলাতেই জিজ্ঞেস করে বসল, 'হিং টিং ছটের মতো মন্তর-টন্তর নাকি?'

'না, মন্তর-টন্তর নয়?' ঘনাদার গলার ঝাঁঝটুকু আর লুকনো নেই এবার, 'কিন্তু ওগুলো কী, বোঝাতে গেলে একটু ভূগোলের পরীক্ষা আগে নিতে হবে।'

'ভূগোলের পরীক্ষা?' সভয়ে জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, 'কী পরীক্ষা ঘনাদা?'

'না, এমন কিছু পরীক্ষা নয়,' ঘনাদা আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'শুধু ক'টা অতি সোজা প্রশ্নের জবাব। যেমন, কোন দেশে একসঙ্গে আবলুস, সেগুন, মেহগনির সঙ্গে প্রচুর তাল-তমাল যেমন পাওয়া যায়, তেমনি প্রচুর পাওয়া যায় অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, টিন, বক্সাইড থেকে হিরে আর সোনা?'

একটু থেমে আমাদের মুখের ভাবটা লক্ষ করে ঘনাদা এবার বললেন, 'এসব যদি একটু কঠিন প্রশ্ন মনে হয়, তা হলে একটা মাত্র অতি সোজা প্রশ্ন করছি। যার উত্তর জানলে দেশটার নাম বলতে আর কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। প্রশ্নটা হল এই, কোন দেশে এই শতাব্দীর গোড়ায় 1909 আর 1922-এ দু'বার এক আগ্নেয়গিরি থেকে দারুণ অগ্ন্যুদগার হয়েছে?'

কী জবাব দেব এ-সব প্রশ্নের?

ভ্যাবাচাকা ভাবটা কোনোরকমে লুকোবার চেষ্টা করে মাথা চুলকোবার অভিনয়ই করছিলাম, তারই মধ্যে 'শুনুন ঘনাদা,' বলে গৌর হঠাৎ মুখ খোলায় সত্যিই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

ঘনাদা এমনিতেই খুব ভালো মেজাজে আছেন বলে মনে হচ্ছে না। তার ওপর বেয়াড়া কিছু বলে গৌর যদি তাঁকে গরম করে দেয়, তা হলে অন্তত আজকের দিনের মতো আমাদের বাহাত্তর নম্বরের মজলিস একেবারে মাটি।

কিন্তু ভয় যা করছিলাম, উলটোটাই তার হল।

জাতে পাগল হলেও গৌর যে তালে ঠিক, তা বোঝা গেল তার পরের কথায়!

বেয়াড়া কিছুর বদলে, গরম হওয়ার বদলে ঘনাদা তাতে গলে একেবারে জল।

কী এমন বললে গৌর, যাতে খোঁচানো সাপও ফণা তুলতে ভুলে যায়? কী সে মন্তর?

না, হাত কচলানো খোশামুদি গোছের কিছু নয়। বরং তাতে 'ফোঁস' করার ঝাঁঝই একটু আছে বলা যায়। কিন্তু কাজ হল ওই ফোঁসানির সুরেই।

মিষ্টি সুরে-টুরে নয়, গৌর ঘনাদার ওপর অভিমানেই নালিশ জানিয়ে বললে, 'অত ভূগোলের পরীক্ষা যদি দিয়ে হয়, তা হলে পি. আর এস. ; পি এইচ. ডি ডিগ্রির পিছনেই তো ছুটলে পারি! তার বদলে এই বাহাত্তর নম্বরে আপনার মুখ চেয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকব কেন? মোড়ের দোকানে এক চেঙারি হিঙের কচুরির অর্ডার দিয়ে এসেছি। বনোয়ারি তা নিয়ে নীচের গেটের মুখেই বোধহয় পৌঁছে গেছে। রামভুজের সেগুলো প্লেটে-প্লেটে সাজিয়ে পাঠাতে যা দেরি। কিন্তু এখন আর কী হবে তাতে, সব ঘাস লাগবে মুখে, হ্যাঁ, ঘাস।'

গৌর চুপ করল এমন একটা হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে, আমাদেরই দু'চোখের পাতাগুলো কেমন যেন একটু ভিজে-ভিজে হয়েছে মনে হল।

ঘনাদারও তা-ই হল কি না জানি না। কিন্তু তাঁর গলায় এবার যে সুরটা শোনা গেল, সেটা স্পষ্টই সান্ত্বনার।

'আহা! হিঙের কচুরি ঘাস হতে যাবে কেন?' তিনি আশ্বাস দিলেন, 'এই আমাদের মোড়ের জহর হালুইকরের হিঙের কচুরি তো? ও আজ বিকেলে আনিয়ে কাল সকালে মুখে দিলেও মুচমুচে থাকে। তবে...'

ঘনাদার হিঙের কচুরির কৌলীন্য-বিচার আর হল না। বিরাট ট্রে'র ওপর কচুরি-সাজানো প্লেট নিয়ে বনোয়ারি তখন আড্ডা-ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকল। সে ঢোকার আগেই তার ট্রে'র ওপরকার প্লেটে সাজানো কচুরির গন্ধেই অবশ্য আড্ডা-ঘর মাত হয়ে গেছে।

2

বনোয়ারি তাঁর হাতেই প্রথম প্লেটটা তুলে দিল, তার ডবল সাইজের কচুরির তাক যে প্লেটের ওপর প্যাগোডার মতো, তা বোধহয় আর বলতে হবে না।

সেদিকে চেয়ে অন্তরের খুশিটা অকপট উচ্ছ্বাসে প্রকাশ করেই ঘনাদা বললেন, 'হিঙের কচুরি কী হে, এ তো রাধা-চুরি! মানে রাধাবল্লভি আর কচুরির দ্বন্দ্ব-সমাস। তা বড়ো বেশি দিলে যে! এত কি আর এ-বয়সে শেষ করতে পারব?'

'খুব পারবেন, খুব পারবেন,' সবাই আমরা জোর গলায় আশ্বাস দিলাম, 'বয়স আপনার আর কি, চল্লিশই তো পার হয়নি।'

'চল্লিশ...! বলো কী হে!' ঘনাদা বিষম খাওয়াটা কোনোরকমে সামলে বললেন, 'আমার চল্লিশ...'

'মানে?' চটপট বাধা দিয়ে বললাম, 'চল্লিশে পৌঁছে ঠেকে গেছে আর কি! পার হতে তো পারছে না! তাই বলছি...'

তাই আর কিছু বলতে হল না। যে-কারণেই হোক, ঘনাদা একটু বেশিরকম খুশি হয়ে তাঁর প্লেটের রাধা-চুরি প্যাগোডার ওপর চুড়ো হিসেবে আরও দুটো শেষ করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে শিশিরের এগিয়ে ও জ্বালিয়ে দেওয়া সিগারেটটায় ক'টা সুখটান দিয়ে যেন ধাতস্থ হয়ে, প্রায় মেজাজের অসীম প্রসন্নতার পরিচয়

দিয়ে নিজে থেকেই গোড়ায় ধরা প্রসঙ্গটা স্মরণ করে বললেন, 'হ্যাঁ, ভূগোল শেখায় তোমাদের আপত্তি জানাচ্ছিলে, না? কিন্তু ভূগোলের প্রশ্ন কেন তুলেছিলাম জানো? তুলেছিলাম, যা বলতে যাচ্ছি, ভূগোল কিছুটা না-জানা থাকলে তার রহস্যটাই ঠিক বোঝানো যাবে না। ভূগোলের ক'টা সোজা প্রশ্ন মাত্র তোমাদের করেছি। প্রশ্ন আর-দুটো বেশি করলে হয়তো উত্তরটার আভাস তোমরাও পেতে। এই যেমন যে ক'টা প্রশ্ন করেছি তার ওপর যদি জানতে চাইতাম, কোন দেশে, কোথায় গোরিলাও যেমন, সিংহও তেমনি পাওয়া যায়, তা হলে তোমরা চটপট উত্তর দিতে—আফ্রিকা। কিন্তু আফ্রিকা তো একটা বিরাট মহাদেশ। শুধু আফ্রিকা বললেই তো হবে না, আফ্রিকার কোথায়, বোঝানো যাবে না। সুতরাং শুধু আফ্রিকা বললেই হবে না,আফ্রিকার কোথায়, সেটা সঠিক জানা চাই।

'সঠিক জায়গাটা এখনও হয়তো ধরতে পারোনি বলেই বলে দিচ্ছি জায়গাটা। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে এমন একটা অঞ্চল, যার বর্ণনা দেওয়া খুবই শক্ত। গাছপালা আর ধাতু-সম্পদের কথা আগে আমার প্রশ্নে যা বলেছি, তাতেই বোঝা যাবে যে, জায়গাটার বৈচিত্র্যের শেষ নেই। দেড়শো থেকে দু'শো ফুট উঁচু গাছের ঘন জঙ্গল যেমন আছে, তেমনি আছে শুধু কাঁটাঝোপের বিস্তীর্ণ আধা-মরু অঞ্চল। একদিকে গোরিলা শিম্পাঞ্জিদের যেমন দেখা মেলে, তেমনি দেখা যায় উটপাখির পাল।

'আর বেশি বর্ণনা দিতে গেলে রাত কেটে যাবে। তাই জায়গাটার নামটা বলেই ফেলি। নাম হল 'ক্যামেরুনস'। বর্ণনা আগে যেটুকু দিয়েছি, তার ওপরে বলতে পারি যে, যেমন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে তেমনি ইতিহাসের চমক দেওয়া কিছু ঘটনার বিশেষত্বে আফ্রিকার এই উত্তর-পশ্চিম কোণের ভূখণ্ডটির একটা নিজস্ব মূল্য আছে।

'ক্যামেরুনসের উত্তর-পশ্চিমে পোর্তুগিজরা প্রায় চারশো বছর আগে সমুদ্র-কূলে যেখানে নামে, সেখানকার একটি নদীকে তারা 'চিংড়ির নদী' নাম দিয়েছিল। 1919-এর এক শীতের মরসুমে একদিন সেখানে এক বুনো চেহারার সাহেবকে নিয়ে এই কাহিনি শুরু করতে হয়। সাহেবের চেহারাটা বুনো হলেও পোশাক-আশাক চালচলন সব একেবারে বাদশাহি মেজাজের। মাথায় ঝাঁকড়া চুলের একটা বোঝা, আর মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল বাদে মানুষটার সবকিছুই ভদ্র, ফিটফাট আর মানানসই। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল আর মাথায় জট-পাকানো চুলের ঝোপ। সেটা তাঁর মুখের কোনো কাটা ঘায়ের দাগ-টাগ ঢাকা দেওয়ার ফিকির হতে পারে।

'মানুষটা চিংড়ি নদীর ধারে একটা বড়ো গঞ্জের পাশে একটা মস্ত বাহারি তাঁবু পেতে সেখানে ডেরা বেঁধেছেন। এর মধ্যে ওখানকার কাফরি গাঁয়ের সর্দারকে নিজের তাঁবুতে নেমতন্ন করে খানাপিনায় আপ্যায়িতও করেছেন বারকয়েক।

'তাঁর মতলবও কিছু লুকোবার নেই। এখানে এসে ডেরা বাঁধবার পরেই তিনি এ-তল্লাটের যে দুই যমজ ঘটোৎকচের মতো দৈত্যাকার বান্টুকে তাঁর কাজে লাগিয়েছেন, তারাই সাহেবের পরিচয় দিয়ে শতমুখে তার প্রশংসা করে তার এ মুলুকে আসার উদ্দেশ্য সকলকে জানিয়েছে।

'তাদের কাছে জানা গিয়েছে, সাহেবের নিজের দেশ হল বিলেত। নাম তাঁর ডা. লক। অজানা দেশে পাড়ি দিয়ে সেখানকার অজানা সব রহস্য খুঁজে বার করে তার যতটা সম্ভব খবরাখবর বার করাই তাঁর কাজ। এ-কাজে ডা. লক দুনিয়ার অনেক জায়গায় বহু বিপদের ঝক্কি মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর মাথা ও মুখের বুনো চেহারার আসল কারণ এমনি এক দারুণ আচমকা বিপদে পড়া। সে-বিপদে তাঁর মুখের ও মাথার চামড়া অনেকখানি পুড়ে সাদা হয়ে যায়। কোনোরকমে শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচলেও বীভৎস চেহারার লজ্জায় তিনি আর পোড়া মুখ কাউকে না দেখাবার জন্যে মুখ ও মাথায় অমন জঙ্গল বানিয়ে রেখেছেন।

'এখন এই চিংড়ি নদীর মোহানায় তাঁর আস্তানা পাতবার কারণ কিন্তু তাঁর সেই অজানা দেশের রহস্য জানবার নেশা। এই ক্যামেরুনসের ভেতরে এক জায়গায় যে এক দারুণ আগ্নেয়গিরি আছে, তা সবাই জানে। মাঝে-মাঝে বহু বছর অন্তর সেই আগ্নেয়গিরি খেপে উঠে আগুন উগরে তুলে ছড়ালেও তার সঠিক

হদিস সভ্য জগতের কেউ এখনও জানে না। ডা. লক সেই রহস্য সন্ধানের অভিযানে যাবার জন্যে পথের দিশারি হবার মতো একজন ও অঞ্চলের সেথো চান। তাঁর দুই যমজ ঘটোৎকচের মতো পাহারাদারকে তিনি সেই খোঁজেই লাগিয়ে রেখেছেন। এই যমজ দানবদের পাহারাদারের কাজে নেওয়া একটা বিশেষ কারণ আছে। ডা. লকের কে একজন নাকি পরম শত্রু তাঁর সুনামের হিংসায় বহুকাল থেকে তাঁর পেছনে লুকিয়ে লেগে থেকে হয় তাঁর আবিষ্কারের গৌরব চুরি করে নিজের বলে প্রচার করতে, নয় সেটা সম্ভব না হলে তাঁর বড়ো রকমের কোনো ক্ষতি করবার চেষ্টা করে আসছে। তার বিরুদ্ধে পাহারা দেবার জন্যেই ডা. লক এবার একজন নয়, গোধা আর লোধা নামে দুই যমজ ঘটোৎকচ ভাইকে নিজের কাজে লাগিয়েছেন।

গোধা আর লোধা শুধু শরীরের ক্ষমতাতেই দুর্দান্ত দানব নয়, তারা কাজের লোকও বটে।

'লক-সাহেব চিংড়ি নদীর ধারে দিন-পাঁচেক তাঁবু ফেলবার পরেই তারা একজনকে জোগাড় করে আনে গঞ্জের এক বাজার থেকে।

তাকে দেখে ডা. লক হেসেই খুন।

'আরে এ কাকে এনেছিস?' হাসতে হাসতে ডাঃ লক জিজ্ঞেস করেন গোধা-লোধাদের, 'এ চিমসে শুঁটকোটা তো তোদের চিংড়ি নদীর সত্যিকারের একটা কুচোচিংড়ি।'

'ডাঃ লকের কথায় লজ্জা পেলেও লোধা-গোধা নিজেদের একটু কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করে বলে, 'আজ্ঞে, আপনি মিছে ঠাট্টা করছেন কেন? ও চিমসে চিংড়ি হলে আমাদের লোকসানটা কী? ওকে তো আর কুস্তি লড়তে হবে না। শুধু আমাদের পথ দেখিয়ে যেখানে যেতে চান সেখানে নিয়ে যাবে।'

'লোধা-গোধার যুক্তিটা যে ঠিক, ডা. লককে এবার তা স্বীকার করতে হয়। তিনি তাই হাসি থামিয়ে একটু ভাবনার সঙ্গেই জিজ্ঞেস করেন, 'কিন্তু ওকে যা ঠাট্টা-অপমান করলাম, এর জন্যে ও আর আমার কাজ করতে চাইবে কি?'

'খুব চাইবে, খুব চাইবে,' আশ্বাস দিয়ে বলে লোধা-গোধা, 'দেখতে পাচ্ছেন না, কেমন অবাক হয়ে হাঁ করে তাঁবুর সব জিনিসপত্র দেখছে। ও আমাদের কথা কিছু বুঝেছে কি যে, ঠাট্টা-অপমানে রাগ করবে?'

'কিছু বোঝেনি মানে?' ডা. লক ভয় পেয়েই জানতে চান, 'ও কি বদ্ধ কালা-টালা নাকি? তা হলে...'

'না, না, কালা হবে কেন?' লোধা-গোধা এবার বুঝিয়ে দেয় ডাঃ লককে, 'আমরা তো বান্টুতে কথা বলেছি, ও তার কী বুঝবে?'

'বুঝবে না কী রকম?' ডা. লককে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতে হয়, 'ও কি বান্টু জানে না?'

'এক বর্ণও না,' লোধা-গোধা জানায়, 'বান্টু কেন, ওর নিজের ভাষা কানুড়ি ছাড়া হাউসা, ফুলানি, ফাং কিছুই জানে না।'

'ঠিক, ঠাক,' ডা. লক খুশি-মুখে এবার বলেন, 'নিজের ভাষা ছাড়া আর কিছু জানে না, এমন লোকই আমাদের সবচেয়ে দরকার। আজই ওকে কাজে নাও।'

'তাই নেওয়া হল সেই দিনই। কাজে নেবার সময় নামটা নিয়ে শুধু একটু গোল বেধেছিল।

'খাতায় লেখার জন্যে তো বটেই, তাকে ডাকবার জন্যেও একটা নাম তো দরকার। কিন্তু নিজের কোনো নামই সে বলতে পারে না। সে যেখানে থাকে সেখানে গোনাগুনতি ক'টা তার মতো জংলির মধ্যে ডাকাডাকির কোনো দরকারই নাকি হয় না। হলেও তারা 'এই' 'ওই' বলে ডেকেই তাদের কাজ সারে।

'কিন্তু সেখানকার নিয়ম চলে না। নাম তো একটা দরকার। শেষকালে জংলিটা নিজেই বললে, এই কার্মার্দে মানে চিংড়ি নদীর মোহানাতেই যখন সে প্রথম কাজ পেয়েছে তখন তার নাম চিংড়িই রাখা হোক।

'ডা. লক খুশি হয়ে বলেছেন, 'ঠিক ঠিক। ওর যা চিমসে কুচোচিংড়ির মতো চেহারা, তাতে ওই নামই ওর ভালো।' মানুষটা জংলি হলেও তার মাথাটা একেবারে নিরেট নয় দেখেও তিনি খুশি হয়েছেন।

'চিংড়িটাকে প্রথমে তার কাজ বুঝিয়ে দেওয়া একটু শক্ত হয়েছে। বুদ্ধিশুদ্ধি নিরেট না হলেও লোকটা একেবারে জংলি। সাহেবসুবো তো দূরের কথা, সাধারণ একটু ভালো অবস্থার গৃহস্থ বান্টু কি হাউসাদের

ঘরদোরের খবরও জানে না।

'ডা. লকের তাঁবুতে বেশি কিছু দামি ও বিদেশি আসবাব না থাকলেও, তাঁর কাজের জন্যে যা দরকার সেরকম কিছু যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ছিল। তাঁর তাঁবু ঝাড়পোঁছ করবার সময় ডা. লক সেগুলো সম্বন্ধে তাকে হুঁশিয়ার হওয়ার নির্দেশ দিতে বলেছিলেন তাঁর খাস-পাহারাদার লোধা আর গোধাকে। তাই দিতে গিয়ে প্রায় কেলেঙ্কারি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

'জরিপ-টরিপের জন্য দরকারি যন্ত্রপাতি ছাড়া ডা. লক তাঁর কাজের সুবিধের জন্য একটা টেপরেকর্ডার তাঁর সঙ্গে রেখেছিলেন। তিনি যে-ধরনের অভিযানে এসেছেন, তার প্রাত্যহিক বিবরণ রাখা একান্ত দরকার। একালে সে-বিবরণ হাতে লেখার তো কথাই আসে না। টাইপ করার জন্যে সঙ্গে টাইপরাইটার রাখাও একটা বাড়তি বেয়াড়া বোঝা বওয়া। ডা. লক তাই একটা ছোটো টেপরেকর্ডার সঙ্গে নিয়েছিলেন, যাতে তাঁর অভিযানের প্রতিদিনের বিবরণ তিনি মুখে বলে টেপ-এ ধরে রাখতেন।

'সেই যন্ত্রটা নিয়েই গণ্ডগোল বেধেছিল প্রথমে। পরে সাফসুফ করার সময় ও যন্ত্রে হাত না দিতে বলার জন্যে রেকর্ডারটা একরটু চালিয়ে দেখাতে যেতেই হাউমাউ করে চিৎকার করে পড়ি কি মরি অবস্থায় চিংড়ি তো তাঁবুর বাইরে দে ছুট। সে তখন এই ভূতুড়ে তাঁবুর কাজ ছেড়ে দিতে চায়। লোধা-গোধাকে তারপর অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে তাঁবুতে ফেরাতে হয়েছে।

'এরপর আর বিশেষ গোলমাল-টোলমাল হয়নি। যে-কাজের জন্যে তাকে নেওয়া, সে-কাজে চিংড়ি বাহাদুরিই দেখিয়েছে দিন কয়েকের মধ্যে। ক্যামেরুনসের এই অঞ্চল প্রায় অজানা জঙ্গল-পাহাড়, আবার আধা-মরুর দেশ। বুনো মোষ, হাতি, গণ্ডার, সিংহ থেকে হিংস্র জংলি আদিবাসীদের এড়িয়ে সেখানে প্রতি পদে প্রাণ হাতে নিয়ে টহল দিতে হয়। এ কাজে চিংড়ি কিন্তু দারুণ বাহাদুর। ডা. লক ক্যামেরুনসের ভিতরের দিকে চাড হ্রদের কাছে এক আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি অঞ্চলেই যেতে চান। প্রায় চোদ্দো হাজার ফুট উঁচু সেই আগ্নেয়গিরি নয়, তার কাছাকাছি 'নিশ' নামে এক হ্রদই তাঁর লক্ষ্য।

'পদে-পদে যেখানে বিপদ, সেই সম্পূর্ণ অজানা, অতি দুর্গম দেশে চিংড়ি কিন্তু কোন অদ্ভুত ক্ষমতায় সবচেয়ে নিরাপদে আর তাড়াতাড়ি লক্ষ্যের দিকে পৌঁছচ্ছে বোঝা গেল।

'এদিক দিয়ে পুরোপুরি খুশি হবার কারণ থাকলেও, ডা. লক তখন কিন্তু দারুণ ভয় আর দুর্ভাবনায় পড়েছেন। তাঁর যে দুশমনের ভয়ে লোধা-গোধার মতো দুই যমজ ঘটোৎকচকে তিনি পাহারায় নিয়েছেন, তার হাত থেকে তিনি যে রেহাই পাননি, তা তিনি এই অভিযানে চিংড়ি নদীর মোহানা থেকে রওনা হবার ক'দিন পরেই টের পেলেন।

'সে দুশমন যে তাঁর সঙ্গেই আছে তার প্রথম প্রমাণ যা পাওয়া গেল, তা খানিকটা যেন ঠাট্টার মতো ব্যাপার। অভিযানের বিবরণ টেপরেকর্ডারে তুলে রাখলেও পথের হদিস ধরে রাখবার জন্য ডা. লক খুব সংক্ষেপে একটা মানচিত্রের খসড়া লিখে আর এঁকে রাখতেন। সেই খসড়া মাপের ওপর একদিন হঠাৎ কিছু হিজিবিজি কাটা দেখা গেল।

'সেই হিজিবিজি কাটাকুটিতে ভাবনার খুব বেশি কিছু ছিল না। চিংড়িই হয়তো তাঁবুর ঝাড়পোঁছ করবার সময় অসাবধানে বা জংলি খেয়ালে তাতে অমন দাগ কেটে থাকতে পারত, কিন্তু সেই হিজিবিজির পাশে স্পষ্ট অক্ষরে যা লেখা, সেটাই তো অবিশ্বাস্য একটা রহস্য।

'হিজিবিজির আগে পাশে গোটা-গোটা হরফে স্প্যানিশে লেখা 'ট কোয়ে তাল আমিগো?'

'ডা. লক স্প্যানিশ না জানলেও ও ক'টা কথার মানে জানেন। ও কথাগুলোর মানে হল, 'কেমন আছ বন্ধু?'

'এই অজানা বিদেশে এক গোপন অভিযানে এতদূর আসবার পরে তাঁর দুই যমজ দানব আর এক জংলি নফরের পাহারা দেওয়া তাঁবুতে ঢুকে এ-কাজ কার পক্ষে কেমন করে সম্ভব হতে পারে?

'সম্পূর্ণ ভৌতিক ছাড়া ব্যাপারটার তো আর কোনো ব্যাখ্যা হয় না।

'অত্যন্ত অস্থির হলেও ব্যাপারটা নিয়ে হইচই না করে ডা. লক রহস্যটা বুঝবার জন্যে কিছুদিন নিঃশব্দে সজাগ থাকবেন বলে ঠিক করলেন।

'কিন্তু তার ফল যা হল, তাতেই তাঁর হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম।'

3

গল্প বলতে-বলতে চুপ করে গেলেন ঘনাদা। কী হল? কেন আর তিনি মুখ খুলছেন না? কেন যে খুলছেন না, শেষ পর্যন্ত শিশিরই সেটা বুঝতে পেরে এগিয়ে দিল তার সিগারেটের টিন। ঘনাদা তার থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ফের শুরু করলেন তাঁর গল্প।

'যেমন তাঁর নিয়ম, তেমনি সেদিন সকালের খাওয়া-দাওয়ার পর ডা. লক তাঁর টেপরেকর্ডারটা নিয়ে তাঁর অভিযানের আগের দিনের বিবরণ রেকর্ড করবার ব্যবস্থা করছিলেন।

'কিন্তু যন্ত্রটা দেখেই তো তাঁর চক্ষুঃস্থির।

'তাঁর আগে কেউ যে সেটা ব্যবহার করেছে, তার স্পষ্ট চিহ্ন সেখানে রয়েছে।'

'সেটা নিয়ে যে নাড়াচাড়া করা হয়েছে তা লুকোবার কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। যেখানে যন্ত্রটা থাকে, তার বদলে টেবিলের অন্য একধারে অগোছালো কাগজপত্রের মধ্যে এমনভাবে সেটা ফেলে রাখা হয়েছে, যাতে ওখানে যে অন্য কারও হাত পড়েছে, তা বুঝতে কোনো কষ্ট না হয়।

'এরপর যন্ত্রটা চালাতে যা শোনা গেল, তাতে ভাবনায়, আতঙ্কে হাত-পা ঠান্ডা হবার জোগাড়। স্পষ্ট জার্মান ভাষায় সেখান থেকে তখন শোনা যাচ্ছে, 'আমি তোমার সঙ্গে আছি ডা. লক। আর লক, তোমার আসল নাম যে ক্রুল, তা আমার জানা!'

'টেপরেকর্ডারের কথা ওইটুকুতেই শেষ হয়েছে। কিন্তু যেটুকু ওখানে আছে তাই শুনেই ডা. লক তখন চোখে অন্ধকার দেখছেন বলা চলে। প্রথমত, নিজের ঠিকমতো হুঁশ আছে কি না সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল। সত্যিই, নেহাত স্বপ্নে ছাড়া এরকম ব্যাপার ঘটা কি সম্ভব? মনের সংশয় কাটাবার জন্যে টেপরেকর্ডারটা একবারের জায়গায় ডা. লক বারবার, অন্তত দশবার চালিয়ে দেখলেন।

'না, তাঁর মনের ভুল নয়। সত্যিই কে একজন স্পষ্ট চলিত জার্মান ভাষায় ওই কটা কথা সেখানে রেকর্ড করিয়ে রেখেছে।

'কিন্তু কার দ্বারা, কেমন করে তা সম্ভব? এ-কাজ যে করেছে, তার তো এই অভিযানের সঙ্গেই থাকা দরকার। যে দুর্গম অজানা সব অঞ্চলের ভিতর দিয়ে চিংড়ি তাঁদের নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কারও অজান্তে তাঁর দলের রাস্তা ধরেই লুকিয়ে সঙ্গে থাকা প্রায় অসম্ভব।

'আর তা-ও যদি সম্ভব হয়, তা হলেও তাঁবুর ভেতর কখন কীভাবে ঢুকে সে এ-কাজ করবে? তাঁবুর মধ্যে যে তিনি নিজে অধিকাংশ সময় থাকেনই। আর তা ছাড়া লোধা-গোধা দু'জনেই সারাক্ষণ থাকে কড়া পাহারায়। চিংড়ির কথা ধরবারই নয়। তবু তাকেও বাদ না দিয়ে ডা. লক লোধা-গোধার সঙ্গে তাকে ডেকে অত্যন্ত কড়া ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

'লোধা-গোধা দু'জনেই তো ডা. লকের জেরা শুনে একেবারে হতভম্ব। এই সফরে তাদের সঙ্গে লুকিয়ে আসা কেমন করে সম্ভব?

'আর যদিও লুকিয়েচুরিয়ে কেউ তাদের কাছাকাছি আসতে পেরে থাকে, এ-তাঁবুর ভিতরে ঢুকে সাহেবের যন্ত্রপাতি ছোঁবার সময়-সুযোগ সে পাবে কী করে?

'লোধা-গোধার কাছে এর চেয়ে এ-রহস্যের হদিস পাবার মতো উত্তর লক আশা করেননি। তবু তাদের তিনি হয়রান করে মেরেছেন। সম্ভব-অসম্ভব হাজার রকম প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েই বিদায় দিতে হয়েছে তাদের।

'লোধা-গোদার পর এ-ব্যাপারে হদিস পেতে জংলি চিংড়িকে ডাকার কোনো মানে হয় না।

'তবু কোনো দিকে ত্রুটি রাখবেন না বলে লক লোধা-গোধাকে দিয়ে তাকেও ডাকিয়ে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে চিংড়ির ভাষা কানুড়িতে তাকে জেরার ব্যবস্থা করেছেন। সে-জেরায় প্রথম প্রশ্নের উত্তরে চিংড়ির কথা শুনে কিন্তু তিনি থ। লকের হুকুমে লোধা-গোধা চিংড়িকে কানুড়িতে জিজ্ঞেস করেছিল, সে এ-তাঁবুতে কাজ করবার সময় আর কাউকে কখনো দেখেছে কি না।

'চিংড়ি তাতে যা উত্তর দিয়েছে তা শুনে একেবারে থ হয়ে লোধা-গোধা সেটা অনুবাদ করে লক-সাহেবকে বুঝিয়ে দিতেই গেছে ভুলে।

'লক তাদের হতভম্ব ভাব দেখে ধমক দিয়ে ওঠার পর তারা থতোমতো খেয়ে চিংড়ি যা বলেছে তা জানিয়েছে।'

'চিংড়ি যা জানিয়েছে, তাতে তাদের হতভম্ব হবারই কথা অবশ্য। চিংড়ি বলেছে, সে নাকি তাঁবুতে রোজই আর-একজনকে দ্যাখে।'

'রোজই আর-একজনকে দ্যাখে? কখন?' লক লোধা-গোধাকে দিয়ে জিজ্ঞেস করিয়েছেন।'

'কখন আবার?' চিংড়ি জানিয়েছে, যতক্ষণ সে এ-তাঁবুতে থাকে, সারাক্ষণই।

'সারাক্ষণই?' লোধা-গোধার মারফত কথাটা শুনে কী মনে করবেন ভেবে না পেয়ে লক রাগে দাঁত খিঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'কোথায়? এ-তাঁবুর কোথায়, কোনখানে?'

'লোধা-গোধার কাছে প্রশ্নটা শুনে নির্বিকারভাবে চিংড়ি যা দেখিয়ে দিয়েছে, তাতে হাসবেন না জ্বলে উঠবেন ডা. লক তা ঠিক করতে পারেননি।'

'চিংড়ি যা দেখিয়ে দিয়েছে সেটা তাঁবুর এক ধারে লকের চুল আঁচড়ানো, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম রাখার জন্য টেবিলের ওপর ঝোড়ানো একটা আয়না।

'জংলিটাকে তখনকার মতো হাসতে-হাসতে তাঁবু থেকে দূর করে দিলেও ব্যাপারটা নিয়ে লকের দুর্ভাবনা ক্রমশ চরমে উঠেছে।

'চিংড়ির দেখিয়ে দেওয়া পথ ধরে তখন তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গেছেন।

'কাঁটাঝোপের আধা-মরু পাথুরে ডাঙা পার হয়ে যেতে-যেতে মাঝে-মাঝে ছোটোখাটো হ্রদ আর শুকনো গভীর খাদ তাঁদের পথে পড়েছে। দূরে একটা আকাশ-ছোঁয়া যে পাহাড়ের চূড়া তাঁদের চোখে পড়েছে, সেটা ক্যামেরুনসের আগ্নেয়গিরি ছাড়া আর কিছু নয় বলে বুঝেছেন লক।

'কিন্তু এই সময়ে এমন কিছু হয়েছে, যাতে তাঁর মাথা ঠান্ডা রাখাই শক্ত হয়ে পড়েছে। ব্যাপার যা ঘটেছে তা লকের টেপরেকর্ডারটা সম্পর্কেই।

'প্রথম সেখানে অজানা ভূতুড়ে কণ্ঠ শোনার পর বেশ কিছুদিন আর কিছু হয়নি। ক্যামেরুনসের আগ্নেয়গিরি দেখার পরই একদিন সকালে টেপরেকর্ডারে আবার সেই ভূতুড়ে গলা হঠাৎ সোচ্চার হয়েছে উঠেছে, 'শোনো, শোনো ব্রুল,' টেপরেকর্ডার থেকে পরিষ্কার জার্মান ভাষায় শোনা গেছে, 'যেখানে তুমি চেয়েছিলে সেখানে তুমি প্রায় পৌঁছে গেছ বললেই হয়। আর-একদিন কি একবেলা গেলেই নিয়ল হ্রদের কাছাকাছি তুমি পৌঁছে যাবে। কিন্তু নিয়ল হ্রদ কি ক্যামেরুনসের আগ্নেয়গিরি তো সত্যিই তোমার লক্ষ্য নয়। তোমার আসল লক্ষ্য, এই অঞ্চলের অসংখ্য সব অজানা গুহা-গহ্বর। এমন অদ্ভুত সন্ধানে কেন তুমি এসেছ, তা যে আমি জানি, তা বুঝতে পেরেছ কি? না পেরে থাকলে দুনিয়ার সবাই যা জানে সেই পুরনো ইতিহাস তোমায় একটু স্মরণ করিয়ে দেব। একটা দিন শুধু ধৈর্য ধরো।'

'টেপরেকর্ডার ওইখানেই চুপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ধৈর্য ধরবেন কী, রাগে, ভয়ে, দুর্ভাবনায় প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন ডা. লক। টেপরেকর্ডারের কথায় যাঁর আসল নাম লক নয়, ব্রুল।

'ভেতরে ভেতরে খেপে গেলেও ব্রুল এবার চেঁচামেচি করে লোধা-গোধা কি চিংড়িকে ডাকাডাকি করেননি। তার বদলে, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা দিয়ে টেপরেকর্ডারের সঙ্গে এমন কটা বৈদ্যুতিক তার লাগানো কলের ফাঁদ পেতে রেখেছেন যে, রেকর্ডারে কেউ হাত দিলেই একটা হঠাৎ ঝিলিক দেওয়া আলোয় গুপ্ত একটা ক্যামেরায় তার ছবি উঠে যাবে।

'ছবি ঠিকই উঠল। তবে তা ব্রুলের নিজেরই ছবি। রেকর্ডারের সঙ্গে ক্যামেরার গুপ্ত সংযোগের কৌশলটা করে রেখে ব্রুল সেদিন কাছাকাছি অঞ্চলের একটু ভাসা-ভাসা জরিপের কাজ করেছেন। সেখানকার গুহা-গহ্বর, ছোটোখাটো পাহাড় ঢিবি হ্রদ ছকে রাখবাব জন্যে। এ-কাজে লোধা-গোধা আর চিংড়ি তাঁবুর পাহারা ঠিকই রেখেছে, আর তাঁকে তাঁর দরকার-মতো সাহায্য করেছে।

'সন্ধেবেলায় ক্লান্ত হয়ে তাঁবুতে ফিরে প্রথমেই টেপরেকর্ডারের দিকে গিয়ে তাঁর ক্যামেরার ফাঁদ কী রকম কাজ করেছে দেখার ইচ্ছে হলেও তিনি নিজের ওপর রাশ টেনে রেখেছেন।

'তারপর লোধা-গোধা আর চিংড়ি তাঁবুতে তাদের কাজ সেরে চলে যাবার পর অতি সাবধানে রেকর্ডারের কাছে গিয়ে সেটা চালাবার সুইচ টিপতেই আচমকা সেই অদ্ভুত ব্যাপার।

'তাঁর নিজের পাতা ক্যামেরার ফাঁদে হঠাৎ আলোর ঝিলিকে তাঁর নিজেরই ফ্ল্যাশ ছবি উঠে গেছে। আর সেইসঙ্গে চালু হওয়া টেপরেকর্ডারের অজানা ভুতুড়ে গলায় শোনা গেছে, 'বড়ো দুঃখিত ব্রুল, তোমার পাতা ফাঁদে তোমাকেই কাবু করতে হল। কিন্তু এখন বাজে কাজে আর কথায় নষ্ট করবার সময় নেই। আসল কথা যা তোমায় বলতে চাই, তার জন্যে দুনিয়ার সকলের যা জানা নেই, সেই পুরনো ইতিহাসটা তোমায় নতুন করে একটু আগে শুনিয়ে দিতে হবে। আজ যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমের এই

অঞ্চলটা জার্মানদের অধিকারে ছিল। এখানকার জার্মানি নয়, আগেকার জার্মানি। প্রথম মহাযুদ্ধ হবার পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের অধীন জার্মান সাম্রাজ্যের অনেক কিছুর মধ্যে এইসব জায়গার অধিকারও ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের হাতে চলে গেছে।

'পৃথিবীর নানা দেশ জয় করে সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যাপারে ইংরেজরাই ছিল ইউরোপের আর-সব দেশের চেয়ে এগিয়ে। তখনও উড়োজাহাজের দিন শুরু হয়নি। পৃথিবীর সমুদ্রে-সমুদ্রে যার যত বেশি রণতরীর প্রাধান্য, তার সাম্রাজ্যও তত বিরাট। সেদিক দিয়ে ইংল্যান্ডের পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্যের সূর্য কখনো অস্ত যেত না বলে ছিল ইংরেজদের গর্ব।

'ইংরেজদের পরে এ-বিষয়ে দ্বিতীয় বৃহৎ বিশ্বসাম্রাজ্য ছিল ফরাসিদের। এই দুই জাতের পরে এদিকে দৃষ্টি দেয় বলে জার্মানির সাম্রাজ্য ছিল অনেক ছোটো। কিন্তু পৃথিবীর যেটুকু জায়গা তারা অধিকার করেছিল, নানা দিকে তার উন্নতি বিধানের চেয়ে সেগুলি থেকে যতখানি সম্ভব সম্পদ সংগ্রহ করার ব্যাপারে তারা ছিল বুঝি সব দেশের চেয়ে অগ্রসর। এই অঞ্চলটাতেও তারা অনেক দিক দিয়ে অনেক কিছু বড়ো কাজ শুরু করেছিল। মহাযুদ্ধে হারের দুঃখ যেমন, তেমনি এইসব অধিকার হারাবার অপমান আর জ্বালা জার্মানদের অনেকেই ভুলতে পারেনি। আগের জার্মান সাম্রাজ্য লোপ পেলেও আবার নতুন করে পৃথিবী জয় করবার স্বপ্ন শুধু নয়, সে স্বপ্ন সফল করার সাধ্য-সাধনের জন্যে যারা গোপনে গোপনে তৈরি হচ্ছে, তাদের নেতার নাম অ্যাডলফ হিটলার। হিটলার এখনও একটা জঙ্গিদলের সর্দার মাত্র। দেশপ্রেমের নামে পৃথিবীর আর সব দেশকে পায়ের তলায় চেপে শুধু হিংসা-ঘৃণা-স্বার্থপরতাই যেখানে মানুষের ধর্ম, বিশ্বের সঙ্গে শুধু প্রভু আর ক্রীতদাসের সম্বন্ধে বাঁধা এমন এক দানবীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাই গড়ে তুলতে চাইছে সে।

'এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইউরোপের অন্য দেশের তুলনায় জার্মানি যে বিজ্ঞানে কিছুটা বেশি অগ্রসর, তার প্রমাণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আকাশযান হিসেবে তার জেপেলিন তৈরি, সুদূর জার্মানি থেকে প্যারিসে গোলাবর্ষণ ইত্যাদির মতো ব্যাপারেই কিছুটা পাওয়া গিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হেরে গেলেও সেই বিজ্ঞান-উদ্ভাবন দিয়েই হিটলারের দল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে তা জিতবার স্বপ্ন দেখছে।'

'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যুদ্ধে-নামা ইউরোপের সব দেশই পয়জন গ্যাস অর্থাৎ বিষ-বাষ্প ব্যবহার করার কথা ভেবেছিল। নানারকম বিষ-বাষ্প উৎপাদন করে তা জমা করে একটু-একটু ব্যবহারের পর বিষ-বাষ্প যে আর ব্যবহার করা হয়নি, তার কারণ, ঢিলের বদলে পাটকেল খাবার ভয়। তখন যারা বিষ-বাষ্প তৈরি করেছিল, সে-সব-দেশই তারপর সে-সব গ্যাস সাবধানে নানা জায়গায় জমা করে লুকিয়ে রাখে।

'প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কাজে না লাগালেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তা যে ব্যবহার হবে না, সে-কথা কে বলতে পারে! হিটলারের জার্মানি তাই অস্ত্র হিসেবে বিষ-বাষ্প জমা করে রাখতে চায়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে হেরে তার হাত-পা অনেক দিক দিয়ে বাঁধা। পয়জন গ্যাস বানাতে গেলে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাদের চোখে তা ধরা পড়বারই কথা। পড়লে সব মতলব ভেস্তে যাবে। এ-সঙ্কট কাটাবার উপায় বার করবার জন্যেই 'ডা. লক' নাম নিয়ে তোমার মতো গুপ্ত নাতসির আসরে নামা। জার্মানি বিষ-বাষ্প খোলাখুলি এমনকী লুকিয়েও তৈরি করতে গেলে বিপদ আছে। তা থাক, বিষ-বাষ্প উৎপাদনের বদলে কোনো অজানা জায়গায় মজুত গ্যাস জোগাড় করবার ব্যবস্থা করলে তো সেভাবে ধরা পড়বার ভয় নেই।'

কোথায় কোন অজানা জায়গায় সেরকম মজুত লুকনো গ্যাসের সঞ্চয় আছে? কোথায় আছে, তা আর কেউ না জানুক, জানে 'ক্রুল' নামে এক জার্মান ভবঘুরে আধা-বৈজ্ঞানিক। দুর্গম অজানা সব দেশে টহল দিয়ে নানারকম অদ্ভুত খবর সংগ্রহই যার নেশা।

সেই ক্রুল, প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির হার হওয়ার পর যুদ্ধের সময় জার্মানির হয়ে গুপ্তচরগিরি করার অপরাধে মিত্রশক্তির গোয়েন্দা-পুলিশের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে যে নানা জায়গায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল।

জার্মানিতে হিটলারের অধীনে নতুন নাতসি দল গড়ে ওঠে, আবার জার্মানির বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু হবার পর। আগের যুদ্ধের মজুত করা পয়জনগ্যাস কাজে লাগাতে পারে ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রুলের মনে পড়ে

আগেকার এক আবিষ্কারের কথা। সে নতুন করে তা খুঁজে বার করবার কথা ভাবে।

'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে তার ভবঘুরে টহলদারির সময় যে ক্যামেরুনসের আগ্নেয়গিরির চারধারে ছোটো-ছোটো হ্রদের অঞ্চলে অনেক অনেক গুপ্ত হ্রদের গহ্বর দেখেছিল, যার ভেতর থেকে মাঝে-মাঝে বিষ-বাষ্প বেরিয়ে আশপাশের জংলিদের বসতিতে মড়ক লাগাত। সে তখনই বুঝেছিল যে, এইসব গুপ্ত হ্রদের গহ্বরের তলায় এমন প্রচুর বিষ-বাষ্পের সঞ্চয় আছে, যা বাইরে ছাড়া পেলে সারা দেশে মড়ক বাধিয়ে দিতে পারে। জার্মানির হারের পর সেখানকার অনেক পুরনো পাপী নাম ভাঁড়িয়ে যথাসম্ভব চেহারা পালটে তিন দেশে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল। সে-চেষ্টায় সফল তারা সবাই হয়নি। আসল পাপীরা অধিকাংশই ধরা পড়ে, তাদের উচিত-শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। শুধু পাকা শয়তানদের তালিকা দেওয়া খাতায় তোমার নাম ছিল না বলে নয়, জার্মানির ভাগ্যের আকাশ যে অন্ধকার হয়ে আসছে, তা একটু আগে থাকতে বুঝে ইউরোপ ছেড়ে এই আফ্রিকায় এসে লুকোবার জন্যেও তুমি এ-যাত্রায় বেঁচে গেছ।

'এই জংলা প্রবাসে কখনো খেয়ালি ভবঘুরে, কখনো টহলদার খ্রিস্টান সাধু সেজে তুমি ক্যামেরুন-আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে নিয়ল হ্রদের আশেপাশে গুপ্ত সব বিষ-বাষ্পের যেমন সন্ধান পেয়েছ, তেমনি জার্মানিতে কে এক অ্যাডলফ হিটলারের অধীনে জার্মানিকে আবার বিশ্বজয়ী করে তুলবার জন্যে এক নাতসি দলের অভ্যুত্থানের কথাও শুনেছ।

'এরপর লুকিয়ে বার-কয়েক ইউরোপ গিয়ে হিটলারের চেলা-চামুণ্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করে তুমি তোমার আবিষ্কার-করা পয়জন-গ্যাসের সঞ্চয়ের কথা জানিয়ে তার সঠিক-হদিস-জরিপ-করে-দেওয়া মানচিত্র প্রস্তুত করে রাখবার জন্য আবার এই ক্যামেরুনসে রিও দে কার্মার্দে মানে চিংড়ি নদীর মোহানায় এসে নিয়ল হ্রদের অঞ্চলে যাবার সবচেয়ে সোজা আর নিরাপদ রাস্তা দেখতে এই এক জংলি চিংড়িকে কাজে লাগিয়েছ।'

ঘনাদা যে ফের মুখ বন্ধ করেছেন, তার কারণ অবশ্য আর কিছুই নয়, ইতিমধ্যে আর-এক প্রস্থ চা এসে গিয়েছিল। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শিশিরের টিন থেকে সিগারেট ধরিয়ে তিনি আবার গল্পের খেই ধরলেন।

'দাঁতে দাঁত চেপে টেপরেকর্ডরের কথা শুনতে শুনতে ব্রুল হঠাৎ চমকে উঠে টের পায়, যে-কথাগুলো সে শুনেছে, সেগুলো টেপরেকর্ডার থেকে নয় তাঁবুর মধ্যে এইমাত্র ঢোকা সেই জংলি চিংড়িটার মুখ দিয়েই বার হচ্ছে।'

'জংলিটা কয়েক সেকেন্ড আগে যেরকম বেপরোয়াভাবে তাঁবুর ভেতর এসে টেপরেকর্ডারটা বন্ধ করে দিয়ে নিজেই কথা বলতে শুরু করেছিল তাতে হতভম্ব বিহ্বল হয়ে ব্রুল তো তখন প্রায় তোতলা।'

তু-তু-তু, মানে আপ-আপ-আপ, মানে আপনি', বলে আড়ষ্ট জিভটায় সাড় ফেরাবার চেষ্টায় তার মুখটা তখন লাল হয়ে উঠেছে।

'থাক থাক!' বলে বেশ একটু ঠান্ডা গলায় তাকে থামিয়ে চিংড়ি বললে, 'আমার মতো জংলির মুখে সামান্য একটু জার্মান শুনে 'তুই' থেকে অমন 'আপনি'তে উঠতে হবে না। তার বদলে শির-ছেঁড়া সন্ন্যাস-রোগ থেকে নিজেকে বাঁচাতে একটু ঠান্ডা হয়ে আমার কথাগুলো শোনো।'

কিন্তু ব্রুল তখন রাগে অপমানে একেবারে আগেয়গিরির ক্রেটার। 'তুই, তুই' বলে মুখ দিয়ে যেন লাভা ওগরাতে ওগরাতে তাঁবুর ভেতর হঠাৎ যমজ ঘটোৎকচের এক ভাই গোধাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বললেন, 'কী করিস তোরা! কী জন্যে এত টাকা দিয়ে তোদের পাহারায় রেখেছি? কী বলে ওই চিংড়িটার মতো শয়তানকে আমাদের কাজে নিয়েছিস? আমি তোদের সকলকে গুলি করে মারব। হ্যাঁ, গুলি করে...। তার আগে এই চিমসে চিংড়ি চামচিকেটাকে তাঁবু থেকে বার করে নিয়ে...বার করে নিয়ে, হ্যাঁ, ওই নিয়ল হ্রদের ধারে একটা বিষাক্ত গ্যাসের গহ্বরে, হ্যাঁ, ওই গহ্বরেই ফেলে দিয়ে আয়।'

'ব্রুল সাহেবের এ-মূর্তি গোধা কখনো দ্যাখেনি। সে একটু থতোমতো খেয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'গর্তে ফেলে দেব? ওই বিষাক্ত গ্যাসের গহ্বরে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা-ই ফেলবি', ব্রুল গর্জন করে উঠল, 'ছোটোখাটো নয়, সবচেয়ে গভীর যে গহ্বর, সেইটাতে। কী করেছে এই চিমসে চিংড়িটা ত জানিস? জানিস ওকে...?'

'কিন্তু সেসব কথা শোনার জন্যে গোধা আর তখন সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। চিংড়িকে দু' হাতে শূন্যে তুলে ধরে সে তখন তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে।

তারপর কতক্ষণ বা আর, পাঁচ, বড়োজোর সাত মিনিট, কী করবে ঠিক করতে না পেরে ব্রুল তখন তার তাঁবুর ভেতর খাঁচায় ভরা বাগের মতো এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করছে।

'সেলাম সাহেব!' তার অস্থির পায়চারির মধ্যে ডাকটা শুনে ব্রুল চমকে ফিরে তাকিয়ে অবাক।

'তাকে তাঁবুর দরজার পরদা সরিয়ে ডাকছে লোধা কি গোধা নয়, ডাকছে চিমসে চিংড়িটা।

'অ্যাঁ, তুই!' ব্রুলের গলায় বিস্ময়ের সঙ্গে বেশ একটু ভয় মেশানো, 'গোধা' কোথায় গেল?'

'কোথাও যায়নি', চিংড়ি যেন আশ্বাস দিয়ে বোঝাল, 'তবে একটু ভালো ব্যান্ডেজ বাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর আপাতত একটু টিংচার আয়োডিন।'

'টিংচার আয়োডিন?' ব্রুল যেন রাগে-দুঃখে চিৎকার করে উঠল, 'এমন অবস্থা হয়েছে যে, টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা দরকার? লোধা, লোধা, লোধা কোথায়?

'না না, তার তেমন কিছু হয়নি,' চিংড়ি আশ্বাস দিলে, 'সে-ই তো দাদা গোধাকে বয়ে আনছে। তেমন জখম হলে কি পারত?'

'জখম হয়েও সে-ই দাদাকে বয়ে নিয়ে আসছে?' ব্রুলের গলায় যেন রাগ-দুঃখ মেশানো আর্তনাদ ঠেলে উঠছে, 'এখন আমি কি করব বলতে পারো কেউ?'

'আমি পারি,' চিংড়ি সান্ত্বনা দিয়ে বললে। তাতে ব্রুল আবার জ্বলে উঠল। হঠাৎ একটা ড্রয়ার থেকে তার রিভলভারটা বার করে চিংড়ির দিকে সেটা উঁচিয়ে ধরে সে গর্জন করে বললে, 'তোকে আমি গুলি করে মারব। যা তোর নাম, সে-ই চিংড়ি কি ইঁদুরের মতো।'

'রিভলভারের সামনে দাঁড়িয়েও চিংড়ি কি নির্বিকার? 'না, রীতিমতো যেন ভয় পেয়ে সে বললে, 'থামো, থামো ব্রুল, হুট করে এমন যা-তা করে ফেলো না। ও রিভলভারে আমাকে মারলে কী হবে তা একটু ভেবে দেখেছ? আমায় গুলি করে মারা মানে তোমার কী ভয়ানক বিপদ?'

'তোকে মারলে আমার বিপদ?' ব্রুল জ্বলে উঠে বললে, 'তোর মতো একটা চুঁচোকে মারলে...'

'থামো, থামো', চিংড়ি যেন কাতর মিনতি করে বললে, 'নেহাত যদি মারতেই চাও তো আমার পরিচয়টা তার আগে একবার ঠিক করে জেনে যাও। আমায় একবার বলছ ইঁদুর, তারপরে আবার চিংড়ি, তারপর আবার বললে ছুঁচো। আমি তোমার চোখে ঠিক কোনটা সেইটা মরার আগে-আগে জেনে যেতে চাই। সেই সঙ্গে একটু শুধু নিবেদন করতে চাই যে, চিংড়ি, ইঁদুর কি ছুঁচোকে কেউ গুলি করে মারে না। তাদের...'

'তুই...তুই...', রাগে প্রায় তোতলা হয়ে ব্রুল গর্জন করে বলবার চেষ্টা করলে, 'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে রসিকতা করছিস? এত বড়ো তোর সাহস? ভাবছিস, তোকে আমি গুলি করে মারতে পারি না? তোর মতো একটা ছুঁচো, একটা চামচিকে...'

'থামো থামো', চিংড়ি এবার ঠান্ডা গলায় ব্রুলকে যেন শান্ত করতে চাইলে, ছুঁচো, চামচিকে, ইঁদুর, চিংড়ি —যা-ই আমি হই না কেন, আমায় গুলি করে নিশ্চয়ই তুমি মারতে পার, কিন্তু মারলে কী হবে তা একটু ভেবে দেখেছ?'

'কী ভেবে দেখব?' ব্রুল চিৎকার করে বললে, 'তোকে মারলে কোন আইনে কে আমাকে এখানে ধরবে? তোকে এই রিভলভারের গুলিতে ঝাঁঝরা করে লাশটা শুধু ওই একটা বিষাক্ত গ্যাসের পাতাল-গুহায় ফেলে দেব।'

'হ্যাঁ, তা দিতে পার', চিংড়ি যেন তা স্বীকার করে নিয়ে বললে, 'কিন্তু তারপর?'

'তারপর মানে?' ব্রুল দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'তারপর আবার কী?'

'তারপরই যত গণ্ডগোল', যেন দুঃখের সঙ্গে জানালে চিংড়ি।

'তারপরে গণ্ডগোল? তোর মতো একটা...তোর মতো একটা...'

'ব্রুলকে তার তোতলামির মধ্যে থামিয়ে দিয়ে চিংড়ি বললে, 'হ্যাঁ, আমার মতো ছুঁচো, ইঁদুর, চামচিকে, চিংড়ি, যা-ই বলো, তাকে মারার পর কত গণ্ডগোল শুরু, তা বুঝতে পারছ না? শোনো, বুঝিয়ে বলি। আমার মতো একটা ইঁদুর, চামচিকে, চিংড়ি যা-ই বল, তাকে তোমার রিভলভারে ঝাঁঝরা করে একটা বিষাক্ত গ্যাসের পাতাল-গুহায় না হয় ফেলে দিলে। কিন্তু তারপর তুমি নিজেই যে একেবারে অথৈ গাড্ডায় পড়বে, তা বুঝতে পারছ কি?'

'তোকে পাতাল-গুহায় ফেলে আমি অথৈ গাড্ডায় পড়ব?' কথাগুলো রাগে গর্জন করে বলবার চেষ্টা করলেও ব্রুল তার হতভম্ব ভাবটা ঠিক লুকোতে তখন পারছে না। যে-ভাবটা যথাসাধ্য চাপা দিয়ে তবু দাঁত খিঁচিয়েই বললে, 'কেন? তুই ভূত হয়ে আমায় গাড্ডায় ঠেলে দিবি?'

''না না, ভূত হতে হবে কেন আমাকে?' চিংড়ি বোঝাবার চেষ্টা করলে, 'আমি গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে কোনো পাতাল-গুহায় তলিয়ে গেলে তোমার কী অবস্থা হবে তা একটু বুঝতে পারছ না? বুঝতে পারছ না যে, আমি না থাকলে তুমি তোমার ওই লোধা-গোধাকে নিয়েও কী অসহায়। ভুলে যাচ্ছ কেন যে, এই অজানা মরু-পাহাড়-জঙ্গলের দেশে আমি পথ দেখিয়ে তোমাদের নিয়ে এসেছি। আমি না থাকলে সারা জীবন খুঁজে-খুঁজেও এখান থেকে উদ্ধার পাবার পথের হদিস পাবে না। সুতরাং আমার লাশ যদি বিষাক্ত গ্যাসের পাতাল-গুহায় পড়ে থাকে, তা হলে তোমার লাশও এখানকার মরু-পাহাড়-জঙ্গলে কোথাও রোদে-বৃষ্টিতে শুকোবে কি পচবে, কিংবা এখানকার সিংহ-চিতা-নেকড়ের মতো হিংস্র প্রাণীদের পেটেও যেতে পারবে। তাই বলছি, আমায় মারার মতো অমন ভুল করার চেষ্টাও কোরো না।'

'একটু থেমে চিংড়ি আবার বললে, 'গুলি করেও কোনো লাভ নেই অবশ্য। তোমার ওই রিভলভার আমি আগে দেখিনি মনে করছ? এর মধ্যে আমায় মারবার মতো একটি গুলিও আমি কি রেখেছি? সুতরাং শান্ত হয়ে আমার কথা শোনো। শোনো, দেশকে ভালোবাসো বলে নাতসিদের দলে একসময় ভিড়েছিলে বটে, কিন্তু নীচ নোংরা কাজ কখনো করেনি। তা ছাড়া এককালে খ্রিষ্টান সাধু হয়ে আফ্রিকার এই ক্যামেরুনস অঞ্চলের হতভাগ্য অধিবাসীদের মধ্যে থেকে তাদের সেবায় জীবন কাটিয়ে তাদের উন্নতির জন্যে যা দরকার, তা করবার ইচ্ছে তোমার ছিল। আজ আবার সেই সুযোগই তোমার এসেছে। এই আগ্নেয়গিরির অজানা অঞ্চলে অসংখ্য বিষাক্ত গ্যাসের পাতাল-গুহা আছে। সেইসব গোপন গুহা থেকে বিষাক্ত গ্যাস মাঝে-মাঝে বেরিয়ে আদিবাসীদের সব বসতি ধবংস করে হাজার-হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। তাদের রক্ষা করবার ব্রত নিয়ে তুমি এই অঞ্চলে নিশ্চয়ই একটি মঠ গড়ে তুলতে পারো। সেই মঠ ধর্মের জন্যেও যেমন, বিজ্ঞানের গবেষণাতেও তেমনি তন্ময় হয়ে থাকবে। অন্যসব কাজের মধ্যে এখনকার বিষ-বাষ্প জমানো গুপ্ত গুহার খবর রাখাই হবে তোমার মঠের প্রধান দায়িত্ব। এখানে এসরকম কিছু বেয়াড়া ব্যাপারের আভাস পেলেই তুমি যত তাড়াতাড়ি পার তোমার জংলি আদিবাসী ভক্তদের দিয়েই রাজধানীতে না পার অন্য কোনো ব্যাবসার ঘাঁটিতে খবর পাঠাবে। সময়ে খবর পেলে এ বিষ-বাষ্পের সর্বনাশা ক্ষতি হয়তো ঠেকানো যাবে।'

'চিংড়ির কথা শুনে ব্রুল সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে ওই নিয়ল হ্রদের কাছেই তার মঠ স্থাপনা করেছিল। অন্তত করেছিল বলেই আমার ধারণা। গুপ্ত সব গুহা থেকে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে যে ভয়ংকর সর্বনাশ এবার হয়ে গেল, তার আভাস পেয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্রুল তা জানবার জন্যে তার আদিবাসী দূতকে নানা জায়গায় পাঠিয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু ওই ফাং থেকে ফুলানি থেকে হাউসায় কথা চালাচালি করায় কোথাও-না-কোথাও ভুল হওয়ার জন্যেই সে-খবর আমাদের সভ্য জগতে পৌঁছয়নি। কিংবা...'

'কিংবা কী ঘনাদা,' আমরা উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'কিংবা...' ঘনাদা একটু ধীরে-ধীরে বললেন, 'সেই চিংড়ির সঠিক পরিচয় জানার কৌতূহলটা তার কাছে এত বড়ো হয়েছে যে, সেই সন্ধানে বেরিয়ে আর তার আফ্রিকায় ফিরে মঠ গড়া হয়নি।'

'সত্যিই দুঃখের কথা', সহানুভূতি জানিয়ে আমরা বললাম, 'কিন্তু ও চিংড়ি সত্যিই কে বলুন তো ঘনাদা?'

বনোয়ারির হাতে খাবারের প্লেট সাজানো ট্রে তখন এসে পড়েছে। ঘনাদার কাছে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

শনির দেশে

সুকুমার রায়

কেউ যদি বলে যে, এই পৃথিবীর বাইরে যেখানে বলবে, সেখানে নিয়ে তোমাদের তামাশা দেখিয়ে আনবে —তাহলে তোমারা কোথায় যেতে চাও? আমি জানি, সেরকম হলে আমি নিশ্চয় শনি গ্রহে যেতে চাইব। পৃথিবীর আকাশে আমরা শুধু চোখে যতটুকু দেখতে পাই, তাতে মনে হয় যে, সব চাইতে সুন্দর জিনিস হল চাঁদ। সেখানে একবার যেতে পারলে আর কিছু না হোক, এই পৃথিবীকে কেমন মস্ত আর জমকালো চাঁদের মতো দেখায়, সেটা নিশ্চয়ই একটা দেখবার মতো জিনিস। কিন্তু শনি গ্রহে যাবার পথে সেটা আমরা দেখে নিতে পারব।

যাক মনে কর যেন শনি গ্রহে যাত্রা করাই স্থির হল। মনে কর এমন আশ্চর্য আকাশ-জাহাজ তৈরি হল যাতে পৃথিবী ছেড়ে, পৃথিবীর বাতাস ছেড়ে ফাঁকা শূন্যের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া যায়। তোমার বয়স কত? দশ বৎসর? বেশ তা হলে 1919 খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে আমরা স্বপ্ন-জাহাজে রওনা দিলাম শনি গ্রহে যাবার জন্য। আমাদের জাহাজটা মনে কর খুব দ্রুত এরোপ্লেনের মতো ঘন্টায় 100 মাইল বা125 মাইল করে চলে।

আমরা আকাশের ভিতর দিয়ে হু হু করে চলেছি আর পৃথিবীর ঘরবাড়ি সব ছোটো হতে হতে একে একে মিলিয়ে যাচ্ছে। বড়ো বড়ো শহর, বড়ো বড়ো নদী, সব বিন্দুর মতো, রেখার মতো হয়ে আসছে। এই গোল পৃথিবীর গায়ে পাহাড় সমুদ্র, দেশ মহাদেশ ক্রমে সব অতি নিখুঁত মানচিত্রের মতো দেখা যাচ্ছে। ওই ফ্যাকাশে হলদে মরুভূমি, ওই ঘন সবুজ বন, ওই ছেয়ে-নীল সমুদ্র, ওই সাদা সাদা বরফের দেশ। নভেম্বর মাসে আমরা, এখান থেকে চাঁদ যতদূর, ততদূর চলে গিয়েছি। এক বছরে 1920 খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে আমরা প্রায় দশ লক্ষ মাইল এসে পড়েছি। পৃথিবী থেকে চাঁদটাকে যেমন দেখি এখন পৃথিবীটাকে ঠিক তেমন দেখাচ্ছে। হিমালয় পাহাড়কেও আর পাহাড় বলে ভালো বোঝাই যাচ্ছে না। চাঁদের যেমন অমাবস্যা পূর্ণিমা হয়, দিনে দিনে কলায় কলায় বাড়ে কমে, পৃথিবীরও ঠিক তেমনি। এমনি করে বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে, কিন্তু কই? শনি গ্রহ ত একটুও কাছে আসছে বলে মনে হয় না। শুনেছিলাম যে এক প্রকাণ্ড গ্রহ, তার চারিদিকে আংটি ঘেরা। কিন্তু তোমার ত বিশ বছর বয়স হল, গোঁফদাড়ি বেরিয়ে গেল, এখন ত সে সবের কিছুই দেখা গেল না। ওই লাল রঙের মঙ্গল গ্রহটা যেন একটুখানি কাছে এসেছে, কিন্তু সেও ত খুব বেশি নয়। আমাদের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতটি বলছেন, মঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছতে আর চল্লিশ বৎসর লাগবে। ও হরি। তাহলে শনিতে পৌঁছব কবে? শনি পর্যন্ত যেতে লাগবে প্রায় আটশো বৎসর। তা হলে উপায়? একমাত্র উপায়, আরও বেগে যাওয়া। আর পাঁচ গুণ দশ গুণ বিশ গুণ বেগে কামানের গোলার মতো বেগে ঘন্টায় দু হাজার মাইল বেগে ছুটতে হবে। তাই ছোটা যাক।
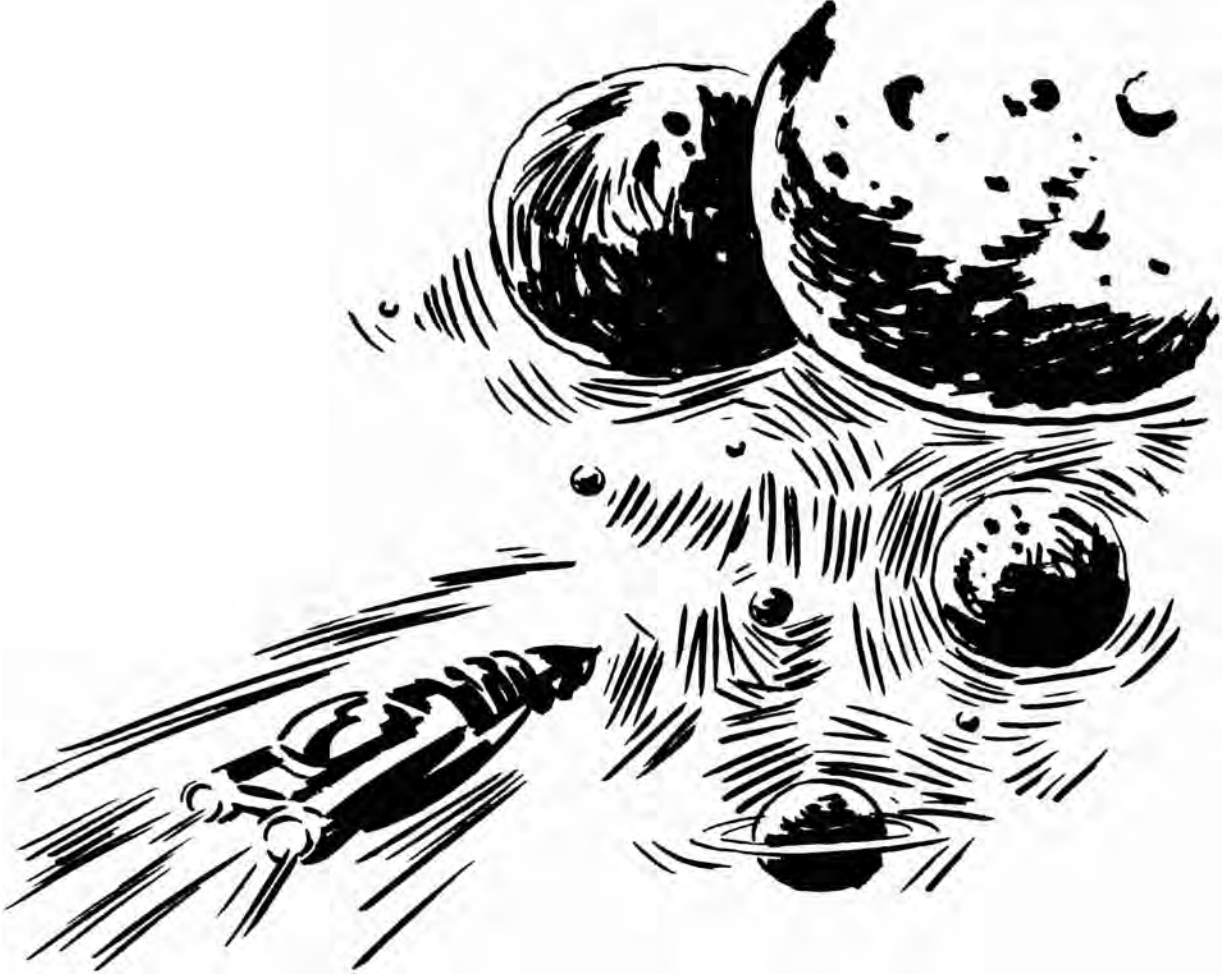
আর দুই বৎসর মঙ্গল পর্যন্ত এসে পড়া গেল। ওখানে গিয়ে একবার নামলে মন্দ হত না। ওই লম্বা লম্বা আঁচড়গুলো সত্যিকারের খাল কিনা, ওখানে সত্যি সত্যি বুদ্ধিমান জীব কেউ আছে কিনা, একটিবার খবর নেওয়া যেত। কিন্তু আমাদের ত অত অবসর নেই, যেমনভাবে চলেছি এমনি করে চললেও শনিতে পৌঁছতে আর অন্তত চল্লিশ বৎসর লাগবে! সুতরাং সোজা চলতে থাকি।

মঙ্গলের পথ পার হয়ে এখন বৃহস্পতির দিকে চলেছি। মাঝে মাঝে ছোটো-বড়ো গোলার মতো ওগুলো কি সামনে দিয়ে হুস করে ছুটে পালাচ্ছে? কোনোটা দশ মাইল, বিশ মাইল, কোনোটা একশ মাইল বা দুশ মাইল চওড়া—আবার কোনোটা ছোটোখাটো ঢিপির মতন বড়ো, কোনো কোনোটা সামান্য গুলি-গোলার মতো। এরা সবাই গ্রহ। যে নিয়মে বড়ো বড়ো গ্রহেরা সূর্যের চারিদিকে চক্র দিয়ে ঘোরে—এরাও প্রত্যেকেই, এমনকী যেগুলি ধূলিকণার মতো ছোটো সেগুলিও, ঠিক সেই নিয়মেই নিজের নিজের পথে নিজের নিজের তাল বজায় রেখে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি করে ছুটতে ছুটতে আর দশ বৎসর কেটে গেল, ছোটো ছোটো গ্রহগুলিকে আর যেন দেখাই যায় না। পৃথিবী সূর্যের আশেপাশে মিটমিট করে জ্বলছে। সূর্যও দেখতে অনেকখানি ছোট্ট হয়ে গেছে—সেই পৃথিবীর সূর্য আর এই সূর্য যেন ফুটবলটার কাছে একটি ক্রিকেট বল। ক্রমে আর আট-দশ বৎসর ছুটে, গ্রহরাজ বৃহস্পতির চক্রপথের সীমানায় হাজির হওয়া গেল। কোথায় পৃথিবী আর কোথায় বৃহস্পতি। 365 দিনে পৃথিবীর এক বৎসর—কিন্তু বৃহস্পতি যে প্রকাণ্ড পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেই পথে একেবার পাড়ি দিতে তার প্রায় বারো বৎসর সময় লাগে। ধোঁয়ায় ঢাকা প্রকাণ্ড শরীর—তার মধ্যে হাজার খানেক পৃথিবীকে

অনায়াসেই পুরে রাখা যায়। অথচ এই বিপুল দেহ নিয়ে গ্রহরাজকে লাটিমের মতো ঘোরপাক খেতে হচ্ছে। এ কাজটি করতে পৃথিবীর চবিবশ ঘন্টা সময় লাগে, কিন্তু বৃহস্পতির দশ ঘন্টাও লাগে না। বৃহস্পতির চারিদিকে সাত-আটটি চাঁদ—তার মধ্যে চারটি বেশ বড়ো বড়ো—তিনটি আমাদের চাঁদের চাইতেও বড়ো।

বৃহস্পতির এলাকা পার হয়েছি। শনির আলো ক্রমে আর উজ্জ্বল হয়ে আসছে—ক্রমে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, তার চেহারাটা ঠিক অন্য গ্রহের মতো নয়। মনে হয় কেমন যেন লম্বাটে মতন—দুপাশে যেন কি বেরিয়ে আছে। আর কাছে গিয়ে দেখ তার গায়ের চমৎকার আংটিটা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। পৃথিবী থেকে ছোটোখাটো দূরবিন দিয়ে যেমন দেখেছি এখন শুধু চোখেই সেইরকম দেখতে পাচ্ছি। আংটিটা বাসনের কানার মতো, উকিলের শামলার ঘেরের মতো—খুব পাতলা আর চওড়া। শনি গ্রহকে আমরা যে দেখি, সবসময়ে ঠিক এরকম দেখি না—কখন একটু উঁচু থেকে, কখন একটু নীচু থেকে, কখন আংটির ওপর দিকটা, কখন তার তলাটা, কখন সামনে ঝোঁকা, কখন পিছন-হেলান। যখন ঠিক খাড়াভাবে আংটির কিনারা থেকে দেখি, তখন আংটিটাকে দেখি সরু একটু রেখার মতো—এত সরু যে খুব বড়ো দূরবিন না হলে দেখাই যায় না।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হল আমরা পৃথিবী ছেড়েছি—এখন আর আট-দশ বৎসর গেলে আমরা শনিতে পৌঁছিব। ততদিনে তোমার চুল দাড়িগোঁফ সব পেকে যাবে—তুমি ষাট বছরের বুড়ো হয়ে যাবে। শনিকে অনেকখানি ডাইনে রেখে আমরা ছুটে চলেছি। শনিও ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে ওই বাঁয়ের দিকে ছুটে আসছে, আর কয়েক বৎসর পরে সে ঠিক আমাদের সামনে এসে হাজির হবে। সেও কিনা সূর্যের প্রজা, কাজেই সূর্যের চারিদিকে তাকেও প্রদক্ষিণ করতে হয়। কিন্তু আমাদের ঊনত্রিশটা বছরেও তার একটা পাক পুরো হয় না।

যাক—এতদিন পথের শেষ হয়েছে, আমরা শনি গ্রহের ওপরে এসে পৌঁছেছি। 'আংটিটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, আকাশের ওপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত যেন আলোর খিলান গেঁথে দিয়েছে। খিলানের মধ্যে খিলান, তার মধ্যে ঝাপসা আলোর আরেকটি খিলান। তার ওপর আবার শনি গ্রহের ছায়া পড়েছে। সূর্যের এই প্রকাণ্ড রাজত্বের মধ্যে যতদূর যাও, এমন দৃশ্য আর কোথাও দেখবে না—আমাদের পৃথিবীর দূরবিনের দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যায়, এমন জিনিস আর দ্বিতীয় কোথাও পাওয়া যায়নি।

আকাশে কত চাঁদ! একটি নয়, দুটি নয়, একেবারে আট-দশটা চাঁদ—ছোটো-বড়ো মাঝারি নানারকমের! সওয়া দশ ঘন্টায় এখানকার দিনরাত—ঘুমের পক্ষে ভারি অসুবিধা। দিনটাও তেমনি—পৃথিবীর রোদ এখানকার চাইতে একশ গুণ কড়া। পৃথিবী থেকে সূর্যকে যদি চায়ের পিরিচের মতো বড়ো দেখায়, তবে এখান থেকে তাকে দেখায় যেন আধুলিটার মতো। যখন তখন চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণ ত লেগেই আছে, তার ওপর আবার থেকে চাঁদে চাঁদেও গ্রহণ লেগে যায়, এক চাঁদ আর-এক চাঁদকে ঢেকে ফেলে। এখানকার জন্য যদি পঞ্জিকা তৈরি করতে হয়, তবে তার মধ্যে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কেবল গ্রহণের হিসেব লিখতেই কেটে যাবে।

আংটিগুলি যেন অসংখ্য চাঁদের বাঁক—ছোটো ছোটো ঢিপির মতো, পাথরের ভেলার মতো, কাঁকড়ের কুচির মতো, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চাঁদ কেউ কারও গায়ে ঠেকে না, আশ্চর্য নিয়মে প্রত্যেকে নিজের পথে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। আর সমস্তে মিলে আশ্চর্য সুন্দর আংটির মতো চেহারা হয়েছে।

এখন অসুবিধার কথাটাও একটু ভাবা উচিত। গরম বাতাস আর ধোঁয়ার ঝড় ত এখানে আছেই। তার ওপরে সবচাইতে অসুবিধা এখানে দাঁড়াবার মতো ডাঙা পাবার যো নাই—ডাঙা খুঁজতে গেলে অনেক হাজার মাইল গভীর গরম ধোঁয়াটে মেঘের সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিতে হবে। সেই মেঘের মধ্যে জীবজন্তু কেউ বাঁচতে পারে কিনা খুবই সন্দেহ। সুতরাং এখন ফিরবার উপায় দেখতে হবে!

এসেছিলাম কামানের গোলার মতন বেগে—কিন্তু তার চাইতেও তাড়াতাড়ি চলা যায় কি? আলো চলে সবচাইতে তাড়াতাড়ি—প্রতি সেকেন্ডে প্রায় এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইল। তা হলে সেইরকম বেগে

আলোর সওয়ার হয়ে ছোটা যাক। পৃথিবীতে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে? এক ঘন্টা কুড়ি মিনিট।

গৃধিনি

পার্থসারথী চক্রবর্তী

ইরানি আর পপি আমাদের পরিবারের খুবই আপনজন। ইরানি হল বেজি আর পপি হল ছোট্ট একটা টেরিয়ার কুকুর, সারা গা তার সাদা নরম সুন্দর লোমে বোঝাই। পপির যখন বয়স মাত্র একমাস তখন আমাকে একজন বিদেশি বন্ধু ওটা উপহার দিয়েছিলেন। আর ইরানিকে একেবারে বাচ্চা অবস্থায় পাওয়া যায় আমাদের বাড়ির পিছনের বাগানে। আমিই প্রথম ইরানিকে দেখতে পাই। সেই থেকে ও আমাদের বাড়িতেই বড়ো হয়েছে। হঠাৎ ছোটোমামা ডেকে পাঠাতেই ওদের মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে নীচের ঘরে এলাম। দেখি ছোটোমামার সামনের চেয়ারে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁর হাতে বিশাল বড়ো একটা খাঁচা। খাঁচার মধ্যে পাখিটাকে দেখে আমি তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কাকাতুয়া টিয়া, ময়না, পাপিয়া, বুলবুল নয়—খাঁচার মধ্যে রয়েছে আস্ত জলজ্যান্ত একটা ধাড়ি শকুন। ভদ্রলোকের গায়ে সাদা আদ্দির একটা পাঞ্জাবি, চওড়া পাড়ের ধুতি পরেছেন। রং ফর্সা, চুলগুলো কোঁকড়ানো, বয়স পঞ্চাশ কি তার কিছু নীচেই হবে। পুরু গোঁফ জোড়াটা দেখবার মতো। ওঁর ভরাট মুখে মানিয়েছেও খাসা। মুখে একটা মৃদু হাসির রেখা সব সময় লেগেই রয়েছে দেখলাম।

ছোটোমামা বললেন—ইনি হচ্ছেন রামবল্লভ ধর। এঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল বিহারের পুর্নিয়া জেলার একটা গণ্ডগ্রাম। পাখি—বিশেষ করে শকুন সম্পর্কে ইনি খুবই আগ্রহী। শকুনের চমকপ্রদ জীবনযাত্রা নিয়ে রামবল্লভ বাবু দীর্ঘদিন অনুসন্ধান চালিয়েছেন।

তারপর ছোটোমামা আমার দিকে চেয়ে বললেন—'আর এই হল আমার একমাত্র ভাগ্নে লম্বু ওরফে পজিট্রন মুখার্জি, যার কথা আপনাকে একটু আগে বলছিলাম'।

এরপর রামবল্লভ বাবু ছোটোমামার দিকে তাকিয়ে বললেন—'আমি তাহলে আজ উঠি। শকুনটা আপনার হেফাজতেই আপাতত এখানে থাক। আমার কাছে অবশ্য আরও ছোটো বড়ো নানান ধরনের শকুন আছে। চাইলেই পাবেন।' তারপর একটা পলিথিনের ব্যাগ ছোটোমামার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—'এর ভেতর কিছু পচা মাংস আছে। দিনে চারবার করে খেতে দেবেন। শকুনের আবার খাওয়াদাওয়া যা বিশ্রী রকম। এটা থাকলে আপনার সুবিধে হবে।'

রামবল্লভ বেরিয়ে যাবার পর আমি শকুনটাকে ঘুরে ফিরে দেখছি এমন সময় ছোটোমামা বললেন—'শকুনিকে চলতি কথায় আমরা শকুন বলে থাকি। আসলে আমাদের দেশে দু'রকমের শকুন দেখতে পাওয়া যায়। শকুনি ও গৃধিনি। গৃধিনিকে কোনো কোনো অঞ্চলে 'গিন্নি শকুন' বলে। এদের কানের দু'পাশে দুটো কানপাশার মতো লাল জিনিস থাকে। আমি খাঁচার মধ্যে শকুনটার দিকে চেয়ে দেখলাম, তারও কানের দু'পাশটা লাল কানপাশার মতো দেখতে। চিৎকার করে বলে উঠলাম—'ছোটোমামা এর নাম রাখা হোক তাহলে গৃধিনি।'

ছোটোমামা মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—'তা, বেশ তো।'

শকুনটার দিকে তাকিয়ে দেখি সে ঘাড় ঘুরিয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার চোখের পলক পড়ছে না। আর মাঝে মাঝে ডানাদুটো সামান্য ওপরে তোলবার চেষ্টা করছে।

এমন সময় ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল ভীম ঠাকুর। সে তো খাঁচার মধ্যে শকুন দেখে একেবারে রেগে টং। গজগজ করে বলতে লাগল—'একটা বেজি আর একটা কুকুর নিয়েই সামাল দেওয়া যাচ্ছে না, তারপর কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল আবার একটা শকুন। এ যে দেখছি গোদের ওপর বিষফোঁড়া।'

ভীম আমাদের বাড়িতে রান্না করে। এছাড়া ঘরদোর গোছানো, দুধ আনা, বাজার করা—সব কাজই সে করে। অনেকদিন ধরে আছে, ছোটোমামাকেও বড়ো একটা মানে না। মাঝে মধ্যে আমাকে তো বটেই, এমনকী তার মনিবকেও ধমক দেয়।

আমি বললাম—' ভীম ঠাকুর, তোমায় কিছু করতে হবে না। শকুনের যাবতীয় দেখাশোনা সব আমিই করব। তুমি শুধু একটু মুরগির মাংসের ঝোল করে ওকে খাইও।'

—'শকুন খাবে রান্না করা মুরগির ঝোল। এমন বেআক্কেলে কথা তো কোনোদিন শুনিনি বাপু। ইচ্ছে হয়, তুমি নিজে হেঁসেলে গিয়ে রান্না করে খাইও। আমি ওসব পারবো-টারবো না। আমার গতরের অত জোর এখন আর নেই।'—এই বলে মেজাজ খারাপ করে ভীম ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ছোটোমামা আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'লম্বু, তুই তাহলে গৃধিনিকে ছাদের ওপরের ঘরে পপি আর ইরানির কাছে রেখে আয়। আপাতত ও খাঁচার মধ্যেই থাক। পরে যা হয় দেখা যাবে।'

—'যদি পপি খাঁচার মধ্যে থাবা ঢুকিয়ে কিছু করে বসে?'

—'দূর পাগল—কিছু করবে না, তুই রেখে আয় তো কিছু হলে আমি দেখব তখন।'

আমি গৃধিনির খাঁচাটা তুলতে গিয়ে দেখি—অবাক কাণ্ড, তার ওজন তো নেহাত কম নয়। বেশ ভারী লাগছে। আবার খাঁচাটা ওঠাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যা ভারী, কিছুতেই তুলতে পারলাম না।

ছোটোমামা ততক্ষণে দোতলার ল্যাবরেটরি ঘরে ঢুকে পড়েছেন। জেনেটিক্স নিয়ে উনি দিনরাত কি সব রিসার্চ করছেন। অবশ্য আমি তার বিন্দু বিসর্গও বুঝিনে। সবাই বলে ছোটোমামা খুব নাম করা সায়েন্টিস্ট। পি সি আর (PCR) নিয়ে তাঁর গবেষণা নাকি সারা বিশ্বে দারুণ হইচই ফেলে দিয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ওঁর কি সব কাজ নিয়ে কিছুদিনের মধ্যে একটা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার বসবে। আমি, পিসি আর মাসি এসবের বিন্দু বিসর্গও বুঝি না। দোতলায় বড়ো বড়ো আস্ত চারটে ঘর জুড়ে ছোটোমামার ল্যাবরেটরি। তাতে কম্পিউটার, লেসার, স্পেকট্রোফটোমিটার এসব দামি যন্ত্র বসানো রয়েছে। আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই জানি না। তবে ছোটোমামার ল্যাবরেটরির আশ্চর্য কার্যকলাপ আমার দেখতে ভারি ভালো লাগে, স্বপ্নের মতো মনে হয়।

মনে মনে ঠিক করলাম ভীম ঠাকুরকে আর একবার অনুরোধ করে দেখব। আস্তে আস্তে রান্না ঘরের দরজার কাছে গিয়ে ভীম ঠাকুরকে বললাম—'শকুনের খাঁচাখানা ছাদে রেখে দিয়ে এসো না একবার। ভীষণ ভারী যে, আমি যে খাঁচাটা তুলতেই পারছি না।'

ভীম ঠাকুর সে কথা শোনামাত্র হইচই করে সঙ্গে সঙ্গে তার আপত্তির কথা জানিয়ে দিল।

এদিকে আমিও নাছোড়বান্দা। বললাম—'তুমি যদি শকুনের খাঁচাটা ওপরে রেখে আস, তাহলে কালকে তোমার জন্য হিরাভাই মিশ্রর একটা গানের ক্যাসেট এনে দেব। ওই যে তুমি একদিন বলছিলে—'মেরা সাইয়া বুলায়ে আঁধি রাতে নদিয়া কিনারে' এই গানটা নাকি তোমার বেজায় পছন্দ। কি তাহলে রাজি তো?

ভীম ঠাকুর গান শুনতে ভারি ভালোবাসে। বিশেষ করে বেগম আখতার, হিরাবাই মিশ্র আর গিরিজা দেবীর গান। তাই আমার প্রস্তাবে সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। তবে এক শর্তে—আগামীকাল বিকেলেই ক্যাসেটটা ওকে এনে দিতে হবে।

আমি বললাম—'আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে'।

আমি রামবল্লভ ধরের দেওয়া মাংসের থলিটা হাতে নিয়ে এক দৌড়ে ছাদের ঘটে উঠে এলাম। পিছনে পিছনে ভীম ঠাকুর এল শকুনের খাঁচাটা নিয়ে।

ছাদের ঘরটা বেশ বড়ো। চার চারটে নিওন টিউব এখানে জ্বলে। তাই ঘরটা সবসময় দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

ভীম ঠাকুর শকুনের খাঁচাখানা রেখে দিয়ে গেল। এদিকে দেখি পপি আর ইরানি এই নবীন আগন্তুককে দেখে একযোগে তারস্বরে চিৎকার করতে আরম্ভ করেছে। সে এক দারুণ বিশ্রী ব্যাপার।

গৃধিনির কিন্তু এতে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নেই। তার কোনো চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটেছে বলে বোধ হল না। অর্থাৎ ওনার ভাবখানা এমন যে সারা পক্ষীজগতের সমাজই যখন তাকে একঘরে করেছে, তখন অন্য প্রাণীরাও যদি বয়কট করে তাহলে আর ক্ষতি কোথায়!

আমি গৃধিনির খাঁচার দরজা খুলে তার মধ্যে খাবারটা রেখে দিলাম। দেখলাম খাবারের দিকে তার বিন্দুমাত্র রুচি নেই। সে ঘাড়টা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। সেই সঙ্গে সম্ভবত পপি, আর ইরানির কাণ্ডকারখানাও উপভোগ করছে। কিছুক্ষিণ বাদে লক্ষ করা গেল ওদের চেঁচামেচির তীব্রতা সামান্য কমের দিকে। আমি গৃধিনির ঘাড়ের কাছে একটা বেগুনি রংয়ের স্কেচ পেন দিয়ে ইংরেজি V অক্ষর লিখে দিলাম। তারপর দরজাটা আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে পড়ার ঘরে চলে এলাম।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ছোটোমামাকে জিজ্ঞেস করলাম—'আচ্ছা, দুনিয়ার এত জিনিস থাকতে খামোখা শকুন নিয়ে রিসার্চ করতে যাচ্ছ কেন? শকুন নিয়ে আগে কি কেউ কখনো রিসার্চ করেনি ছোটোমামা?'

ছোটোমামা উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ, করেছে ঠিকই, তবে কম। উডস নামে একজন ইংরেজ সাহেব যিনি 'বয়েজ ওন ন্যাচারাল হিস্ট্রি' এই বিখ্যাত বইটা লিখেছিলেন, তিনি কিছু কাজ করেছেন। তবে আধুনিক জেনেটিক্স নিয়ে শকুনের ওপর গবেষণা বিশেষ কেউ করেছে বলে জানি না।'

ছোটোমামার মুড এসে গেছে এখন। ইজিচেয়ারে গা-টা এলিয়ে দিয়ে ছোটোমামা বলতে শুরু করলেন—

'পক্ষীজগতে যদি কোনো সমাজ থাকে তবে নিশ্চয়ই তার শকুনিকে একঘরে করেছে বলতে হবে। শকুনি তাদের কাছে হরিজন পাখি। পক্ষীমহলে শকুনির জল অচল। তাদের সঙ্গে অন্য পাখির ওঠাবসা এবং সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম কিছুই চলে না। অবশ্য শকুনিকে সকলেই যে বয়কট করেছে এমন নয়। পক্ষীজগতে যাদের সম্মান নেই, রবাহুত বা অনাহুত হয়েই যারা ভোজবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয় ও যাদের দেখলে লোকে 'দূরছাই' করে, সেই কাক একমাত্র স্বার্থসিদ্ধির সময় শকুনির সাহচর্য গ্রহণ করে।

'আমাদের দেশে সাধারণত দু'রকমের শকুনি দেখতে পাওয়া যায়। শকুনি ও গৃধিনি বা গিন্নি শকুন। শকুনির চেহারা দেখে সহজেই মনে হয় এরা বেশ শক্ত আর বাঁচেও অনেকদিন।

যেসব প্রাণীর চামড়া শক্ত, কাক বা শিয়াল তা ছিঁড়তে পারে না শকুনি এসে তার তীব্র তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে ওই চামড়া তুলে দেয়। তারপর অল্প সময়ের মধ্যে ওই প্রাণীর মৃতদেহ অদৃশ্য হয়ে পড়ে। কেবল তার কঙ্কালটা পড়ে থাকে মাত্র।'

'শকুনি যদি না থাকত তবে রোজ বহু প্রাণী পচে গলে যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করত তা বলবার নয়। শকুনি যতই দেখতে কুৎসিত হোক না কেন, ওরা মানুষের যথেষ্ট উপকার করে। আমাদের দেশে শকুনের সংখ্যা এখন ভীষণ ভাবে কমে আসছে—এটা দারুণ দুশ্চিন্তার কথা।'

এই পর্যন্ত বলার পর ছোটোমামা থামলেন। তারপর বললেন—'রাত অনেক হল, এবার শুতে যা।'

আজ রবিবার, স্কুল নেই। ঘুম থেকে উঠে সোজা ছুটে গেলাম তিনতলার ছাদের ঘরে। গিয়ে দেখি তাজ্জব ব্যাপার! একটা শকুন, বেজি আর একটা কুকুর এই তিনটে জানোয়ার মিলে মিশে একসঙ্গে খেলা করছে। এর চাইতে আশ্চর্য দৃশ্য আর কী হতে পারে? আরও অবাক কাণ্ড, খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসার পর গৃধিনি কিন্তু অনায়াসে উড়ে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু তা সে যায়নি।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ছোটোমামা গৃধিনিকে নিয়ে তার ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেন। আর আমি বসলাম সংস্কৃত ব্যাকরণ কৌমুদী নিয়ে। স্থা ধাতু, গম ধাতু আর হস ধাতু মুখস্থ করতে হবে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, হস ধাতু পড়লেই কি আর মুখে হাসি ফোটে? সংস্কৃত ধাতুরূপ আর শব্দরূপ মুখস্থ করতে গেলে আমার কান্না পায়। অথচ সেভেন আর এইট এই দুটো ক্লাসে সংস্কৃত পড়তেই হবে। কম্পিউটার আর ইলেকট্রনিক্সের যুগে সংস্কৃত পড়ে যে কী হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু পরীক্ষায় তো পাস করা চাই। তাই নিমরাজি হয়েও ব্যাকরণ কৌমুদী নিয়ে পড়তে বসে গেলাম।

আজ কদিন ধরে দেখছি গৃধিনির দেহে এক অদ্ভুত পরিবর্তন। তার গলা, বুক, ঠোঁট একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে। ডানার বিশ্রী পালকগুলো সুন্দর সবুজ রংয়ের হয়েছে আর তার সঙ্গে কোথাও কোথাও মিশে আছে হালকা, হলুদ, কমলা রংয়ের দারুণ বাহার। ছোটোমামাও এখন খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়ে শকুনের রিসার্চে দারুণ ব্যস্ত। অন্য কোনো বিষয়ে এখন তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। নতুন নতুন সব জিন আর হরেমোন প্রয়োগ করে চলেছেন তিনি গৃধিনির ওপর। রামবল্লভ ধর মাঝে মধ্যেই এসে খোঁজ খবর নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরও উৎসাহের অন্ত নেই।

মাসখানেক পরের কথা। এখন গৃধিনির দেহে একেবারে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। হঠাৎ তাকে দেখে বিন্দুমাত্র বোঝবার উপায় নেই যে সে একটা শকুন। তার কদর্য ভাবটা এখন একেবারেই নেই। সবুজ, হলুদ, কমলা রং মেশানো চকচকে মসৃণ ডানার রং। চোখ মুখ ময়ূরের মতো সুন্দর না হলেও বেশ ভালো। অনেকটা টার্কি পাখির মতো দেখাচ্ছে এখন তাকে, এ এক দারুণ আশ্চর্য ঘটনা। ছোটোমামা লন্ডনের কিংস কলেজের ইগারটন স্মিথকে খবরটা জানিয়েছেন ই-মেল করে। ব্যাপারটা জেনে উনি তো একেবারে চমকে গিয়েছেন। শুনতে পাচ্ছি ছোটোমামা আর ইগারটন স্মিথ নাকি শকুনের দেহ থেকে একটা ক্যানসারের ওষুধ, যাকে বলে এন্টিক্যানসার ড্রাগ তা আবিষ্কার করতে চলেছেন। সামনের মাসে ছোটোমামার লন্ডন যাবার কথা, 'হরমোন-জিন কম্বাইন্ড এফেক্ট' সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার জন্য।

আজ শনিবার। খুব সকালে ভীম ঠাকুরের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। তখনও আমার ঘুমের রেশ ভালো করে কাটেনি। ব্যাপার কী? এত চেঁচামেচি কীসের? আওয়াজটা আসছে তিনতলা থেকে। দৌড়ে সেখানে গিয়ে দেখি ছোটোমামা ঘরের মেঝের ওপর চুপচাপ বসে আর ভীম ঠাকুর একনাগাড়ে বলে চলেছে —'গৃধিনির খাঁচার দরজা আমি রাতে বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছিলাম। এটা আমার ঠিক মনে আছে।

তাহলে গৃধিনি খাঁচা ছেড়ে উড়ে গেছে! আশ্চর্য ব্যাপার! মাত্র এই ক'দিনে বাড়ির সকলের সঙ্গে তার বেশ ভাব জমে গিয়েছিল। অনেক সময় খাচার দরজা খুলে দিলেও গৃধিনি খানিকটা ঘোরাঘুরি করে আবার নিজেই

খাঁচায় ফিরে যেত। সম্ভবত খাঁচাখানা তার কাছে ছিল একটা নিরাপদ আশ্রয়। তাহলে সে পালিয়ে গেল কেন? নাকি কেউ তাকে চুরি করে সরে পড়েছে? কিন্তু আমাদের বাড়িতে ভীম ঠাকুর থাকতে চোর ঢুকে চুরি করে পালিয়ে যাবে এত স্বপ্নেও ভাবা যায় না। তাহলে গৃধিনি গেল কোথায়?

ছোটোমামা পাড়ার কাছেপিঠের প্রায় সব বাড়িতেই খোঁজখবর নিলেন। না, কোথাও সে নেই। চেনা-জানা সবাইকে ফোন করাও হল। তবু গৃধিনির সন্ধান মিলল না। ছোটোমামা থানাতেও একটা ডায়েরি করে এলেন। থানার ওসি বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটোমামার পরিচিত। তিনি আশ্বাস দিলেন কোনো খবর পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানিয়ে দেবেন।

আর সাত দিন হয়ে গেল তবুও গৃধিনীর কোনো সন্ধান মিলল না। সত্যি সত্যি সে গেল কোথায়? যদি সে পুরনো স্মৃতির টানে আবার কোনো ভাগাড়ে গিয়ে থাকে সেই ভেবে ছোটোমামা কাছেপিঠের ভাগাড়গুলোও দেখে এসেছেন। সেখানকার লোকদের সঙ্গে কথাও বলেছেন। কিন্তু কোনো লাভই হয়নি। রামবল্লভ ধরকেও ব্যাপারটা জানান হয়েছে। সেও খবরটা শুনে একেবারে স্তম্ভিত।

আজ সকালে বোম্বের 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' পত্রিকার প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো হরফে একটা নিউজ বেরিয়েছে—বৈজ্ঞানিক পি কে মাথুরের আশ্চর্য আবিষ্কার। পাখির দেহে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন জিন প্রযুক্তি কৌশল আবিষ্কার করে ইত্যাদি।

ছোটোমামা চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন ইজিচেয়ারে বসে। নিউজটার দিকে চোখ পড়তেই সোজা ফোন করলেন 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র এডিটরকে।

—আমি সায়েন্টিস্ট দেবপ্রসাদ কথা বলছি। কাগজে দেখলাম আপনারা পি কে মাথুরের একটা নিউজ ছেপেছেন। ওঁর ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বারটা আমাকে দিতে পারেন কি?

—নিশ্চয়ই। আপনি পাঁচ মিনিট বাদে আবার ফোন করুন আমি অফিস থেকে আনিয়ে রাখছি।

ছোটোমামা টেলিফোনের সামনে গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। ওঁকে খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে। পাঁচ মিনিট যেন পাঁচঘন্টা। সময় যেন আর কাটতেই চায় না। অবশেষে 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র এডিটরের কাছ থেকে মাথুরের ঠিকানা পাওয়া গেল।

ছোটোমামা বললেন—চট করে তৈরি হয়ে নে লম্বু। এক্ষুনি আমাদের বোম্বে রওনা হতে হবে। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের ফ্লাইট ছেড়ে গেছে। সাহারা ফ্লাইট ছাড়বে একটু পরেই।

বোম্বে যাবার খবর শুনে আমি তো একেবারে আহ্লাদে আটখানা। গৃধিনি হারিয়ে যাবার পর মনটা খারাপ হয়েছিল খুবই। কিন্তু আবার বোম্বে যাবার কথা শুনে মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

দমদম এয়ারপোর্টের ফর্মালিটি কাটিয়ে যখন সাহারা এয়ারক্রাফটে উঠলাম তখন আমার বেশ অ্যাডভেঞ্চারের মেজাজ। ছোটোমামারও নিশ্চয়ই সে রকম মনে হচ্ছে। সাহারা এয়ারলাইন্সে এর আগে চড়িনি। কিন্তু আদব কায়দা পুরোদস্তুর আধুনিক। খাওয়া-দাওয়ার মেনুও বেশ লোভনীয়।

বোম্বের সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছোটোমামা আমাকে নিয়ে সোজা গেলেন পি কে মাথুরের বাসায়। উনি বাড়িতে ছিলেন না। একজন প্রৌঢ়া মহিলা বললেন—জেনেটিক্স সোসাইটিতে উনি আজ একটা লেকচার দেবেন। সেখানে গেলে ওঁর দেখা পাওয়া যেতে পারে।

ওখান থেকে ট্যাক্সি চেপে আমরা গেলাম জেনেটিক্স সোসাইটি। ছোটোমামাকে এখন বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে বোধ হচ্ছে। জেনেটিক্স সোসাইটিতে আমরা যখন পৌঁছলাম তখন সেমিনার শুরু হয়ে গিয়েছে। ছোটোমামা আমাকে নিয়ে একেবারে সামনের সারিতে বসালেন। সেমিনারের চেয়ারম্যান ছিলেন ভারতের নামকরা জেনেটিক্স বিজ্ঞানী ও পি আয়েঙ্গার। আয়েঙ্গারের সঙ্গে ছোটোমামার আগেই পরিচয় ছিল। ছোটোমামাকে এর আগে তিনি বেশ কয়েকটা চিঠি লিখেছেন। আয়েঙ্গার ডায়াসের ওপরে বসে ছিলেন। ছোটোমামাকে দেখে হাত নেড়ে সাদর সম্ভাষণ জানালেন।

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ড. মাথুর। ওঁর পাশের টেবিলের উপর যাকে দেখলাম তাতে তো আমাদের দুজনেরই চক্ষুস্থির হয়ে গেল। গৃধিনি চুপ করে টেবিলের উপর বসে আছে। আর ঘাড় ঘুরিয়ে সে চারিদিকে তাকাচ্ছে।

তখন ড. মাথুরের বক্তৃতা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিনি বলতে লাগলেন—আমার এই জেনেটিক্স বিজ্ঞানে এক নতুন আলোর সন্ধান দেবে একথা নিশ্চিত করে বলতে পারি। একটা বন্য শকুনের চেহারা সম্পূর্ণভাবে পালটে দিয়ে এই নতুন প্রাণীটা বানিয়েছি। এটা সম্পূর্ণ আমার একার কৃতিত্ব...।

ড. মাথুরের বক্তৃতা তখনও শেষ হয়ে যায়নি ঠিক সেই সময়েই এই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটল। গৃধিনি হঠাৎ উড়ে এসে আমার একেবারে কোলের উপর বসে পড়ল। তারপর তার ঘাড়টা আমার গায়ে ঘষতে লাগল। ঘর ভরতি লোকেরা তো এক্কেবারে অবাক! আমি আস্তে আস্তে গৃধিনির গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। হ্যাঁ, স্মরণশক্তি আছে বটে পাখিটার। আমাকে, আর সন্দেহ নেই ছোটোমাকেও, চিনতে সে বিন্দুমাত্র ভুল করেনি।

যাইহোক ড. মাথুরের এই বক্তৃতার পর সেমিনারের চেয়ারম্যান ড. ও পি আয়েঙ্গার ছোটোমামার দিকে চেয়ে বললেন—আমাদের এই সেমিনারে আজ অনুগ্রহ করে এসেছেন কলকাতা থেকে ড. দেবপ্রসাদ। তাঁর পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। আপনারা সকলেই জানেন তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জেনেটিক বিজ্ঞানী। আমি ড. দেবপ্রসাদকে এই বিষয়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি।
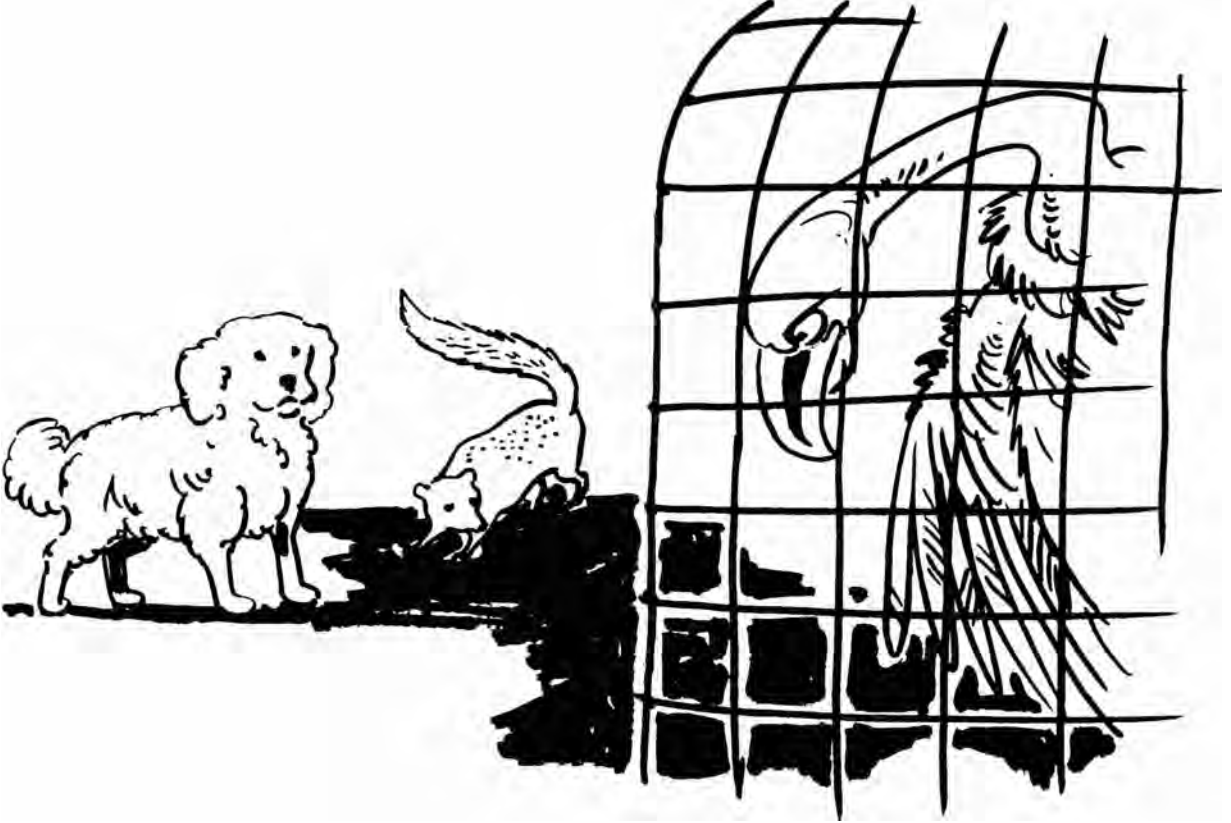
আমি ভাবলাম ছোটোমামা এই সুযোগ ডায়াসে উঠে ড. মাথুরের সব চাল ফাঁস করে দেবেন। কিন্তু ও হরি! ছোটোমামা তার ধারে কাছেও গেলেন না। উলটে ড. মাথুরের এই কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে এবং তাকে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে ডায়াস থেকে নীচে নেমে এলেন।

সভা এখন প্রায় শেষ হবার মুখে। এদিকে গৃধিনি কিন্তু কিছুতেই আমার কোল ছাড়তে চাইছে না। ড. মাথুর নিজে এলেন ওকে তুলে নিতে। সঙ্গে অবশ্য আরও দু'জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। কিন্তু গৃধিনির সেই এক

গোঁ—কিছুতেই সে আমার কাছ থেকে নড়বে না। সেমিনারের সমস্ত বিদগ্ধ লোকেরা এই দৃশ্য দারুণ উপভোগ করছে বুঝতে পারলাম।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে আবার একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল।

রামবল্লভ ধরের ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব হল সেখানে। রামবল্লভ প্রচণ্ড রেগে ড. মাথুরের দিকে চেয়ে বললেন—কাজটা আপনি মোটেই ভালো করেননি ড. মাথুর। এই শকুনকে রংবেরং-এর নতুন পাখিতে পরিবর্তন যিনি করেছেন তিনি আপনার সামনেই বসে আছেন—ড. দেবপ্রসাদ। আমি নিজে হাতে করে গবেষণার জন্য ওকে এই শকুনটা দিয়ে এসেছিলাম। জিন ও হরমোনের সাহায্যে শকুনের দেহে যাবতীয় পরিবর্তন এনেছেন ড. দেবপ্রসাদ, আপনি নন।

সভার সমস্ত লোকজন তখন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। চারদিকে একেবারে নিস্তব্ধ, যাকে বলে পিন ড্রপ সাইলেন্স এমন আর কি।

ড. মাথুরের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি তোতলামি করে বলতে লাগলেন—'কি আবোল-তাবোল কথা বলছেন মশাই। এটা সম্পূর্ণ আমারই আবিষ্কার।'

—কি প্রমাণ আছে আপনার কাছে? জিজ্ঞেস করলেন রামবল্লভ ধর।

—এই জলজ্যান্ত প্রাণীটাই তার প্রমাণ। আর প্রমাণ কি চাই? উত্তর দিলেন মাথুর।

—না, এটা আসল প্রমাণ নয়। আপনি কোথায় পেয়েছেন এই প্রাণীটাকে, তা আপনাকে এখন বলতেই হবে।

রামবল্লভ রীতিমতো উত্তেজিত।

চেয়ারম্যান ড. আয়েঙ্গার হতভম্ব হয়ে ওর মুখের দিকে চাইছেন এমন সময় ড. মাথুর তার জামার পকেট থেকে কয়েকটা কাগজ বের করে দেখালেন।

কম্পিউটার প্রিন্ট-এর কি সব যেন লেখা ও আঁকা। আর দুটো ছবি। একটা শকুনের আর একটা শকুন থেকে রূপান্তরিত এই প্রাণীটার ছবি। এই ছবি দুটো দেখিয়ে ড. মাথুর বললেন—'এর থেকে কি প্রমাণ হয় না, আমিই এর আবিষ্কারক?'

রামবল্লভ ধর উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন—'মোটেই নয়, প্রমাণ যদি কিছু থাকে তবে তা নিশ্চয়ই আছে ড. দেবপ্রসাদের কাছে।

ছোটোমামা এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন। তিনি এবার ব্রিফকেস থেকে পর পর একুশটা ফটোগ্রাফ বের করলেন। শকুনের দেহে কি রকম পরিবর্তন, তার পরপর ধারাবাহিক চিত্র। স্লো-মোশান ফোটোগ্রাফিতে সেটা ধরে রাখা হয়েছে। এ এক আশ্চর্য চিত্র।

আমি বললাম—এই দেখুন, শকুনের ঘাড়ের কাছে স্কেচ পেনসিল দিয়ে আমার নিজের হাতে লেখা V চিহ্ন।

ড. মাথুর তখন তোতলামি করে রামবল্লভের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—'আপনিই আমাকে এই প্রাণীটা এনে দিয়েছিলেন। আর আজ আপনিই আমাকে এইরকম একটা বিশ্রী ব্যাপারে জড়িয়ে ফেললেন?'

রামবল্লভ বলতে শুরু করলেন—

হ্যাঁ, একথা সত্যি যে আমিই শকুনটাকে আপনার কাছে পৌঁছে দিয়ে যাই। কিন্তু কথা ছিল আপনি এই আবিষ্কারের জন্য কাগজে আমাদের দুজনের নামই প্রকাশ করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আপনার। আপনি একাই সমস্ত কেকটা খেতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ সব কৃতিত্বের অধিকারী যে আপনিই সে কথা বোম্বের 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র সম্পাদককে ভালো করে জানিয়েছেন। ধন্য আপনি! আর ধন্য আপনার রিসার্চ!

আমার সমস্ত গোলমাল হয়ে যেতে শুরু করল। সব যেন হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। তাহলে সত্যিই গৃধিনি আমাদের বাড়ি থেকে উড়ে পালিয়ে যায়নি। রামবল্লভ ধরই আবিষ্কারের খেতাব নেবার জন্যে ওকে মাথুরের কাছে চালান করে দিয়েছিল। রামবল্লভ নিজেই স্বীকার করল আমাদের বাড়ির সুইপার দেবকীর সঙ্গে যোগ

সাজসে সে এই কাজটা করেছে। দেবকীর কাছে বাড়ির একটা একস্ট্রা চাবি থাকে এবং খুব ভোরে সে কাজ করতে আসে। ব্যাপারটা এখন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

এদিকে রামবল্লভ আর মাথুর যখন হাতাহাতি করার উপক্রম করছে, সেই সময় প্রেসের রিপোর্টাররা ছোটোমামাকে ঘিরে ধরল। ছোটোমামা শকুনের ট্রান্সফরমেশনের সমস্ত ছবি এবং কম্পিউটার অ্যানালিসিস-এর সব কপি ওদের হাতে দিয়ে বললেন—

'এই ঘটনার জন্য বাস্তবিকই আমি দুঃখিত। ড. মাথুর এবং রামবল্লভ ধর দুজনেই আবিষ্কারের এই খ্যাতি চুরি করতে চেয়েছিলেন। সত্য মূল্য না দিয়েই বিজ্ঞানের খ্যাতি করা চুরি ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে সৌখিন মজদুরি। ভাগ্যিস আজকেই আমি খবরের কাগজের নিউজ দেখে এখানে এসেছিলাম, নইলে কী হত তা কে জানে, হ্যাঁ, আরও একটা কথা। এই শকুনির দেহ থেকে আমি একটা অ্যান্টিক্যানসার ড্রাগও আবিষ্কার করেছি যেটা বিলেতের নেচার পত্রিকার ছাপা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু হয়তো শকুনকে স্টাডি করে জানা যাবে। আচ্ছা চলি, নমস্কার।'

পরদিন সকালে 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র প্রথম পাতায় ছোটোমামার সমস্ত কৃতিত্ব ফলাও করে ছাপা হয়েছে। সেই সঙ্গে ড. মাথুর আর রামবল্লভ ধরের যাবতীয় কীর্তি কাহিনিও। সম্পাদকীয় স্তম্ভে ছোটোমামার যেমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে, ঠিক তেমনই নিন্দা করা হয়েছে ওই দুজনকে।

গতকাল আমি আর ছোটোমামা গৃধিনিকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা ফিরেই ইগারটন স্মিথের ই-মেল পেলাম। সামনের মাসের চার তারিখে ছোটোমামার বক্তৃতা। লন্ডনের কিংস কলেজেই। ছোটোমামার সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।

অদৃশ্য বস্তু

অদ্রীশ বর্ধন

মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল নন্দবাবুর।

সম্পাদক ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কাচের চেম্বারে তিনি বসে আছেন। নীচের রাস্তার পিচ গলে গেছে। কিন্তু তাঁর ঘর দার্জিলিং-এর মতোই মোলায়েম শীতল। এয়ার কন্ডিশনার চলছে ফুরফুর করে। হাতের কাছেই তিনখানা টেলিফোন। বাড়িতে টেলিফোন, চবিবশঘন্টার ড্রাইভার সমেত গাড়ি মাসে পাঁচ অঙ্কের বেতন—এ সবই তে কোম্পানি দিচ্ছে। কাজেই একসময়ে তিনিও যে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরেছেন হাতে লেখা নিয়ে, তা মনের কোণে কোথায় চাপা পড়ে গেছে। লেখকদের তিনি এখন কীটাণুকীট মনে করেন।

নন্দবাবু অবশ্য নতুন লেখক নন। বয়স তাঁর পঞ্চাশ পেরিয়েছে। যদিও চুলে পাক না ধরায় আর মুখের চামড়া কোথাও কুঁচকেও বা ঝুলে না যাওয়ায় তাঁকে অনেক কমবয়সি মনে হয়। মনের দিক দিয়ে তরুণ বয়েসে যতখানি তরুণ ছিলেন, এই প্রৌঢ় বয়েসেও ততখানি তরুণ। সেটা তাঁর সাহিত্য কর্ম দেখলেই ধরা যায়। তাঁর গল্পের প্লট সবসময়ে অ্যাডভেঞ্চারে ঠাসা, তাঁর গল্পের চরিত্ররা সবসময়ে দুরন্ত ফুটন্ত প্রাণবন্ত। বেগে এগিয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা তাঁর শিরায় উপশিরায় বয়ে চলেছে বালক বয়স থেকেই। তাঁর কাহিনিগুলোয় এই চরৈবেতি-র আভাস পাওয়া যায় মুহুর্মুহু। তাঁর ভাষা আরবি ঘোড়ার মতোই টগবগে।

অথচ অন্তরে তিনি কবি। তিনি দার্শনিক। বৈরাগ্য তাঁর সত্তায় মিশে রয়েছে। লোভ বা মোহ—টাকা অথবা মনের—তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি সবসময়ে নতুনের পূজারি—যা নেই, তাকে সৃষ্টি করার আনন্দেই বুঁদ হয়ে থাকতে ভালোবাসেন। তার বেশি কিছু চান না। তাই কিছু পানওনি।

একটা সময় গেছে, যখন তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ভগীরথ বলা হয়েছে। নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে তিনি এক্কেবারে নতুন ধরনের পত্রিকা বের করেছিলেন সেই পত্রিকার লেখক ছিল না, পাঠকও ছিল না। নিজেই লিখে গেছিলেন প্রতিটি সংখ্যায়, ছবিও এঁকে দিয়েছিলেন, এজেন্টদের কাছে পৌঁছে দিতেন, পোস্ট অফিসে দাঁড়িয়ে বুক প্যাকেট বাইরের এজেন্টদের কাছে পাঠাতেন।

সাহিত্যের সেই নতুন শাখা এখন পল্লবিত হয়ে উঠেছে। অনেক কুঁড়ি ফুটে ফুল হয়ে গেছে। যে বিষয় নিয়ে বাণিজ্য করার কল্পনাও কেউ করেনি এখন তা নিয়ে পুরোদস্তুর বাণিজ্য চলছে।

নন্দবাবু তাই সরে এসেছিলেন। কাজ তাঁর শেষ এখন বিশ্রাম কিন্তু বিশ্রাম চাই বললেই কী বিশ্রাম নেওয়া যায়। মাঝে মাঝেই অনুরোধ এসেছে কলম ধরার জন্যে। তিনি ধরেছেন তখনই যখন আনন্দ পেয়েছেন। সৃষ্টিকরার আনন্দ। নইলে নীরব থেকেছেন। যেখানে মনের চাহিদা মেটে না, শুধু বাইরের চাহিদা মেটানোর জন্যে সেখানে তিনি যান না। এই রকমই একটা আহ্বান এসেছিল 'খেয়া' পত্রিকা থেকে।

'খেয়া' বড়ো গোষ্ঠীর বড়ো কাগজ। এক্কেবারে কমার্শিয়াল কাগজ। এখানে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করা চলে না। লোকে যা চায়, তাই দিতে হবে। লোকে যা মনে মনে চায় অথচ মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারে না তাও দিতে হবে তা সে যতই গলিত ক্ষতিকারক হোক না কেন, পাঠকদের মনের গোপন চাওয়াটা মার্কেট রিসার্চ করে জানা হয়। তার ওপর স্কিম তৈরি হয়।

চাকচিক্যের যুগে 'খেয়া' পত্রিকা তাই বাজার ধরে রেখেছে। 'পহেলে দর্শনধারী পিছে গুণবিচারি'র যুগে 'খেয়া' বাজার মাত করেছে।

'খেয়া'র বর্তমান সম্পাদক বাণিজ্যের এই গুপ্ত কৌশলটা বোঝেন। একসময়ে তিনি নন্দবাবুর কাগজে লিখেছিলেন। তখন তিনি নেহাতই বালখিল্য ছিলেন। নন্দবাবু সম্বন্ধে হয়তো একটু শ্রদ্ধা ছিল। তার চেয়েও

বেশি ছিল চাপা রাগ। কেন না, নন্দবাবু ছিলেন লেখা নির্বাচনের ব্যাপারে অতীব নিষ্ঠুর। বিশেষ করে পুজোসংখ্যার লেখা বাছাইয়ের সময়।

'খেয়া'র ঠান্ডাঘরে বসে এই সব কথা নিশ্চয় মনে পড়েছিল সম্পাদকের। তাই তিনি টেলিফোন করেছিলেন নন্দবাবুকে। অনেক আমড়াগাছি করেছিলেন। একদিন পায়ের ধুলো দিয়ে যেতে বলেছিলেন। সন্ন্যাসী প্রকৃতির নন্দবাবু সরল মনেই এই আহ্বানকে সম্মান দিয়েছিলেন। এই বয়েসে লেখা নিয়ে নিয়ে ফেরি করতে কোথাও যাওয়া শোভন নয়। তাঁর মতো মানুষের পক্ষে তো একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু যেখানে আমন্ত্রণ ঘটে শুধু আড্ডামারার জন্যে, সেখানে তিনি কাছা খুলে দৌড়োন।

এসেছিলেন 'খেয়া'র সম্পাদকের ঘরেও। তিনটে গল্প আর একটা উপন্যাস চেয়েছিলেন সম্পাদক। নন্দবাবু তথাকথিত প্রথম শ্রেণির জাত লেখক নন। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি আছে। চামড়া ফুটো করে ভেতর পর্যন্ত যেন দেখতে পান। সম্পাদকের ভেতরটা তাঁর কাছে খুব অস্পষ্ট থাকে কিন্তু তা নিয়ে আর ভাবেনওনি। কমার্শিয়াল কাগজের সম্পাদকদের তো এই রকমই বাঁকাচোরা হতে হয়। নইলে যে, কাগজের কাটতি কমবে —চাকরিও থাকবে না।

গল্প তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। উপন্যাসটা হাতে করে নিয়ে গেছিলেন।

কাচের ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকতেই ভুরু কুঁচকে চেয়েছিলেন সম্পাদক। যেন, নন্দবাবুকে তিনি চেনেন না। তাতেও আহত হননি নন্দবাবু। বড়ো কাগজের সম্পাদকদের মাথায় কখন যে কী দুশ্চিন্তা থাকে, তা কী বলা যায়। তাই ছোট্ট হেসে চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিলেন।

বলেছিলেন—'আপনার কথামতো উপন্যাসটা লিখে আনলাম।'

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেছিলেন সম্পাদক 'আমার কথা মতো। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমার মেমরি বোধ হয় আজকাল ফেল করছে। আপনি লিখতে চেয়েছিলেন—আমি বলেছিলাম, লিখুন। প্রেসাইসলি এই বলেছিলাম।'

নন্দবাবু থ হয়ে গেলেন। আর তখনই তাঁর মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। কোনো কথা বলতে পারলেন না। সম্পাদকের কাজ হয়ে গেছিল। এবার বললেন—'লেখা এনেছেন? রেখে যান।'

নন্দবাবু বলেছিলেন—'আর একবার মেজেঘষে দিই।'

লেখা নিয়ে তিনি বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন রাস্তায় যেখানে পিচ গলছে।

নন্দবাবুর জীবনের আর এক অধ্যায়ের শুরু এই ঘটনার পর থেকেই।

ছাতা আর উপন্যাস নিয়ে সোজা কার্জন পার্কে চলে এসেছিলেন নন্দবাবু। ঘিঞ্জি শহরের এই ছোট্ট ফুসফুসটা তাঁর চিরকাল ভালো লাগে। কখনো পার্কের কোণে দাঁড়িয়ে ইঁদুরদের মস্ত পাতালকেল্লা দেখেন। ভারতে যত লোক আছে, ইঁদুর আছে তার সাত গুণ। কলকাতায় যত লোক আছে, ইঁদুর আছে তার আট গুণ। যদি কোনোক্রমে ইঁদুরদের মধ্যে মিউটেশন ঘটে, জিন-বিকৃতির ফলে তারা অবিশ্বাস্য রকমের মেধাবী আর কুচক্রী হয়ে ওঠে—তাহলে কাতারে কাতারে ইঁদুর কী ঘটাতে পারে শহর জুড়ে, এই প্লট নিয়ে একখানা উপন্যাসও ফেঁদেছিলেন।

নন্দবাবুর এই এক দোষ। বিজ্ঞানের পাতায় যে কথা লেখা নেই, বিজ্ঞান যাকে অপবিজ্ঞান বলে—তা নিয়ে তিনি ভাবেন। তাঁর কবিসত্তা আর দার্শনিকসত্তা অনিয়মের মধ্যে নিয়মকে অন্বেষণ করে অদৃশ্য জগতের মধ্যে দৃশ্যমান জগতের শেকড়ের খোঁজ করেন। উনি কখনো বাঁধাধরা ছকের মধ্যে চলেননি। ওঁর মনের খোরাক যুগিয়ে এসেছে প্রকৃতি। কারণ, প্রকৃতি কখনো প্রশ্ন করে না। বরং অসম্ভবের ব্যাখ্যা যুগিয়ে যায় সন্ধানী মনের কাছে।

কার্জন পার্কের স্নিগ্ধ প্রকৃতি তাই সেদিন টেনে নিয়ে এসেছিল নন্দবাবুকে গরম পিচের রাস্তা থেকে। গাছতলায় তিনি বসলেন। বেশ ছায়া এখানে। নীচে ঘাস। মনটা একটু জুড়িয়ে এল। তারপর বাঁ কুনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে আধশোয়া হলেন। মাথার ঝাঁ-ঝাঁ ভাবটা কমে আসছিল। একটু পরে সটান শুয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন সন্ধে হয়েছে। বড়ো রাস্তায় হ্যালোজেন ল্যাম্পের তীব্র আলোকেচ্ছ্বাসে ঝিলমিল ঢেউ তুলে ছুটছে নানারঙের গাড়ি। এই শহরের বিত্তশালীদের দম্ভ ওরা। শুয়ে থেকেই ঘাড় ফিরিয়ে রাস্তা দেখছিলেন নন্দবাবু। এবার উঠে বসলেন। তখনই মনে হল, কে যেন তাঁর সামনে বসে আছে। তাকে দেখা যাচ্ছে না। কেননা, গাছের ছায়া এখানে নিরেট। আলোও নেই এদিকে। অথচ, বেশ মনে হল, ওই অন্ধকার পুঞ্জের মধ্যে একজন বসে আছে।

এবং চেয়ে আছে তাঁর দিকে। আশ্চর্য হলেন না নন্দবাবুর। এরকম ঘটনা অনেকের জীবনেই ঘটে। তাঁর জীবনেও ঘটেছে। পেছন ফিরে না তাকিয়েও বোঝা যায়, পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে, একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

নন্দবাবু হাই তুললেন। গরম এখন নেই। ঝিরঝিরে হাওয়ায় গাছের পাতা শিরশির করছে। নিকষ আঁধারকে চোখে সইয়ে নেওয়ার জন্যে তিনি চোখ পাকিয়ে সেদিকে চেয়েই রইলেন।

তবুও কাউকে দেখা গেল না। কার্জন পার্ক ইদানীং কুখ্যাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে সন্ধের পর। তাই নন্দবাবু ঠিক করলেন, উঠে পড়া যাক।

বড়ো খামে মোড়া লেখাটা, মাথার তলায় দিয়ে শুয়েছিলেন। এখন সেটা কুড়িয়ে নিলেন। গায়ের ঘাস আর পাতা ঝেড়ে নিলেন। এবার তিনি উঠবেন।

কিন্তু উঠতে গিয়েই মাথাঘুরে গেল নন্দবাবুর। আস্তে আস্তে তিনি শুয়ে পড়লেন। তখন যদি তাঁর নাড়ি চেপে ধরে বসে থাকতেন কোনো ডাক্তার, তিনি দেখতেন নাড়ির ধুকপুকুনি যেন একটু একটু করে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

ধুকপুকুনি কিন্তু নিতল থেকেও আবার ফিরে এল। স্বাভাবিক হয়ে গেল। চোখ মেললেন নন্দবাবু। সে চোখে এখন অন্য চাহনি।

রাত নটায় বাড়ি ফিরলেন নন্দবাবু। বাসে নয়, ট্যাক্সিতে। নন্দবাবু কিন্তু ট্যাক্সি ডাকেননি। তিনি ট্যাক্সি চড়েন না। কেউ গাড়ি চড়াতে এলেও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন।

সেই সন্ধ্যায় কিন্তু ধীর স্থির, পদক্ষেপে কার্জন পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সির জন্যেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পকেটে ছিল মোটে দুটাকা ষাট পয়সা। তিনি তা জানতেন।

এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে ট্যাক্সিওয়ালারা প্যাসেঞ্জার বোঝে। বিশেষ করে সন্ধের পর তাদের মেজাজ তেরিয়া হয়ে যায়। শাঁসালো যাত্রী ছাড়া কাউকে পাত্তা দেয় না।

নন্দবাবুর শ্রীহীন পোশাক দেখেও কিন্তু একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। ড্রাইভার পেছনে হেলে পড়ে দরজা খুলে দিয়েছিল। কোনো কথা নয়। উঠে বসেছিলেন নন্দবাবু। ড্রাইভার মিটার ডাউন করেনি। এমন কী নন্দবাবু কোনদিকে যাবেন, তাও জিজ্ঞেস করেনি। ঝড়ের বেগে লেনিন সরণি দিয়ে মৌলালি পেরিয়ে বেলেঘাটা রোড ধরে চাউলপট্টির সি-আই-টি বিল্ডিংস-এর একটা ব্লকের সামনে এসে ব্রেক কষেছিল। দরজা খুলে দিয়েছিল।

নন্দবাবু নেমে গেছিলেন ভাড়া না দিয়ে। ড্রাইভার চলে গেছিল ভাড়া না চেয়ে। এইটাই যেন স্বাভাবিক। মিটার ডাউন করা হয়নি এই কারণেই।

ছোট্ট এই ওয়ান-রুম ফ্ল্যাটে একা থাকেন নন্দবাবু। তিনি সংসার করেননি। একা থাকতে ভালোবাসেন। একা রেঁধে খান। এন্তার বই পড়েন। ফ্রিজ আর টেলিফোন ছাড়া আধুনিক কলকবজা তাঁর ঘরে আর নেই। ল্যাচ খুলে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালালেন নন্দবাবু। আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। চেয়ে রইলেন নিজের দিকে। তারপর চাইলেন আয়নার পাশেই ঝোলানো ফ্রেমে বাঁধাই নিজের ছবির দিকে।

মিলিয়ে দেখলেন আয়নার প্রতিকৃতি আর ছবির প্রতিকৃতি। একই মানুষ। অথচ কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে গেছে। খু-উ-ব সূক্ষ্ম। পরিবর্তনটা ভেতরের। তাই বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

পালটেছে শুধু চাহনি। ওঁর চাহনি চিরকালই শান্ত।

এখনও তা শান্ত। তবে মনে হচ্ছে, ওই চাহনির নীচ থেকে আর একটা চাহনি মেলে ধরেছে নিজেকে। সে যে কী চাহনি, তা বলে বোঝানো যায় না।

পালটেছে তাঁর হাঁটাচলার ভঙ্গিমা, তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার পোজ। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর আভিজাত্য অকস্মাৎ যেন তাঁকে আশ্রয় করেছে আরও কিছুক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন নন্দবাবু। একটা আঙুলও নাড়লেন না। কিন্তু যেন শরীরের সমস্ত এনার্জি সংহত হল চাহনির মধ্যে। সেই চাহনি যেন নিঃশব্দে অদৃশ্য বিস্ফোরণ ঘটাল বাতাসের মধ্যে।

বেজে উঠল টেলিফোন। মেপে পা ফেলে টেবিলেন দিকে এগিয়ে গেলেন নন্দবাবু। খানদানি পদক্ষেপ। টেলিফোনের বাদ্যি বাজলেই তাড়াহুড়ো করতেন আগে। এখন সে অভ্যেস তিরোহিত হয়েছে আচমকা।

রিসিভার তুলে নিয়ে খুব আস্তে বললেন—'হ্যালো।'

গলা শুনে নন্দবাবুকে নিশ্চয় চেনা গেল না। কেন না, এত আস্তে এত দানা-দানা গলায় তিনি তো কখনো কথা বলেন না।

তাই অপর পক্ষ বললেন—'নন্দবাবুকে দিন।'

'আমিই নন্দ নাগ।'

'আপনি!' যেন চমকে উঠল অপরপক্ষ—'আ-আপনি অমনভাবে চলে গেলেন—'

'কে বলছেন?' গলা শুনেই নন্দবাবু বুঝেছিলেন, কার টেলিফোন। তবুও প্রশ্ন করলেন নিরুত্তেজ নিষ্পম্প গলায়। এ গলার উত্থান-পতন নেই কিন্তু আছে ছোটো ছোটো দানার কারুকাজ—যা শ্রোতার কানের মধ্যে দিয়ে ব্রেনের মধ্যে ঝড় সৃষ্টি করে।

এই শ্রোতার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটল। ক্ষণেকের জন্যে কথা আটকে গেল। তারপর আমতা আমতা করে বললে—'আ-আমি নির্ঝর সেন।'

'ও। কী ব্যাপার?'

'আপনার উপন্যাসটা—'

'বললাম তো, একটু মেজে ঘসে দেব।'

'আর ইয়ে,...কাল সকালে কি ফ্রি থাকবেন?'

'কটায়?'

'আপনিই বলুন।'

'ধরুন নটা?'

'জহরবাবু আপনার সঙ্গে কথা বলতে যাবেন। খুব দরকার।'

—'ঠিক আছে,' রিসিভার নামিয়ে রাখলেন নন্দবাবু। অবিচল মুখে এসে বসলেন সোফায়। একঠেঙে ঘেরাটোপ বাতির আলোয় তাঁর ঝাঁকড়া চুলের ছায়া এসে পড়েছে চোখের ওপর। অদ্ভুত চাহনি, এখন, প্রায় অদৃশ্য!

জহর মল্লিক সবচেয়ে শক্তিমান পত্রিকা গোষ্ঠীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এ যুগে তার শক্তিই সবচেয়ে বেশি, যে জনমত তৈরি করে দিতে পারে। সে ক্ষমতা আছে জহর মল্লিকের। প্রধানমন্ত্রীও তাঁকে সমীহ করেন।

সকাল ঠিক নটায় ঘটল সেই অভাবনীয় ব্যাপার। জহর মল্লিকের পথ চেয়ে বসেছিলেন না নন্দবাবু। তাঁর অগোছালো ঘর অগোছালোই ছিল। মশারিও ঝুলছিল দেওয়ালের হুকে। এক কাপ কফি বানিয়ে তিনি বসেছিলেন উপন্যাসকে মাজাঘষা করতে।

বেল বাজল দরজায়। সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন নন্দবাবু।

দরজা কিন্তু আগেই খুলে গেছে। পাড়ার সবচেয়ে পাওয়ার ফুল পার্টির এক তরুণ নেতা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে। দৌড়ে এসে নন্দবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বললে চোখ বড়ো বড়ো করে—'কাকু, জহর মল্লিক এসেছেন।'

জহর মল্লিককে এরা চেনে।

নন্দবাবু ছেলেটির চোখে চোখ রাখলেন। আর কিচ্ছু বললেন না। ছেলেটির ভেতর পর্যন্ত নড়ে গেল সেই চাহনির ধাক্কায়। সে এই পাড়াতেই জন্মেছে, এই পাড়াতেই বড়ো হয়েছে নন্দবাবুকে সে চেনে।

কিন্তু আজ মনে হল যেন অন্য কাউকে দেখছে।

খোলা দরজা থেকে ভেসে এল অমায়িক কণ্ঠস্বর—'আসতে পারি?'

জহর মল্লিক। খর্বকার। বয়স বড়জোর চল্লিশ। তবে না-আঁচড়ানো একগাদা চুলের বেশির —ভাগই রুপোলি হয়ে উঠেছে। নিখুঁতভাবে শেভ করার ফলে টকটকে ফর্সা রং যেন ফেটে পড়ছে। পরনে খদ্দরের ঢিলে হাতা পাঞ্জাবি আর পায়জামা।

পত্রিকা জগতের 'টাইফুন' জহর মল্লিক এই বেশেই পৃথিবীর সর্বত্র সম্মান পান।

নন্দবাবু কিন্তু শশব্যস্ত হলেন না। দু'পা এগিয়ে গিয়ে শুধু বললেন—'আসুন।'

শীতল অভ্যর্থনার জন্যে বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন না জহর মল্লিক। নির্ঝর সেনকেও দেখা গেল পেছনে। বশংবদ ভৃত্যের মতো। দেশের তাবৎ বুদ্ধিজীবীরা চুল পর্যন্ত বিকিয়ে বসে আছে যাঁর কাছে, সেই তিনি তাঁর দুর্লভ পদধূলি দিয়ে ধন্য করলেন নন্দবাবুর শ্রীহীন এককক্ষ ফ্ল্যাটকে—অথচ নন্দবাবু এত নির্বিকার!

সুট করে উধাও হল পার্টির ছেলেটি। জহর মল্লিক সপারিষদ ঘরে ঢুকলেন। নির্ঝর সেন তাঁর সঙ্গে এক গাড়িতে আসতে পেরে কৃতার্থ হয়ে গেছেন। বিগলিত হাসি হেসে নার্ভাসনেসকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

হাত বাড়িয়ে খাটের পেছনে রাখা ডবল সোফা দেখিয়ে দিলেন নন্দবাবু। সোফার এক কোণে পাহাড় করা বাসি জামাকাপড়। হপ্তায় একদিন এগুলো কাচেন। জহর মল্লিক তৎক্ষণাৎ বসে পড়লেন না। নির্ঝর সেন বসতে গিয়েও বসতে পারলেন না, 'টাইফুন' দাঁড়িয়ে আছেন দেখে।

ঘরের চেহারা ঝিলমিল হিরে চাউনি দিয়ে জরিপ করে নিলেন জহর মল্লিক।

তারপর বসলেন। ভণিতা করলেন না। তাঁর কাছে সময় মানেই টাকা, বললেন—'নন্দবাবু আপনাকে আমাদের চাই।'

'বেশ তো।'

'কিন্তু এমন জায়গায় থাকা আপনাকে মানায় না।'

'তা বটে,' বললেন নন্দবাবু, অথচ এই জায়গাই তাঁর সবচেয়ে পছন্দ। এককোণে, সবার চোখের আড়ালে, অজানা বুনোফুল হয়ে ফুটে থাকতেই তিনি ভালোবাসেন। জহর মল্লিকের সামনে কিন্তু সেই ইচ্ছের প্রতিধ্বনি শোনা গেল না।

'টাইফুন' বললেন— 'আপনার জন্যে আমরা পুষ্পক প্যালেসে ব্যবস্থা করছি।'

'ভালোই তো,' পুষ্পক প্যালেসে থাকতে হবে শুনে একটুও ভাবান্তর দেখালেন না নন্দবাবু। অথচ, এই প্যালেস নিয়ে এর মধ্যেই প্রচুর ঢক্কা নিনাদ শোনা গেছে গোটা বিশ্বে। এই প্রাসাদ নির্মাণ যখন শেষ হবে, তখন তা হবে পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাসাদ। রাশিয়ার হারমিটেজ মিউজিয়ামে আছে 1000 ঘর। এখানে থাকবে দেড়হাজার ঘর, গোটা পৃথিবীর সংস্কৃতির ইতিহাসকে ধরে রাখা হবে ঘরে ঘরে।

জহর মল্লিকও লক্ষ করলেন নন্দবাবুর নিরুত্তাপ সম্মতি। বিস্ফারিত হল নির্ঝর সেন-এর চক্ষুযুগল।

টাইফুন বললেন—'আপনি যা চাইবেন, তাই পাবেন।'

'কি শর্তে?' এই প্রথম প্রশ্ন করলেন নন্দবাবু।

'আপনার সমস্ত ক্রিয়েশন হবে আপনাদের মাধ্যমেই প্রকাশ পাবে।'

'অর্থাৎ আমার সমস্ত ক্রিয়েশন হবে আপনাদের পণ্য দ্রব্য?'

হিরে-চোখের ওপর পাতা কেঁপে গেল জহর মল্লিকের। এভাবে স্পষ্ট কথা কেউ তাঁকে বলেনি।

কাষ্ঠ হেসে বললেন—'তা কেন ভাবছেন। দেশের প্রতিভাকে যোগ্য সম্মান দিতে পারলে আমরা ধন্য হব।'

'ধন্যবাদ। তাই হবে।'

নমস্কার করে উঠে পড়লেন সপারিষদ জহর মল্লিক। এরপর থেকেই যেন আরব্য উপন্যাসের নতুন নতুন কাহিনি শোনা গেল নন্দবাবুকে ঘিরে। তিনি এখন আছেন পুষ্পক প্যালেসের সবচেয়ে ওপর তলায়। এ প্যালেস যেখানে নির্মিত হচ্ছে, তার একদিকে গভীর জঙ্গল, আর একদিকে ধু ধু সমুদ্র। ম্যাগনেটিক মনোরেলের বুদ্ধি বাতলে দিয়েছেন নন্দবাবু সস্তায় যাত্রী পরিবহণের জন্যে। মাটি থেকে তিরিশফুট উঁচু দিয়ে নক্ষত্র বেগে মনোরেল ছুটিয়ে নিয়ে যায় রোবট চালক। সমুদ্রের ধারে কয়েক মাইল জায়গা ঘিরে তিনটে প্রকাণ্ড অ্যাকুয়ারিয়াম বানানো হয়েছে। তিমি, ডলফিন আর সিন্ধুঘোটক থাকে তিন অ্যাকুয়ারিয়ামে। ভাষা শেখানো হচ্ছে ডলফিনদের।

নন্দবাবুকে আর দেখা যায় না। তিনি এখন সাধারণ মানুষের নাগালের অনেক বাইরে। পুষ্পক প্যালেসের যে অংশে তিনি থাকেন তার ত্রিসীমানায় কাউকে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না।

আর এখান থেকেই তাঁর লেখা টাইডাল ওয়েভ-এর মতোই ধেয়ে যাচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র। তিনি লেখেন বাংলায়। কিন্তু পৃথিবীর 5000 ভাষার বাছাই করা ভাষাগুলোয় সেই লেখার অনুবাদ হয়ে যায় ওই প্যালেসেই। ফলে, বাংলার লেখা পৃথিবীময় আলোড়ন তুলে চলেছে দিবস-রজনীর প্রতিটি মুহূর্তে।

তাঁর লেখার বিষয় আর ধাঁচও পালটে গেছে। বিচিত্র এক বস্তুকে বারংবার তিনি তাঁর সব লেখার মধ্যে টেনে এনেছেন। যে বস্তুকে দেখা যায় না।

পাঁচ বছর পরে তিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেলেন। তারপরের বছরই পেলেন নোবেল পুরস্কার।

প্রফেসর নাট বল্টুর টনক নড়ল তখনই।

বাংলার সাহিত্যিক নন্দ নাগ রাতারাতি পৃথিবীর সাহিত্য বাজার দখল করে নেওয়ায় টনক নড়েছিল অনেকেরই। রাশি রাশি পুরস্কার পেয়েছেন, আমন্ত্রণ পেয়েছেন, কিন্তু পুষ্পক প্যালেসের ঘর ছেড়ে তিনি এক

ইঙ্গিও নড়েননি। বিদেশের মোহ তাঁর কোনো কালেই ছিল না।

তারপরেই নোবেল পুরষ্কার। হইচই পড়ে গেল গোটা দুনিয়ায়। শুরু হল কানাঘুষো কে এই ভুঁইফোঁড় সাহিত্যিক সবচেয়ে হিমালয় প্রতিম হল বাঙালিদের জল্পনাকল্পনা হেথায়-হোথায় মাঝে মাঝে যাঁর কলমচালনা ঘটেছে গত তিরিশ বছর ধরে, আচমকা তিনি রকেট স্পিড অর্জন করলেন কী করে?

বেশি করে নড়ে বসেছিলেন বৈজ্ঞানিকরা। তার কারণও আছে। নন্দ নাগ বিজ্ঞানী নন। অথচ বিজ্ঞানকে ঢুকিয়াছেন তাঁর সাহিত্যে। কিন্তু তা নির্জলা বিজ্ঞান নয়। তার মধ্যে আছে কবিত্ব, আছে দর্শন, আছে ফ্যানট্যাসি, স্রেফ লেখার মুনসিয়ানা আর পরিবেশনার অভিনবত্বে, তিনি যা বলতে চেয়েছেন—তা পাঠকের মনের ভেতরে ঢুকে গেছে। এমন একটা তত্ত্বে বিশ্বাস এনে দিচ্ছে, যার প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। তামাম দুনিয়ার মানুষ এখন বিশ্বাস করে, বৈজ্ঞানিকদের চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখেন নন্দ নাগ। কারণ, তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী দিয়ে বারে বারে বলেছেন একটাই কথা—ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিরাজ করছে একটা আশ্চর্য বস্তু। সে বস্তুকে দেখা যায় না, কিন্তু তার ক্ষমতা অবিশ্বাস্য।

বৈজ্ঞানিকরা আরও অবাক হয়েছেন, নন্দ নাগের লেখা একবার যে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে সে লোকটার চামচে হয়ে গেছে, এটা কী করে হয়? তাঁর সমালোচক একজনও নেই। না-পড়ে সমালোচনা করে যারা, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু পুরস্কার দেওয়ার কমিটির প্রত্যেক সদস্য তাঁর বই পড়েই একমত হয়েছে হ্যাঁ, এ লোককে পুরস্কার না দিলেই নয়।

একই ঘটনা ঘটেছে নোবেল কমিটিতেও। তরঙ্গ বেগে নন্দ নাগের উপন্যাস সবার সম্মতি পেয়েছে—দ্বিমত পোষণ করেননি একজনও। আশ্চর্য নয় কী?

কিন্তু এ প্রশ্ন নিয়ে তো প্রকাশ্য আলোচনা করা যায় না। বিশেষ করে গোটা পৃথিবীটাই যখন নন্দ নাগের 'ফ্যান' হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ তাঁর মুণ্ডুপাত করতে গেলে নিজেদের মুণ্ডু উড়ে যেতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা খ্যাপাটে হতে পারেন, খামখেয়ালি হতে পারেন—কিন্তু নির্বোধ নন। তাঁদেরও অনেক সমিতি আছে। প্রথমে সেইসব সমিতিতে গোপন আলোচনা হল, তারপর প্রফেসর নাট বল্টু চক্রর সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। তাঁকে বলা হল, তিনি কী দয়া করে তাঁর দেশওয়ালি নন্দ নাগের প্রহেলিকা সমাধানের ভার নেবেন?

প্রফেসর এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। তার মূলে ছিলাম আমি। দীননাথ।

ব্যাপারটা আমার মনেও খটকা জাগিয়েছিল অনেক দিন ধরে। অল্পসল্প লিখি বলেই নন্দবাবুকে আমি চিনতাম। নিরহঙ্কার বলে তাঁর সঙ্গে বসে কত খোশগল্পও করেছি। যখন টেলিফোন করেছি, তখন হয়তো লিখছেন। কিন্তু একবারও বিরক্ত হতেন না। টেলিফোনেই গল্প চালিয়ে যেতেন।

পাঁচ বছর আগে প্রথম তার ব্যতিক্রম ঘটেছিল। বেলেঘাটার ফ্ল্যাটে ওঁকে পাইনি। ঘর বন্ধ। কেউ জানে না কোথায় গেছেন। অথচ লেখার পর লেখা ছাপা হয়ে চলেছে একটাই শক্তিশালী গোষ্ঠীর কাগজগুলোয়।

তখন একটু গোয়েন্দাগিরি করেছিলাম। ওঁর ঠিকানা জোগাড় করেছিলাম। টেলিফোন নম্বরও বের করেছিলাম—যদিও পুষ্পক প্যালেসে নন্দ নাগ-এর নামে কোনো টেলিফোন নেই।

কিন্তু দেখা করতে পারিনি। ফোনে কথাও বলতে পারিনি। নিশ্ছিদ্র প্রাচীর তুলে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলেন নন্দবাবু।

অভিমান হয়েছিল। কৌতূহলও হয়েছিল। অত্যন্ত কাছের মানুষটা হঠাৎ অনেকদূরে চলে যাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলাম প্রফেসরের সামনে। তাঁর কাছে তো আর কোনো ব্যাপারে ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই।

প্রফেসর সব শুনতেন। শুধু শুনতেন। কথা বলতেন না। পাঁচ বছর ধরে শুধু শুনেই গেছেন। নন্দ নাগের গল্প-উপন্যাসের সমস্ত প্লটই প্রফেসর জেনে ফেলেছিলেন। আমি তো হাউ-হাউ করে বলেই খালাস হয়েছি। উনি যে মনে মনে তৈরি হচ্ছেন, তা বুঝিনি। বুড়ো ভারি ঘোড়েল এই সব ব্যাপারে।

বিদেশেও বৈজ্ঞানিকরা তাঁর দ্বারস্থ হতেই উনি আমার শরণাপন্ন হলেন। বললেন 'দীননাথ, এখান থেকেই একটা ফোন করো তোমার নন্দবাবুকে।'

মুখ গোঁজ করে আমি বলেছিলাম—'উনি ফোন ধরবেন না। ল্যাজ খুব মোটা হয়ে গেছে।'

ধরবেন ধরবেন। ওঁর হয়ে যে টেলিফোন ধরে তাকে শুধু বলবে, প্রফেসর নাট বল্টু চক্র কথা বলতে চান। 'ওয়ার্ল্ড সায়েন্স কনফারেন্স অন ডার্ক ম্যাটার'-এর তরফ থেকে।'

তোতাপাখির মতো তাই বলেছিলাম টেলিফোনে। আমার বক্তব্য 'রিলে' হয়ে চলে গেছিল নন্দবাবুর কাছে। সেকেন্ড কয়েক পরেই শুনেছিলাম দানা-দানা মন্থর কণ্ঠস্বর 'দীননাথ নাকি?'

আবেগে গলা বুঁজে এসেছিল আমার। বলেছিলাম চিনতে পেরেছেন তাহলে!

অবিচলিত গলায় নন্দবাবু বলেছিলেন—'প্রফেসর কথা বলতে চান?'

রিসিভার দিয়েছিলাম প্রফেসরকে। উনি শুধু বললেন— 'অভিনন্দন নিন নন্দবাবু। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কবে কখন যাব?'

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে প্রফেসরকে নিয়ে গেলাম পুষ্পক প্যালেসে।

পাঁচ বছরে খুব একটা পালটাননি তো নন্দবাবু। শুধু চাহনি পালটেছে। আর পাল্টেছে হাবভাব। অভ্রভেদী আভিজাত্যের শিখরে বসে যেন চেয়ে রয়েছেন আমাদের দিকে। যে ঘরে বসে কথা হয়েছিল, সে ঘরের বর্ণনা দিয়ে কাহিনির কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না।

কাটছাঁট গলায় বলেছিলেন প্রফেসর নাট বল্টু চক্র—'কাদের তরফে কথা বলতে এসেছি, টেলিফোনে তা শুনেছেন। কী নিয়ে কথা বলতে চাই তাও নিশ্চয় বুঝেছেন।'

'ডার্ক ম্যাটার নিয়ে,' খুব আস্তে বললেন নন্দবাবু।

'যা নিয়ে লিখে আপনি নোবেল প্রাইজ পেলেন।'

'তার চাইতেও বড়ো পাওয়া তো পেয়েছি আগেই, একটু থেমে ফের বললেন নন্দবাবু—'পৃথিবীর সব মানুষ এখন জেনে গেছে, ডার্ক ম্যাটার আছে। এইটাই ছিল আসল উদ্দেশ্য।'

'এ ধারণা হঠাৎ আপনার মাথায় এল কী করে?'

'ধারণা?' একটু ভুরু তুললেন নন্দবাবু। দুই চোখে নিঃশব্দ তিরস্কার—'এটা আমার বিশ্বাস।'

'প্রমাণ ছাড়া?'

'আরও প্রমাণ চান?'

'আরও মানে? কোনো প্রমাণই আপনি দিতে পারেননি।'

ঝুঁকে বসলেন নন্দবাবু। উনি আমাদের সামনে দশফুট দূরের সোফায় বসেছিলেন। অভিজাত পুরুষের মতোই। দূর থেকেই মনে হল তার চোখের মধ্যে দিয়ে অন্য একটা সূচাগ্র চাহনি মেলে ধরেছে আমাদের দিকে।

বললেন মন্দ্রমন্থর কণ্ঠে—'তিব্বতি তুল্প-র নাম নিশ্চয় শুনেছেন?'

আরও হেলাম দিয়ে বসলেন প্রফেসর—'দেখাবেন নাকি?'

এই প্রথম হাসলেন নন্দবাবু। পাঁচ বছর আগের সেই শিশুর মতো সরল হাসি নয়। মেপে হাসি। দাঁত দেখা গেল না। বললেন—'আপনার জন্যে তাকে আনিয়ে রেখেছি।'

বলে, ওয়াকি-টকি তুলে নিলেন পাশের টিপয় থেকে। বললেন—'মধুমতী, কফি দিয়ে যাও।'

ওয়াকি-টকি, নামিয়ে রেখে আমাদের দিকে চাইলেন নন্দবাবু। আবার মনে হল, ওঁর চোখের মধ্যে দিয়ে অন্য কেউ চেয়ে আছে।

বললেন—'তন্ত্রের যোগিনী সাধনার সঙ্গে তিব্বতের তুল্প সৃষ্টির মধ্যে খুব একটা অমিল আছে কি?'

প্রফেসর বললেন—'তন্ত্রকেও এনে ফেললেন?'

নন্দবাবু পলকহীন চোখে চেয়ে থেকে বলে গেলেন—'তন্ত্রে একে উপবিদ্যা, বলা হয়েছে। কুবের নাকি যোগিনীর অর্চনা করে ধনাধিপতি হয়েছিলেন, এদের অর্চনা করলে নাকি মানুষ রাজত্ব পর্যন্ত লাভ করে থাকে।'

শুকনো গলায় প্রফেসর বললেন—অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এ নিয়ে একটা উপন্যাসও লিখেছেন—শুনেছি দীননাথের কাছে।'

চোখের পাতা না কাঁপিয়ে বলে গেলেন নন্দবাবু—'যোগিনীদের মধ্যে প্রধানা হল আটজন। এঁদের মধ্যে সব সেরা হল মধুমতী।'

'যে আসছে কফি নিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি তন্ত্র সাধনা করেন?'

'না। কিন্তু তন্ত্র পড়েছি। তন্ত্রসরি গ্রন্থে মধুমতীকে আহ্বান করবার মন্ত্র শুনবেন?'

বলে, সম্মতির অপেক্ষা না রেখে উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করে গেলেন নন্দবাবু :

'দেবাশ্চ সেবকাঃ সর্বাং পরং চাত্রাধিকারিণঃ।

তারকব্রহ্মণোঃ ভৃত্যং বিনাপ্যত্রাধিকারিণঃ।'

'ফাইন' বললেন প্রফেসর।

ঘরে ঢুকল পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে। হাতে রুপোর রেকাবি তার ওপর কফির কাপ। তার পরনে গরদের লাল পাড় শাড়ি। চুল খোলা ফর্সা কপালে জ্বলজ্বল করছে লাল টিপ। চোখে আর ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি। রেকাবি নামিয়ে রেখে দুহাত তুলে আমাদের নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটি।

নন্দবাবু বললেন—'এই হল মধুমতী। ডার্ক ম্যাটারে গড়া।'

কফির কাপ তুলে নিয়ে বললেন প্রফেসর 'ডার্ক ম্যাটার তো দেখা যায় না।'

চোখ নাচিয়ে বললেন নন্দবাবু—ওটা তো আপনাদের আন্দাজি কথা প্রফেসর। ডার্ক ম্যাটার তো আজও মিসিং ম্যাটার। আপনারা সন্দেহ করছেন, গোটাব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছে এটা বস্তু। সে বস্তু লুমিনাস নয়। তাই তাকে দেখা যায় না। কিন্তু সবই আপনাদের অনুমান। ব্ল্যাক হোল যে সত্যিই তেমন ব্ল্যাক নয়, এমন কথাও তো বলেছেন, হকিন্স।'

প্রফেসর যেন একটা ধাক্কা খেলেন—'আপনি কি বলেন ডার্ক ম্যাটার তাহলে নিউট্রিনো?'

আবার সেই মাপা হাসি হাসলেন নন্দবাবু—'মহাবিস্ফোরণের প্রথম তিন মিনিটের মধ্যেই বস্তুকণা আর বিকিরণের সুরুয়ার মধ্যে আবির্ভাব ঘটেছিল ডার্কম্যাটারের। তারপর 15 বিলিয়ন বছর কেটে গেছে। আপনাদের চেনা জানা। বস্তুগূলোর মধ্যে বিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে। মহাবিশ্বের কোথাও কোথাও ডার্ক ম্যাটারেরও ক্রমবিবর্তন ঘটেছে। মানুষের চাইতেও শক্তিশালী সত্তার আবির্ভাব ঘটেছে।'

'ও সব উপন্যাসিকের কল্পনায় মানায়,' অম্লানবদনে গাল খুঁটতে খুঁটতে বলে গেলেন প্রফেসর।

চোখ জ্বলে উঠল নন্দবাবুর 'ডার্ক ম্যাটার কিন্তু মাহবিস্ফোরণের প্রথম মুহূর্ত থেকে আজও বিরাজমান ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র'—

'মহাবিস্ফোরণ।' বিদ্রূপের স্বরে বললেন প্রফেসর—'এ তত্ত্বের বিরোধী বলেই ফ্রেড হয়েল ব্যঙ্গ করে Big Bang নাম দিয়েছিলেন সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তকে। বোবার মতো ফেটে গিয়ে সৃষ্টি শুরু হয়নি। গালগল্প ছাড়ুন নন্দবাবু।'

নিমেষহীন নয়নে চেয়ে রইলেন নন্দবাবু। বললেন আস্তে আস্তে 'গালগল্প। সাংখ্যদর্শন তাহলে মিথ্যে বলেছে! বৈজ্ঞানিকরা বলছেন না, অনন্ত ঘনত্ব আর অনন্ত তাপমাত্রার মধ্যে আবার ফিরে যাবে এই ব্রহ্মাণ্ড তখন আয়তন হবে জিরো? গুটিয়ে যাওয়ার শেষে শুরু হয়েছিল ছড়িয়ে পড়া—ছড়িয়ে পড়ার শেষে আবার শুরু হবে গুটিয়ে যাওয়া? তখন সময়ের তীর ঘুরে যাবে পেছন দিকে আগামী কালের ঘটনা আজ হবে স্পষ্ট? ভবিষ্যৎ হবে অতীত? অথবা এক হয়ে যাবে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ? তাতে কী প্রমাণিত হল ডার্ক ম্যাটার আছে? নির্লজ্জের মতো খুঁচিয়ে গেলেন প্রফেসর।

'ছিল, আছে, থাকবে,' শান্তগলায় বললেন নন্দবাবু।

'ধরাছোঁয়ার বাইরে?' প্রফেসরের টিপ্পনি।

নন্দবাবুর চোখের চাহনিতে আবার দেখলাম অন্য সত্তার উগ্র প্রকাশ। কথা বললেন কিন্তু সহজ গলায় 'হ্যাঁ। ডার্ক ম্যাটার চিরকালই অদৃশ্য থাকবে।'

'তাহলে মধুমিতাকে দেখা যাচ্ছে কী করে? মধুমিতা না ছাই—রক্তমাংসের মেয়েকে দেখিয়ে গুল মারছেন।'

উগ্রতর হল উগ্র চাহনি। চিবিয়ে বললেন, 'নন্দবাবু তাহলে দেখুন।' তুলে নিলেন ওয়াকি-টকি 'মধুমিতা চলে এস।'

ওয়াকি-টকি নামিয়ে রেখে বললেন—'ডার্ক ম্যাটারের ঘনীভূত রূপ দেখিয়েছিলাম—এবার দেখুন তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া।'

মধুমিতা ঘরে ঢুকে দাঁড়াল দেওয়াল ঘেঁষে। মুখে আর চোখে সেই হাসি। এবার যেন নিবিড় ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন রয়েছে হাসির মধ্যে।

নন্দবাবু বললেন, 'তন্ত্রের একটা মন্ত্র শোনাই, অদৃশ্যকারিণীং বিদ্যাং লক্ষজাপ্যে প্রযচ্ছতি। মানে জেনে দরকার নেই, শুধু জেনে রাখুন, ডার্ক ম্যাটারে বিলীন করে দেওয়ার উপায় জেনেছিলেন তান্ত্রিক গুরুরা। মধুমিতা, তুমি যাও।'

মধুমিতার নিরেট দেহ যেন গ্যাসের দেহ হয়ে গেল। শরীরের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে পেছনের দেওয়াল। তারপরে শুধু দেওয়ালই দেখলাম, মধুমিতাকে দেখলাম না।

গাল চুলকে প্রফেসর বললেন—'ম্যাজিকটা ভালোই। কিন্তু তুল্প ম্যাজিকটা যে এখনও দেখলাম না।'

নন্দবাবু একইভাবে বসে রইলেন। চাহনি আবার শান্ত। কিন্তু অন্য সত্তা বিলক্ষণ জাগ্রত। থেমে থেমে বললেন—'বাংলার তন্ত্রই তিব্বতে মদত জুগিয়েছিল। অনেক চেষ্টায় চিন্তার কারাগ্রহণ সম্ভব করেছিল। আমি অত সময় নিই না। কার চিন্তা করছেন?' বলে, আমার দিকে চাইলেন—'দীননাথ, তুমি বরাবর নিজেকে নিয়েই বড্ড বেশি চিন্তা কর। দেখো তোমার সেই চিন্তার চেহারা।'

পলক ফেলার আগেই দেওয়ালের সামনে দেখলাম আমি দাঁড়িয়ে আছি। আর এক দীননাথ। কিন্তু একি মুখভাব। ভয়ে পাংশু উদবেগে কাঠ।

প্রফেসর বললেন—'থাক, থাক, আপনার ম্যাজিকের নমুনা অনেক দেখলাম। এর জন্যে আসিনি, পিসি সরকারের কাছে গেলেই পারতাম।'

প্রফেসর থামলেন। দ্বিতীয় দীননাথ বিলীন হয়ে গেল। নন্দবাবু বললেন—কী জন্যে এসেছেন?'

'কে আপনি?'

'আমিই ডার্ক, ম্যাটার।'

'আপনি তো নন্দ নাগ।'

'নন্দ নাগের শরীর ছেয়ে আছি আমি। অণু পরমাণুর মধ্যে ফাঁক তো অনেক। আমি সেই ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে বসে আছি। নন্দবাবুর শরীরকে ধার নিয়েছি।'

'কেন?'

'প্রফেসর, আমি আমরা ব্রহ্মাণ্ডের দূর দূরান্তে যে চেহারা, এসে দাঁড়িয়েছি পনেরো বিলিয়ন বছরের ক্রমবিবর্তনের পর তা আপনাদের চোখে অদৃশ্য। অথচ আমাদের অনেক নীচের ধাপের ডার্ক ম্যাটার এই পৃথিবী ছেয়ে রয়েছে তাও আপনাদের চোখে অদৃশ্য। মানুষ সাইকিক ফোর্স দিয়ে মাঝে মাঝে সেই ডার্ক, ম্যাটারকে কাজে লাগায়—তখন আপনারা অবিশ্বাস করেন তাই আমরা চেয়েছিলাম, আমাদের অবিশ্বাস্য শক্তি ধার দিয়ে আপনাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে—কিন্তু পারলাম না।'

'হেঁয়ালি ছাড়ুন,' কড়া গলা প্রফেসরের।

এই প্রথম নন্দবাবুর চোখে মুখে হতাশার ছাপ দেখলাম। গলার সুরেও যেন ক্লান্তি ফুটে উঠল—'নন্দ নাগ মেধাবী। কিন্তু এ বৈরাগ্য নিয়ে কি চলে? গোটা পৃথিবী জুড়ে শুধু ঈর্ষা। কেউ কারও ভালো দেখতে পারে না। আমি বসেছিলাম পার্কে। নন্দবাবুর লাঞ্ছিত মনের চেহারা দেখলাম। তাঁর যা পাওনা, তাই তাঁকে পাইয়ে দেব ঠিক করলাম। তাঁরই কলম দিয়ে সবাইকে বিশ্বাস করাতে চাইলাম। ডার্ক ম্যাটার আছে, এই পৃথিবীর দৃশ্যমান বস্তুর চাইতে অদৃশ্য এই বস্তুর শক্তি অনেক বেশি। নন্দবাবু অভাবনীয় কৃতিত্ব দেখালেন। কিন্তু লাভ কী? ক্রমবিবর্তনের পথে বহু লক্ষ বছরে আসবে—জোর করে তা চাপিয়ে দিয়ে কিছু তো হল না। আমি যতক্ষণ থাকব, নন্দবাবু ততক্ষণ সাহিত্যে সম্রাট হয়ে থাকবেন। আমরা চলে গেলেই আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবেন।'

'আমরা? মানে?' প্রফেসরের প্রশ্ন। নন্দবাবুকে এই অবস্থায় নিয়ে আসতে আমরা অনেকেই কোমর বেঁধে লেগেছিলাম, প্রফেসর।'

'কি ভাবে?'

'যে মুহূর্তে আমি ঠিক করলাম, নন্দবাবুকে এবার স্বীকৃতি দেওয়া দরকার, সেই মুহূর্তে আমাদেরই একজন নির্ঝর সেনের শরীর দখল করে তার চিন্তাকে কবজায় এনেছিল। একই সঙ্গে জহর মল্লিককে দখল করেছিল আর একজন। ট্যাক্সি ড্রাইভারের শরীরও দখল করেছিল আমাদের একজন।'

'পুরস্কার দেওয়ার সময়েও তাই ঘটেছে?'

'হ্যাঁ। নোবেল কমিটির বিচারকদের কেউই আর স্বশরীরে ছিলেন না। এখনও নেই। ওঁদের মগজ এখন আমাদের মগজ, আমাদের চিন্তা এখন ওদের চিন্তা, এখন গোটা পৃথিবীর যে সব মানুষ নন্দবাবুর বই পড়েছে, তাদের প্রত্যেকের শরীর দখল করে রয়েছি। তাই তারা নন্দবাবুর অনুরাগী—তাই নন্দবাবুর কোনো সমালোচক নেই।'

'তারপর?'

'হ্যাঁ, তারপর,' বিষণ্ণ গলায় বলে গেলেন নন্দবাবুরূপী ডার্ক ম্যাটার 'আমরা তো চিরকাল এভাবে শরীরের খাঁচায় বন্দি হয়ে মানুষের মঙ্গল করে যেতে পারব না।'

'কি করবেন?'

'চলে যাব।'

'কোথায়?'

'অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে যেখানে আছে মানুষের চাইতেও সেরা জীব।'

'নন্দবাববুর কী দশা হবে?'

'তার মানে?'

'আপনারা চলে গেলেই তো সবাই যে যার চিন্তা ফিরে পাবে। আবার শুরু হবে নোংরামি, ঈর্ষা, ইতরোমি, ভালো মানুষ নন্দবাবুর অবস্থাটা তখন কল্পনা করেছেন? কেন তাকে নোবেল প্রাইজ পাইয়ে দিলেন?'

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন নন্দবাবুরূপী ডার্ক ম্যাটার।

তারপর বললেন ক্ষীণ কণ্ঠে—'তবে তাই হোক। নন্দবাবুকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। পৃথিবীর প্রতিনিধি হয়ে তিনি থাকবেন আমাদের সঙ্গে। আমরা যেমন মানুষের শরীর দখল করেছিলাম তাদের ভালো করব বলে, তিনিও তেমনি আমাদের শরীর দখল করে থাকবেন পৃথিবীর স্মৃতি হিসেবে।'

'এই রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে?'

'না, পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গিয়ে।'

সত্যিই বিলীন হয়ে গেলেন নন্দ নাগ আমাদের চোখের সামনেই কী করে, তা লিখতে আমার কষ্ট হয়েছ। তবে নোবেল পুরস্কার প্রাপকের অকস্মাৎ অন্তর্ধানের পর পৃথিবীময় যে হট্টগোল চলেছিল, তা কারও অজানা নয়।

কষ্টটা মিলিয়ে যায় যখন ভাবি, বেঁচে আছেন নন্দবাবু। নিরাকার অবয়ব নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড চক্কর মেরে বেড়াচ্ছেন।

দেবতার চাবি

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

তাঁবুর ছায়ায় একলা বসে ছিলাম। বিকাল পাঁচটা হলেও নুবিয়ান মরুভূমিতে রোদের তেজ প্রচণ্ড। বাইরে আগুনের হলকা ছুটছে। দিন তিনেক হল এসেছি এখানে। সুদানের একদম উত্তর প্রান্তে এ মরুভূমি। শুষ্ক, প্রায় প্রাণহীন। কাঁটা ঝোপও চোখে পড়ে না। আমার যেখানে তাঁবু, তার চারপাশে কিছু দূরে বেশ কিছু প্রাচীন সৌধ আজও দাঁড়িয়ে আছে। আফ্রিকার প্রখর রৌদ্র, মরুভূমির প্রচণ্ড বালুঝড় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চেষ্টা চালিয়েও তাদের পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। পিরামিড। এক সময় এ অঞ্চল ছিল প্রাচীন মিশরের অন্তর্গত। তিন হাজার বছর আগে মিশরীয় সভ্যতার উষা লগ্নে সুদান মিশরীয়দের কাছে নুবিয়া নামে পরিচিত ছিল। ওই পিরামিডগুলি তাঁদেরই কীর্তি। গিজা এসনার মতো নুবিয়ান মরু অঞ্চলও ছিল মিশরীয়দের গোরস্থান। এ অঞ্চলের স্থানীয় নাম, 'মৃতের নগরী'।

আমি অবশ্য কোনো ইতিহাসবিদ নই। কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজেও এখানে আসিনি আমি একজন জিয়োলজিস্ট। মুথাইয়া শ্রীনিবাসন, জন্মসূত্রে ভারতীয়। কর্মসূত্রে 'রিপাবলিক অফ দ্য সুদান' এর এক ভূতাত্ত্বিক গবেষণা সংস্থাতে কাজ করি। তাদের কাজেই আমি এ অঞ্চলে এসেছি কিছু ভূতাত্ত্বিক নমুনা সংগ্রহ করার জন্য। অতি সরলভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, এখান থেকে কিছু নুড়ি, পাথর সংগ্রহ করে নিয়ে যাব আমি। এ জায়গার ভূতাত্ত্বিক গঠন বহু বছর ধরে পরিবর্তিত হয়েছে। ৪০০০ বছর আগে এ অঞ্চলে ছিল ঘন বনভূমি ও জলাভূমি। বহু প্রাণীর বিচরণ ক্ষেত্র। আদিম মানবগোষ্ঠী এখানে পশুশিকার করতে আসত। তারপর একদিন প্রকৃতি তার রূপ বদলাতে শুরু করল। জলাভূমি, নদী এসব শুকিয়ে গেল। ধীরে ধীরে তৃণভূমি গাছপালা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে এ অঞ্চল পরিণত হল ঊষর মরুভূমিতে। তবে এ কাজ সম্পন্ন হয়ে যায় মিশরীয় সভ্যতা পত্তনের আগেই। এ অঞ্চলে কিছু গভীর প্রাকৃতিক কূপ বা কুয়ো আছে। যদিও তাতে জলের চিহ্ন মাত্র নেই। কিন্তু এ সব কূপগাত্রের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে আছে ভূপ্রাকৃতিক বিবর্তনের নানা চিহ্ন। সেখান থেকেই তুলে আনা হচ্ছিল নুড়িপাথর।

'তুলে আনা হচ্ছিল' বললাম এই কারণে যে দুপুরের পর থেকে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। যারা কাজ করছিল তারা ফিরে গেছে। কাল রাতে একটা উল্কাপাত হয়েছে এখানে। আকাশ থেকে সোনালি পুচ্ছ সহ গোলাকার এক আগুনের বল নেমে আছড়ে পড়েছে কিছুদূরে একটা পিরামিডের পিছনে। রাত দশটা নাগাদের ঘটনা। তাঁবুর সামনে বসে আমি ও আমার সঙ্গীরা মেঘমুক্ত রাতের আকাশে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছি ব্যাপারটা। উল্কা পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মুহূর্ত্তের জন্য কেঁপে উঠেছিল পায়ের তলায় মাটিও। যদিও উল্কাপাতে আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি, আমরা যাইওনি সে জায়গাতে, এবং ব্যাপারটা নেহাতই প্রাকৃতিক, কিন্তু এ ঘটনা প্রচণ্ড ভীতি সঞ্চার করেছে আমার মজুরদের মনে। ওরা অশিক্ষিত আফ্রিকান যাযাবর গোষ্ঠীর লোক। প্রচণ্ড কুসংস্কারগ্রস্ত। এমনিতেই এ জায়গা 'মৃতের নগরী' বলে প্রথমে ওরা এখানে আসতে চায়নি। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে ওদের কাজে এনেছিলাম। যাই হোক, কাজেও মন দিয়েছিল ওরা। কিন্তু উল্কাদর্শনের পরই আজ সকালে উঠে তারা বলল যে তারা এ তল্লাটে আর থাকবে না। উল্কাদর্শন নাকি মৃত্যু ডেকে আনে। তবুও বুঝিয়ে সুঝিয়ে সকালের দিকে তাদের কুয়োতে নুড়ি তুলতে নামিয়ে ছিলাম। কিন্তু কুয়োতে নেমে একজনের পাথুরে দেওয়ালে ঠোক্কর খেয়ে মাথা ফেটে গেল। যদিও তার আঘাত মারাত্মক কিছু নয়, তবু তারা দুপুরবেলা কুয়ো থেকে উঠে এসে বলল, উল্কাদর্শনের কুফল ফলতে শুরু করেছে। সে কারণেই মাথা ফেটে এই রক্তপাত! তাদের গ্রামে ফিরতে হবে। সেখানে গিয়ে উল্কা দর্শনের দোষ খণ্ডন করার জন্য মরুগ্রামের জাদুকর ওঝার

থেকে তাবিজ নিয়ে কাল ফিরবে তারা। আর ফেরার সময় আমার জন্যও একটা তাবিজ আনবে। কিছুতেই তাদের আর আটকে রাখতে পারলাম না। আমাকে ফেলে রেখে তারা চলে গেল।

তাঁবুতে বসে বসে ভাবছিলাম। কাল সকাল পর্যন্ত এই প্রাচীন মরুস্থানের মৃতদের নগরীতে আমি কাটাব কী করে? না, ভূতপ্রেত অপদেবতা বা উল্কা দর্শনের কুসংস্কারের ভয় আমার নেই। আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। আমার ভাবনার অর্থ হল, একলা এতটা সময় আমি অতিবাহিত করব কী করে? সঙ্গে বইপত্তরও কিছু আনিনি। কোনো সঙ্গী পাওয়া গেলে অন্তত গল্প করে সময় কাটত। কিন্তু এখানে সঙ্গী পাওয়া যাবে কোথায়? সবচেয়ে কাছের মরু গ্রাম পঁচিশ মাইল দূরে। এ তিনদিনের মধ্যে জীবিত প্রাণী বলতে কালরাতে একটা মরুশিয়াল শুধু চোখে পড়েছে। উল্কাপাতের সময় সম্ভবত ভয় পেয়ে গর্ত ছেড়ে পালাচ্ছিল প্রাণীটা। মানুষ এখানে কই? কিন্তু এর পরই আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল একজন লোকের কথা। আজ সকালে তাকে আমি দূর থেকে দেখেছি। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা নীল রঙের লম্বা আরবি পোশাক পরা একজন বেশ ঢ্যাঙা একটা লোক! যে কুয়োতে আমার লোকেরা কাজে নেমেছিল, তার কিছু দূরে একটা পিরামিডের সামনে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে পিরামিড গাত্রে কী যেন দেখছিল লোকটা! গত তিনদিন আমাদের কাছাকাছি অন্য কোনো তাঁবু বা লোক চোখে পড়েনি। তাই কৌতূহলী হয়ে তার পরিচয় জানার জন্য তাকে ডাকব ভাবছিলাম। কিন্তু তার আগেই লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল পিরামিডের ভিতরে। আমার ধারণা লোকটা কোনো

পুরাতত্ত্ববিদ অথবা 'ইজিপ্টম্যানিয়াক' হবে। দ্বিতীয়টার সম্ভবনাই বেশি। 'মিশর ইতিহাসের ভূতগ্রস্ত লোক' বা 'ইজিপ্টম্যানিয়াক'রা এভাবেই একলা একলা দূরে বেড়ান প্রাচীর মিশরীয় সৌধগুলির আশেপাশে। কাজ করতে গিয়ে মিশর, লিবিয়াতে এ জাতীয় লোক আমি দেখেছি। ও লোকটাকে পেলেও দুদণ্ড গল্প করা যেত।

তাঁবুতে বসে লোকটার কথা মনে পড়ায় আমি ভাবছিলাম যে রোদের তাত কমলে একবার তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে খোঁজ করে দেখব যে আশেপাশে কোথাও লোকটাকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা? সেও সম্ভবত একলা। আমাকে পেলে তারও গল্পগুজবে সময় কেটে যাবে।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আমি তাঁবুর কোণে ডাঁই হয়ে পড়ে থাকা ছোটোছোটো নুড়ি পাথরগুলি পরীক্ষা করতে লাগলাম। আজকেই কুয়োর থেকে তোলা হয়েছে ওগুলি। কাদামাখা পাথরগুলির থেকে প্রয়োজনীয় নমুনাগুলি বেছে নিয়ে তা জলে ধূয়ে প্যাকেট বন্দি করতে হবে নিয়ে যাবার জন্য। অধিকাংশই বিভিন্ন ধরনের সিলিকা। কিছু লাইমস্টোনও আছে। তার গায়ে চিহ্ন আঁকা আছে উদ্ভিদের। এই ফসিলগুলি সাক্ষ্য দিচ্ছে, সুদূর অতীতে এই মরুভূমি একসময় সবুজ ছিল। পাথরগুলি ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ একটা পাথর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। গোলকৃতি, ইঞ্চিতিনেক ব্যাসের চ্যাপটা পাথরটার চারপাশে কেমন যেন খাঁজ কাটা। কী সব অস্পষ্ট আঁকিবুকি আছে তার গায়ে। প্রাথমিক অবস্থায় আমি জিনিসটাকে কোনো মোলাস্কার ফসিল বলে ভেবেছিলাম। তাঁবুকে রাখা জল দিয়ে জিনিসটার গায়ের কাদামাটি ধুয়ে ফেলতেই সেটি দেখে আমি একটু বিস্মিত হলাম। 'ফসিল-টসিল' কিছু নয়, এটা আসলে একটা ধাতব চাকতি। চাকতির চারপাশে ত্রিভুজাকৃতির খাঁজ কাটা। আর সেই খাঁজগুলির সংযোগস্থলে বেশ কিছু দাগ কাটা আছে। দাগগুলি সম্ভবত কোনো পরিমাপ জ্ঞাপক চিহ্ন। চাকতির একপাশে মিশরীয়দের প্রাচীন প্রতীক ডানা অলা সূর্য ও অন্যপাশে স্ক্র্যাব বা গুবরে পোকার ছবি। এ ছবি দুটো দেখে জিনিসটায় যে অতি প্রাচীন তা বুঝতে অসুবিধা হল না। কিন্তু জিনিসটা আসলে কী? কোন যন্ত্রাংশ? ধাতুটাও কেমন সবুজাভ! আমার পরিচিত কোনো ধাতুর মতো নয়। চাকতিটা হাতে নিয়ে ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছি। ঠিক এমন সময় বাইরে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে দেখি তাঁবুর দরজার ঠিক বাইরে বালির মধ্যে একটা মানুষের ছায়া এসে পড়েছে। তাহলে কি আমার মজুরদের মধ্যে কেউ মত পরিবর্তন করে ফিরে এল? আমি ছায়াটা দেখে উৎসাহিত হয়ে চাকতিটা আমার ব্রিচেসের পকেটে ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম।

2

বাইরে এসে আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। এ লোকটা আমার দলের কেউ নয়। আপাদমস্তক আরবি আলখাল্লাতে ঢাকা অন্য একজন লোক। মুহূর্তখানেক দেখার পরই তার দীর্ঘ আকৃতি দেখে চিনতে পেরে গেলাম তাকে। আরে এতো সেই আজ সকালে দেখা লোকটা! যার কথা কিছুক্ষণ আগে ভাবছিলাম আমি! লোকটার মুখমণ্ডলের প্রায় সবটাই নীল রঙের কাপড়ে আবৃত। শুধু উজ্জ্বল চোখ দুটোই দেখা যাচ্ছে। আমি তাকে কিছু বলার আগে সে নরম স্বরে বলল, 'দেখলাম আপনার লোকজন সব চলে গেল! একা আছেন দেখে পরিচয় করতে এলাম।'

আমি জবাবে বললাম, 'হ্যাঁ, আমিও আপনাকে সকালে দেখেছি। তা আপনিও এক একলা নাকি? ইতিহাসের খোঁজে এসেছেন?' সে বলল, 'তা অনেকটা ওই রকমই বলতে পারেন। আমার নাম 'টি-রেক্স'। তবে নাম শুনে আবার আমাকে ডাইনোসর ভাববেন না। আপনি আমাকে রেক্স বলে ডাকতে পারেন।' এই বলে সম্ভবত মুখের ঢাকার আড়ালে একটু হাসল লোকটা। আমিও একটু হেসে নিজের নাম, পরিচয় ব্যক্ত করে বললাম, 'যাক, পরিচয় হয়ে ভালোই হল। তা দুজনেই যখন একলা তখন আপনার অসুবিধা না হলে চলুন একটু বসে গল্প করা যাক।' রেক্স আমার কথায় সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে আমার তাঁবুর কাছেই একটা ছোট্ট বালির ঢিপি আঙুল তুলে দেখাল। ও জায়গাতে আমার লোকেরা বিশ্রামের জন্য ছাউনি টাঙিয়ে রেখেছিল। বেশ ছায়া আছে জায়গাটাতে। গরম বাতাসটাও কমে আসছে। সুতরাং তাঁবুতে আর না ঢুকে তার ইশারানুযায়ী দুজনে সেই বালির ঢিপির ওপর গিয়ে বসলাম।

সেখানে বসার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ; 'আপনি কবে এসেছেন এখানে? কতদিন থাকবেন?'

সে জবাব দিল, 'কালই এসেছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরতে হবে আমাকে। কিন্তু যেটা খুঁজছি সেটা না পেলে...., কথাটা আর শেষ করল না সে।

লোকটার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারছিলাম সে স্থানীয় অধিবাসী নয়। তার কথায় কোনো আরবি টান নেই। তাছাড়া মিশরীয় বা লিবিয়ানরা সাধারণত এত ঢ্যাঙা হয় না। রেক্সের জন্মস্থান জানার কৌতূহল হওয়াতে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কোন দেশের নাগরিক?'

রেক্স শুধু উত্তর দিল, 'এক সময় এ দেশেরই ছিলাম।' এই বলে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল কিছু দূরে বালিয়াড়ির মধ্যে জেগে থাকা সার সার পিরামিডের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। রেক্স যেন পিরামিডগুলির দিকে তাকিয়ে গভীর ভাবে কী যেন ভাবছে!

আমি আবার তার সাথে কথোপকথনে ফিরে আসার জন্য তার উদ্দেশ্যে বললাম, 'এ জায়গাটা কেমন অদ্ভুত তাই না?

'জনহীন মরুপ্রান্তরে রোদ ঝড় উপেক্ষা করে ওই পিরামিডগুলি হাজার হাজার বছর পরও কেমন মাথাতুলে দাঁড়িয়ে আছে।'

'আধুনিক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদেরও বিস্মিত করে এই সব স্থাপত্য। সেদিনের মানুষেরা কী কৌশলে যে...'

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রেক্স নামের লোকটা আঙুল তুলে পিরামিড সারির একটা পিরামিডের দিকে দেখিয়ে মৃদু হেসে যেন বলল ; 'ওটা খেয়াল করেছেন?'

আমি তাকালাম সে দিকে। সূর্য এখন পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে। তার বিদায় বেলার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে পিরামিডগুলির শীর্ষে। তার মধ্যে একটা পিরামিডের মাথা যেন স্বচ্ছ মনে হচ্ছে। সূর্যালোক যেন পিরামিডের মাথার কয়েকটা ধাপকে ভেদ করতে পারছে। তবে কাচের মতো স্বচ্ছ দেখানো বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু নয়। ওই পিরামিডটাই দেখাচ্ছে রেক্স।

আমি সেদিকে তাকিয়ে বললাম ; 'হ্যাঁ, খেয়াল করেছি। ওই পিরামিডের চুড়োটা সম্ভবত অ্যালাবাস্টার পাথরের তৈরি। তাই ওরকম আপাত স্বচ্ছ মনে হচ্ছে। ওই পাথরে তৈরি বেশ কয়েকটা প্রাচীন মূর্তি আমি কায়রো মিউজিয়ামে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি।' এই বলে একটু থেমে আমি বললাম, 'ফুঞ্জু যাযাবর উপজাতির আমার মজুর সর্দার গতকাল ওই পিরামিড দেখিয়ে বলছিল ওখানে নাকি 'দেবতার কবর' আছে! এক সময় নাকি নুবিয়ান মরুভূমিতে দেবতাদের কবর দেওয়া হত। মরুভূমির যাযাবররা বংশপরম্পরায় এ কাহিনি নাকি শুনে আসছে!'

আমার কথা শুনে রেক্স যে এবার স্পষ্ট হাসল তা বুঝতে পারলাম। সেই পিরামিডটার দিকে চোখ রেখেই সে বলল, 'আপনি পিরামিড নিয়ে এখনকার বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের বিস্মিত হবার কথা কী বলছিলেন?'

যদিও এ ব্যাপারে জ্ঞান আমার সীমিত, তবু তার প্রশ্নের জবাবে কিছু কথা বলার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারলাম না। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আধুনিক প্রযুক্তিবিদদের কাছেও এগুলি বিস্ময়ের কারণ। ভাবুনতো একবার, সভ্যতার সেই সূচনাকালে সে দিনের মানুষরা কী ভাবে এ সব বিরাট বিরাট পিরামিড বানিয়েছিলেন? কী ভাবে এই সমকৌণিক পাথরগুলিকে গাণিতিক নিয়ম মেনে একটার ওপর একটা বসিয়ে পিরামিড রচনা করেছিলেন? তাঁদের সময়তো ক্রেন ছিল না, কী ভাবে তারা ভারী ভারী পাথরের ব্লককে অত উঁচুতে তুলেছিলেন? আমি একটা বইতে একবার পড়েছিলাম যে, গিজার গ্রেট পিরামিড তৈরির ব্যাপারে তার নির্মাণকাল ও শ্রমিক সংখ্যা ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের বিবরণ সঠিক মানলে সেই হিসাব অনুযায়ী প্রতি দু-সেকেন্ডে এক একটা পাথরের ব্লক ওপরে তুলে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল! অনেকক্ষেত্রে যেখানে একএকটা পাথরের ওজন ছিল দশ টন! আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাছেও যা অসম্ভব, তা কোনো কৌশলে সম্ভব করেছিলেন প্রাচীন মিশরীয়রা? এ এক অমীমাংসিত রহস্য!'

আমি প্রযুক্তিবিদ নই, আমার স্বল্প জ্ঞানের মধ্যে আমি আর কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আগন্তুক বলে উঠল, 'হ্যাঁ, প্রাচীন স্থাপত্য বিদ্যা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরকম অমীমাংসিত আরও কয়েকটা রহস্যের কথা আমিও বলতে পারি। যেমন, পেরুর প্রাচীন ইনকা রাজধানী কুজকোর, সাকসাহুয়ামান দুর্গে বিশাল পাথরের ব্লকগুলোর সংযোগস্থল গলিয়ে জোড়া লাগানো হত কী ভাবে? যে ইনকারা চাকার ব্যবহার পর্যন্ত জানত না, তারা পাথর গলানোর মতো উত্তাপ সৃষ্টি কী ভাবে করত? কী ভাবে মেক্সিকোর বর্বর অ্যাজটেক অধিবাসীরা তাদের নরবলি দেবার বিশাল মন্দিরগুলি এমন নিখুঁত জ্যামিতিক জ্ঞানে আর স্থাপত্য কৌশলে বানিয়ে ছিল যে তাদের স্থাপত্যগুলি ভূমিকম্প নিরোধক! অথবা, মায়া সভ্যতার মানুষরা কীভাবে সৌরমণ্ডলীর গ্রহ নক্ষত্রর নিখুঁত অবস্থান নির্ণয় করে বানিয়েছিল তাদের বিখ্যাত ক্যালেন্ডার? ব্রুনো, গ্যালিলিও ইত্যাদি সভ্য পৃথিবীর মানুষের আগে কীভাবে মায়াজনজাতি জেনেছিল সূর্যকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ তত্ব? কিংবা, ভারতবর্ষের মেহেরৌলির সেই লৌহস্তম্ভ! আধুনিক বিজ্ঞান ইস্পাত তৈরির বহু আগে প্রাচীন ভারতীয়রা কীভাবে সৃষ্টি করেছিল মরিচারোধী লৌহ?' ইস্টার দ্বীপে সার সার হাজার টনের মানুষাকৃতি মূর্তিগুলিকেই বা কীভাবে মাটিতে প্রোথিত করেছিল আদিম মানুষরা?' একটানা কথাগুলি বলে লোকটা হাসল। আমি তার কথা শুনে চমৎকৃত হয়ে বললাম, 'বাঃ,. আপনি এ সব ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন দেখছি! তা আপনি কী ইতিহাসের এ রকম কোনো অমীমাংসিত রহস্যের খোঁজ করছেন এখানে?'

সে জবাব দিল, 'খুঁজতে এসেছি ঠিকই। তবে কী খুঁজছি সেটা আমার জানা।'

আমি বললাম, 'আপনার এ কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

রেক্স নামের লোকটা যেন আমার কথা যেন শুনতেই পেল না। চুপ করে তাকিয়ে রইল সেই স্বচ্ছ পিরামিডের মাথার দিকে।

সূর্য দ্রুত পশ্চিমে হাঁটতে শুরু করেছে। পিরামিডগুলির শীর্ষে তার লাল আভা। লোকটা আর কোনো কথা বলছে না। অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে আছে সে। যেন তন্ময় হয়ে কী ভাবছে। এক সময় মনে হল সম্ভবত সে এবার উঠে দাঁড়াবে। হয়তো তার আর এখানে থাকতে বা আমার সাথে কথা বলতে ভালো লাগছে না। আমি তাকে আরও কিছুক্ষণ যদি ধরে রেখে গল্প করা যায় এই অছিলায় পকেট থেকে সিগারের বাক্সটা বার করে বললাম, 'আপনি একটা সিগার খাবেন?'

রেক্স এবার আমার দিকে ফিরে তাকাল, আর তারপরই আমার হাতের দিকে তাকিয়েই তার দৃষ্টি কেমন পালটে গেল। আমি সিগারের বাক্সটা খুলতে যেতেই পার মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। সিগারের বাক্স এটা নয়, বেখেয়ালে পকেট হাতড়ে সেই সবুজ ধাতব চাকতিটা বার করে ফেলেছি! ভুলটা বুঝতে পেরে আমি আবার সেটা পকেটে রাখতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই বিস্মিত কণ্ঠে রেক্স বলে উঠল, 'ওটা আপনি পেলেন কোথায়? সারা সকাল পিরামিডের ভিতর ওটাইতো খুঁজেছি আমি। যে কুলুঙ্গিতে ওটা থাকার কথা ছিল সেখানে খুঁজে পাইনি। আপনি কোথায় পেলেন ওটা?'

আমিও একটু বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, 'এটা কী দুর্মূল্য কিছু? আমার লোকেরা আজ সকালে কূপের থেকে পাথরের টুকরোর সঙ্গে এটা তুলে এনেছে। আমিতো বুঝতেই পারছি না এটা কী?'

লোকটা আমার হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চোখের তারা।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম ; কী এটা?'

সে এবার অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'এটা হল, 'দেবতার চাবি।'

'দেবতার চাবি মানে?' জানতে চাইলাম আমি।

রেক্স জিনিসটা দেখতে দেখতে জবাব দিল, 'এর অর্থ আপনি ঠিক বুঝবেন না। আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। এ জিনিসটা আমাকে দিতে হবে। আজই এখানকার কাজ শেষ হয়ে যাবে আমার। এটা নিয়ে আজ রাতে আমি প্রবেশ করব পিরামিডের অভ্যন্তরে। এই চাকতিটা আপনার কোনো কাজে

আসবে না। কিন্তু আমার কাছে এটা অনেক দামি।' তার কথা শুনে আমি কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললাম। 'ঠিক আছে, আপনাকে এটা আমি দিতে পারি। কিন্তু একটা শর্ত আছে। আপনার অভিযানের সঙ্গী হতে চাই আমি। তবে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। পিরামিডের অভ্যন্তরে ধনরত্ন বা ওই জাতীয় কিছু পেলে, তাতে ভাগ বসাব না আমি। আমি শুধু দেখতে চাই আপনি এই চাকতিটা দিয়ে কী করেন?'

আমার প্রস্তাব শুনে কিছুক্ষণ কী যে ভাবল লোকটা। তারপর হেসে বলল, 'ঠিক আছে, চাকতিটা যখন আপনি খুঁজে পেয়েছেন তখন এ দাবি আপনি করতেই পারেন। এটা এখন আপনি আপনার কাছে রাখুন। মাঝ রাতে আমি আসব আপনার কাছে। আপনাকে নিয়ে যেতে?'—এই বলে জিনিসটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে লোকটা হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ঢ্যাঙা দেহটা অদৃশ্য হয়ে গেল পিরামিডগুলির আড়ালে।

সে চলে যাবার পর আমি চাকতিটা বেশ কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পরও তার মর্মোদ্ধার করতে পারলাম মা। এরপরই সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকার নামল মরুভূমিতে। ঠান্ডাও নামতে শুরু হল। মরুভূমির এই নিয়ম, দিনে যত গরম, রাতে তত ঠান্ডা। তাঁবুর বাইরে বসে আমি চিন্তা করতে লাগলাম। এই অদ্ভুত আগন্তুকের কথা। কীসের খোঁজে লোকটা প্রবেশ করতে চলেছে পিরামিডের অভ্যন্তরে? ধনরত্ন-টাকাকড়ি নাকি কোনো ফারাওর লুকানো মমির সন্ধানে? বেশ অনেকক্ষণ তার কথা ভাবার পর আমি তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করলাম খাওয়া সেরে আমার সম্ভাব্য নৈশ অভিযানের প্রস্তুতির জন্য।

3

রাত ঠিক বারোটাতে সেই দীর্ঘ ছায়া আবার এসে পড়ল আমার তাঁবুর দরজায়। প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম। লোকটার পরনে সর্বাঙ্গ ঢাকা সেই একই পোশাক তবে তার সঙ্গে এবার একটা ছোটো মতো ধাতব বাক্স আছে। চাঁদের আলোতে বেশ রহস্যময় দেখাচ্ছে তাকে। সে বলল, 'আপনি তৈরি?' আর চাকতিটা সঙ্গে আছে তো?'

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই সে ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলে বালির ওপর লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল। চাঁদের আলোতে উদ্ভাসিত চারদিকে অনেকদূর পর্যন্ত দৃশ্যমান। চাঁদ যেন আজ হাসছে। তার আলোতে দাঁড়িয়ে আছে সহস্র বছরের প্রাচীন সারসার পিরামিডগুলি। নুবিয়ান মরুভূমির মেঘমুক্ত আকাশে অগুনতি নক্ষত্ররাজি ঝিকমিক করছে। যেন কেউ এক রাশ হিরের কুঁচি ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশে। আমি লোকটার উদ্দেশ্যে বললাম, 'আকাশটা কী সুন্দর তাই না? যখন আকাশের দিকে তাকাই তখন নিজেকে, এই পৃথিবীকে কত ক্ষুদ্র মনে হয়। কত অসীম এই মহাকাশ। কত অপার রহস্য লুকিয়ে আছে তার বুকে।' আমার কথা শুনে চলতে চলতে লোকটা হাসল মনে হয়। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। যে ছায়াপথের মধ্যে পৃথিবীর অবস্থান সেই ছায়াপথে তারার সংখ্যা অন্তত দুশো কোটি। আর সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বলতে যা বোঝায় তাতে নক্ষত্রপুঞ্জের সংখ্যা দশ লক্ষ কোটি। আর গ্রহগুলি আবর্তিত হয় নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে। পৃথিবী থেকে মাত্র 'ছ' আলোকবর্ষ দূরে বার্নাড নক্ষত্ররও দুটো গ্রহ আছে। এই হিসাবে গ্রহর সংখ্যা নির্ণয় করতে হলে তাতে পৃথিবীর অবস্থান এই বালুকাময় প্রান্তরের একটা বালুকণার মতোই অতি নগণ্য। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের জানার পরিধিতো আরও নগণ্য।'

তার কথা শুনে চমৎকৃত হয়ে আমি মন্তব্য করলাম, 'আপনার অনেক বিষয়ে বেশ জানা আছে দেখছি!'

সে আমার কথায় কোনো মন্তব্য করল না। বাদ বাকি পথ নিশ্চুপ ভাবে অতিক্রম করে এক সময় আমাকে নিয়ে উপস্থিত হল সেই পিরামিডের সামনে। যার শীর্ষদেশ বিকালের সূর্যালোকে স্বচ্ছ বলে মনে হচ্ছিল। মরু উপজাতিরা যাকে বলে দেবতার কবর? পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার আগের মুহূর্তের জন্য একবার থামল লোকটা। আমার উদ্দেশ্যে বলল, 'আপনার ভয় করছে নাতো? আজ রাতে এত বিরল অভিজ্ঞতার সাক্ষী হবেন আপনি।'

আমরা প্রবেশ করলাম পিরামিডের অভ্যন্তরে। একটা বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বালাল লোকটা। অন্ধকার পাথুরে সুঁড়ি পথ বেয়ে প্রথমে নীচের দিকে নামতে শুরু করলাম আমরা। বহু শতাব্দী সম্ভবত এখানে মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। শত শত বছরের জমাট ধুলো, মাকড়শার জাল সরিয়ে একের পর এক সংকীর্ণ অলিন্দ, সুঁড়িপথ ভাঙতে লাগলাম। মাঝে মাঝে আমাদের হাতের স্পর্শে খসে যাচ্ছে দেওয়ালের ধুলোর স্তর। তার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে প্রাচীন মিশরীয় দেবতাদের নানা চিত্র। অনুবিস, হ্যাথোর, খুনম, ওসিরিস ইত্যাদি নানা দেবতার প্রতিমূর্তি। টর্চের আলোতে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিচ্ছে তাদের দেহের সোনালি অলংকরণ। লোকটা কোনো কথা বলছে না। শুধু সে এগিয়ে চলছে। সে যে ভাবে এগিয়ে চলছে তাতে মনে হচ্ছে এ পথ যেন তার নখদর্পণে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন অন্ধকার সুঁড়ি পথ বেরিয়ে গেছে বিভিন্ন দিকে। তার মধ্যে পথ নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে যেন এগোচ্ছে সে।

আমি চলতে চলতে তাকে প্রশ্ন করলাম, 'এখানে কি এর আগে এসেছিলেন?'

সে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, অনেক অনেক দিন আগে। যখন আমরা...।' কথাটা শেষ করল না রেক্স।

পিরামিডের গোলকধাঁধা অতিক্রম করে এক সময় এসে উপস্থিত হলাম ভূগর্ভস্থ এক কক্ষে। তার চারপাশে নিরেট পাথুরে দেওয়াল। আমি বললাম, পথতো শেষ হয়ে গেল। এবার কোন দিকে যাবেন?'

সে জবাব দিল, 'না পথ শেষ হয়নি। বলতে গেলে পথ শুরু হল এবার। পথ এবাব করে নেব আমরা।'

আমাকে নিয়ে একটা দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা, তারপর হাতের বাক্সট খুলল। ওমনি একটা বিপ বিপ শব্দ করে বাক্সর ভিতর কয়েকটা লাল নীল আলো জ্বলে উঠল। একটা 'কি-বোর্ড' আর বেশ কয়েকটা সুইচও রয়েছে তার মধ্যে। বাক্সটা যে একটা যন্ত্র তা বুঝতে অসুবিধা হল না আমার। বাক্সর আলোগুলি জ্বলে ওঠার পর লোকটা আঙুল ছোঁয়ালো কি-বোর্ডে। আর ওমনি নীল রঙের একটা আলোকরশ্মি বাক্সর থেকে নির্গত হয়ে একবার চক্রাকারে আবর্তিত হল দেওয়ালের একটা অংশে? আর কী আশ্চর্য। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের দেওয়ালের ওই অংশটা খসে পড়ল। ঠিক কেউ যেন ছুরি দিয়ে মাখনের দেওয়াল থেকে একটা বৃত্তিকার অংশ কেটে নিল! ঘটনাটা দেখে আমি অবাক হয়ে বললাম, 'নীল আলোটা কী কোনো লেসার রশ্মি?'

সে জবাব দিল, 'তা বলতে পারেন। তবে এ তরঙ্গ রশ্মির ক্ষমতা তার চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশি।'

কাজ শেষ হবার পর আবার বাক্সটা বন্ধ করল লোকটা। তারপর দেওয়ালের সেই ফোকড় গোলে আমাকে নিয়ে প্রবেশ করল ওপাশে। সামনেই এক সিঁড়ি উঠে গেছে। আমরা সেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম।

ওপরে ওঠার যেন বিরাম নেই। মাথার ওপর ঢালু ছাদ। দু-পাশের দেওয়াল বহু বর্ণে চিত্রিত। কত রকমের জিনিস চিত্রিত আছে সেখানে। সে সব কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে লোকটা আমাকে নিয়ে কেবল ওপরে উঠেই চলল। মাঝে মাঝে শুধু আমি যখন হাঁফ নেবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম, তখন মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াচ্ছিল। বেশ অনেকক্ষণ ধরে ওপরে ওঠার পর অবশেষে আমরা থামলাম। আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে খোদিত আছে আকাশদেব হোরাসের বিশাল এক ছবি। রেক্স দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'আমরা পৌঁছে গেছি।' তার কণ্ঠস্বরে একট চাপা উত্তেজনা।

আমি বললাম, 'কোথায় পৌঁছেছি? এ দেওয়ালটাও লেসার বিম দিয়ে ভাঙবেন নাকি?'

সে বলল, 'না। এই দেওয়াল ধাতব। কোনো লেসার বিম দিয়ে এ ধাতুকে ভাঙা বা কাটা যাবে না। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমাও এ দেওয়াল ভাঙতে পারবে না। দিন, এবার আমাকে ওই চাবিটা দিন। ওটা ছাড়া এ দেওয়াল কেউ খুলতে পারবে না।'

আমি পকেট থেকে সেই চাকতিটা বার করে তার হাতে দিলাম। লোকটা চাবিটা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল দেওয়ালে খোদিত হোরাস মূর্তির সামনে। টর্চের আলোতে আমার এবার মনে হল, চাকতিটা আর দেওয়ালটা যেন একই ধাতুর তৈরি। দেওয়ালের গায়েও একটা সবুজ ছটা আছে। হোরাস দেবের বুকের কাছে একটা

খাঁজ কাটা জায়গা আছে। রেক্স চাকতিটা সেখানে বসাতেই খুব সুন্দরভাবে চাকতির দাঁতগুলি দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে বসে গেল। তারপর কম্বিনেশন লক যে ভাবে খোলা হয় রেক্স সে ভাবে দেওয়ালের খাঁজে ঘোরাতে লাগল সেটা! তাহলে চাকতিটা আসলে সত্যিই একটা চাবি!!

চাকতিটা ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ একটা ধাতব শব্দ হল, আর তার পরই আকাশদেব দু-পাশে ভাগ হয়ে গেলেন। খুলে গেল একটা ছোট্ট ধাতব দরজা। রেক্স চাবিটা খুলে নিয়ে ইশারায় আমাকে অনুসরণ করতে বলল।

তার পিছনে দরজার ওপাশে প্রবেশ করলাম আমি। একটা ত্রিভুজাকৃতির ঘর। একটা হালকা আলোয় ঘরে আছে ঘরটা। ঘরের চারপাশে তাকাতেই চমকে উঠলাম। ঘরটা যেন একটা এরোপ্লেনের ককপিট। নানা ধরনের বৈদ্যুতিক আধুনিক প্যানেল-যন্ত্রপাতি বসানো আছে ঘরটাতে। আর ঘরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে সেই সবুজাভ ধাতুর তৈরি বিরাট এক শবাধারের মতো বাক্স। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এ কোন জায়গাতে এলাম আমরা?'

রেক্স বলল, 'দেওয়ালের কাছে যান, বুঝতে পারবেন।'

তার কথা শুনে দেওয়ালের কাছে যেতেই চমকে উঠলাম। অনেক ওপর থেকে বাইরের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! চন্দ্রালোকিত মরুভূমি, আশেপাশের পিরামিড, মায় আমার তাঁবু পর্যন্ত! আকাশের চাঁদটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এ ঘরের আলোটা আসলে চাঁদেরই আলো!

রেক্স এবার বলল, 'আপনি যে পিরামিডের মাথাটা অ্যালাবাস্টারের তৈরি ভেবেছিলে সেটা আসলে বিশেষ ধরনের ক্রিস্টালের তৈরি। যে প্রয়োজনে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ দুই হতে পারে। এ এক কঠিনতম অ-ভঙ্গুর ক্রিস্টাল। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি সেই পিরামিডের শীর্ষদেশে'। কথাগুলি বলতে বলতে লোকটা গিয়ে উপস্থিত হল ঘরের মাঝে রাখা বাক্সর সামনে। তারপর তন্ময় হয়ে. তাকিয়ে রইল বাক্সটার দিকে। বাক্সর গায়েও খোদিত

আছে একটা ডানা অলা হোরাস দেবের ছবি। তার বুকের কাছেও চাবি বসানোর খাঁজ। তার পিছনে আমি গিয়ে দাঁড়ালাম। তার পর বললাম, 'এ বাক্সতে কী রাখা আছে?'

রেক্স বলল, 'দেখাব আপনাকে। এই বাক্সটার জন্যই তো আমার অতদূর থেকে এখানে আসা।' এই বলে সে চাবিটা বাক্সর গায়ে লাগিয়ে ধীরে ধীরে ঘোরাতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধান মাত্র। তারপরই ডালাটা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা হিমেল স্রোত যেন ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। আমার হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠল তাতে। বাক্সর মধ্যে একটা শীতল কুয়াশার আবরণ ছিল সেটা সরে যেতেই রেক্সের সাথে আমিও ঝুঁকে পড়লাম বাক্সর ওপর। আর তার পরই হতবাক হয়ে গেলাম আমি। বাক্সর ভিতর একটা স্বচ্ছ ক্রিস্টালের আধারে শুয়ে আছে একজন। না, এ কোনো ন্যাকড়া জড়ানো, পোকায় কাটা, মাংসহীন হাড় সর্বস্ব মিশরীয় মমি নয়। যেন একজন সর্বাঙ্গ সুন্দর ঘুমন্ত মানুষ। তবে মানুষের সাথে তার একটা পার্থক্য আছে। তার কাঁধের দু-পাশ থেকে নেমে এসেছে সোনালি রঙের দুটো ডানা!! ডানা অলা মানুষ???

এত বিস্মিত আমি জীবনে কোনো দিন হইনি। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে আমি বলে উঠলাম, 'এ কে?'

রেক্স শান্ত স্বরে বলল, 'এ হল তাদেরই একজন, যারা সভ্যতার উষা লগ্নে ছায়াপথ অতিক্রম করে নেমে এসে ছিল পৃথিবীর মাটিতে। পৃথিবীর স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে যারা প্রথম শিখিয়েছিল বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মহাকাশবিদ্যা। মানুষের চেয়ে অনেক বুদ্ধিসম্পন্ন যারা মানুষকে সাহায্য করেছিল গিজার পিরামিড, অ্যাজটেক মন্দির গড়তে, শিখিয়ে ছিল কী ভাবে তৈরি করতে হয় মায়া ক্যালেন্ডার অথবা মরিচাহীন ইস্পাত। ইতিহাসের আপনার সেই অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তরগুলি যাদের জানা ছিল, বিভিন্ন সভ্যতার পৌরাণিক গাথায় যাদের বর্ণনা করা হয়েছিল 'দেবতা' বলে, এ তাদেরই একজন। পৃথিবীতে কাজ শেষে আবার যদি পৃথিবীর কোনো প্রয়োজন হয়—এই ভেবে হিমায়িত অবস্থায় ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যাওয়া হয়েছে ওকে। পাঁচ হাজার বছর ধরে ঘুমচ্ছে ও। এবার ওর ফিরে যাবার সময় হয়েছে।'

রেক্সের কথা শুনে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। আমার মাথার ভিতরটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। ক্রিস্টালের ঘরের ভেতর শৈতপ্রবাহ ক্রমশই যেন বেড়ে চলছে। আর সহ্য করা যাচ্ছে না ঠান্ডা। রেক্স এক সময় বলল, 'চলুন এবার আপনাকে নীচে নামাই।' রেক্সের পিছন পিছন তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো নীচে নামতে শুরু করলাম। যে পথে আমরা ওপরে উঠেছিলাম রেক্স কিছুটা সে পথে নেমে রশ্মি দিয়ে পাথর কেটে অন্যপথ বার করে বেশ দ্রুতই বাইরে বার করে আনল আমাকে।

পিরামিডের বাইরে চন্দ্রালোকিত বালু প্রান্তরে আমরা এসে দাঁড়ালাম। মাথার ওপর উন্মুক্ত আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর ঝিকমিকে তারাগুলি যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমাকে নিয়ে কয়েক পা এগোবার পর দাঁড়িয়ে গেল রেক্স। তারপর আমার উদ্দেশ্যে বলল, 'আপনি এবার তাঁবুতে ফিরে যান। পিরামিডের মধ্যে যে ঘুমিয়ে আছে তাকে নিয়ে আমাকে অনেকটা পথ আমাকে পাড়ি দিতে হবে। আর আমাদের সাক্ষাতের স্মৃতি হিসাবে আপনি এটা রেখে দিন।' এই বলে সে তার পোশাকের ভিতর থেকে বলের মতো একটা সবুজাভ ধাতুপিণ্ড বার করে তুলে দিল আমার হাতে। সম্ভবত এই ধাতু দিয়েই তৈরি সেই দেবতার চাবি। এরপর সে মৃদু হেসে বলল, 'তাহলে চলি বন্ধু। আর আপনার সঙ্গীরা ফিরে এলে তাদের বলবেন, এখানে আর উল্কাপাত হবে না। আপনাকে বলি, ওটা আসলে উল্কা ছিল না।' এই বলে পিছনে ফিরতে যাচ্ছিল রেক্স। আমি তার উদ্দেশ্যে বললাম, 'একটু দাঁড়ান। আপনার সঠিক পরিচয়টা? কোথায় ফিরে যাবেন আপনি?'

রেক্স থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আমার কথা শুনে। আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সে খসিয়ে ফেলল দেহের আলখাল্লা। আমি দেখলাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক সুন্দর পুরুষ। আর তার কাঁধ থেকে নেমে এসেছে দুটো সোনালি ডানা! ঠিক সেই পিরামিডের কফিনে শায়িত মানুষটার মতো! চাঁদের আলোতে ঝলমল করছে সেই দুটো পাখা! টি-রেক্স এরপর একবার মৃদু হাসল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, তারপর বিদায়ের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে এগোল পিরামিডের দিকে।

আমি ফিরে এলাম আমার তাঁবুর কাছে। বিস্ময়ের ঘোরে তখন আচ্ছন্ন আমি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি খেয়াল করলাম যে পিরামিডে আমি গেছিলাম তার শীর্ষদেশে নানা রঙের আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। একটা সার্চ লাইটের মতো ঘুর্ণায়মান তীব্র আলো ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। সে আলো আমাকে, আমার তাঁবুকেও স্পর্শ করছে। এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পিরামিডের মাথাটা হঠাৎ সোনালি আলোতে ভরে উঠল। আর তার পরমুহূর্তের পিরামিডের উজ্জ্বল আভা যুক্ত মাথাটা ছিটকে আকাশে উঠে গেল। আমার পায়ের নীচের মাটি থরথর করে কেঁপে উঠল। একটা হিসহিস শব্দ করে সেই সোনালি ত্রিভুজ একবার পাক খেল মরুভূমির আকাশে, তারপর উল্কার গতিতে ধাবিত হল মহাশূন্যের দিকে। টি-রেক্স তার সঙ্গীকে নিয়ে যাত্রা করল হয়তো অন্য কোনো ছায়াপথে নিজেদের বাসস্থানে অথবা অন্য কোনো গ্রহে—যেখানকার অধিবাসীদের হয়তো উন্নত করে তুলবে তারা। আকাশের লক্ষ তারার মাঝে ক্রমশ অপসৃয়মান একটা আলোক বিন্দুর দিকে হাত নেড়ে আমি বললাম, 'বিদায় বন্ধু।'

পুনশ্চ !—সপ্তাহ খানেক পর 'সুদান ক্রনিকালে' একটা খবর ছাপা হয়েছিল,—'শ্রীনিবাসন নামে এক ভারতীয় জিয়োলজিস্ট স্থানীয় এক সংস্থার হয়ে নুবিয়ান মরুভূমিতে ভূতাত্ত্বিক গবেষণার কাজে গিয়ে একটা কূপের মধ্যে একটা ধাতবপিণ্ড কুড়িয়ে পান। সেই ধাতবপিণ্ড তিনি পদার্থ বিজ্ঞানীদের কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠালে তারা জানাচ্ছেন যে পৃথিবীর পরিচিত কোনো ধাতবখণ্ডর সাথে তার কোনো মিল নেই। আধুনিক বিজ্ঞান কোনোভাবেই অজানা মৌলে তৈরি এই ধাতুখণ্ডকে ভেদন বা ছেদন করতে পারছে না। যে দিন ওই ধাতুখণ্ডটি উদ্ধার হয় তার আগের দিন ওই অঞ্চলে উল্কাপাত হয়। বিজ্ঞানীদের একাংশের ধারণা ওই উল্কার সাথেই বহির্বিশ্বের কোনো স্থান থেকে ধাতুখণ্ডটি পৃথিবীতে এসে পড়তে পারে। যিনি ওই ধাতব বলটি পেয়েছেন তাঁর ইচ্ছানুসারে বিজ্ঞানীরা ওই অজানা ধাতুর নামকরণ করেছেন, —'টি-রেক্স'। যদিও এই অদ্ভুত নামকরণ কেন তা আমাদের জানা নেই। ইত্যাদি, ইত্যাদি...।'

শুধুই কি দুর্ঘটনা?

সমরজিৎ কর

দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের গৌরিবিদানুর যেন বড়োই নির্জন। উতকামন্ড। সেখানে থেকে পাহাড়ের খাড়াই উৎরাই দিয়ে একটানা পথ। মাঝে মাঝে দু-চারটে ঘর নিয়ে এক একটি বসতি। কোথাও বা ঝরনা। পাহাড়ের গায়ে কফি বাগিচা। কোথাও গভীর অরণ্য। এরই ফাঁকে গৌরবাদানুরের এই এলাকাটা একটা খাদের মতো। চারিদিকে পাহাড়। তাদের মাঝখানে খাদ।

বলতে পার, বনবাস। সত্যিই বনবাস। এখানে যারা বাস করেন, কয়েকজন বিজ্ঞানী এবং তাঁদের সহকর্মী-গোড়ায় এখানকার সৌন্দর্য দেখে সবাই তারা অভিভূতই হয়েছিলেন। তারপর কয়েকটা দিন যেতেই কেমন একটা বিমর্ষভাব। এক প্রান্তে কয়েকটি ঘর। তাদের মধ্যে একটিতে এক দঙ্গল কমপিউটার। বাইরে ভূকম্পন মাপার যন্ত্র। কমপিউটারের সাহায্যে ভূকম্পন মাপা—এই তো কাজ। পৃথিবী নামক বিরাট গোলকটি দুরন্ত বেগে সূর্যের চারপাশ পরিক্রমণ করছে। আর গতিশীল যে বস্তু সে তো কাঁপবেই। সেই কম্পন সমানে লিপিবদ্ধ হচ্ছে ছক আঁকা কাগজের ওপর। একটানা দেখতে দেখতে পাগল হওয়ার মতো অবস্থা।

আর এক প্রান্তে সেই রেডিয়ো টেলিসকোপটা। ধাতব রড এবং পাত দিয়ে তৈরি—যেন একটি নৌকো। এক কিলোমিটার লম্বা। অনুচ্চ খাড়াই এর ওপর, একটি গবেষণাগার। সেখানেও পাগল করার মতো নির্জনতা। শুধু দেখে যাও, দূর মহাকাশে কী ঘটছে। টেলিসকোপে কোনো নিউট্রন নক্ষত্র, রেডিয়ো তরঙ্গের উৎস, অথবা অন্যকিছু ধরা পড়ে কিনা তার জন্যে অপেক্ষা করা। সেই পর্যবেক্ষণের কাজে কোনো বিরতি নেই। পুরো ব্যাপারটাই মাঝে মাঝে বড়ো একঘেয়ে মনে হয়। ফলে এখানকার যারা কর্মী, তাঁদের চিন্তাধারা এবং চালচলন মাঝে মাঝে বড়ো ঢিলে হয়ে পড়ে।

এই ভাবেই চলছিল। বলতে পার, যাকে বলে নিস্তরঙ্গ জীবন। কিন্তু হঠাৎ, কোনো কিছু অনুমান করার আগেই এমন একটি ঘটনা ঘটল কেউ ভাবতেই পারেনি।

ভূকম্পনজ্ঞাপক পরীক্ষাগারটি লম্বায় কুড়ি ফুট, চওড়ায় পনেরো ফুট। চারদিকে কাচে ঢাকা জানালা। মে মাস বাইরে যথেষ্ট গরম। ভেতরটা শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকায় খুবই আরামপ্রদ ছিল দিনটা রবিবার। দু-জন পর্যবেক্ষক বিজ্ঞানী ছাড়া সবাই বাসায়। সন্ধে সবে গড়িয়েছে। পরিষ্কার আকাশ। তার গায়ে তারাগুলি জ্বল জ্বল করছে। চাঁদ নেই। তাই অরণ্যের ওপর নেমে এসেছে অন্ধকারের পুরু চাদর।

পর্যবেক্ষক বিজ্ঞানী বলতে রাঘবন এবং অশোক মিত্র। তাদের হাতে কফির পেয়ালা। সময়—আলোর প্রচণ্ড ঝলসানি। তারপর অদূরে, তা সাত-আট কিলোমিটার দূরে হবে, প্রচণ্ড শব্দ। পরমুহূর্তে ভূকম্পন যন্ত্রের কমপিউটারটি চঞ্চল হয়ে উঠল। যার মানে প্রচণ্ড ভূকম্পন ঘটল।

রাঘবন এবং অশোক এক লাফে গিয়ে দাঁড়াল লেখচিত্রের সামনে।—

কী কাণ্ড! বলল রাঘবন।

একেবারে দশ রিখটার! যেন ভিরমি খেল অশোক। কারণ এ ধরনের অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম ঘটল।

একই সময় গৌরিবাদানূরের রেডিয়ো টেলিসকোপের পর্যবেক্ষণ কক্ষেও তখন রীতিমতো নাটক। এই ঘরটির পুরোটাই মাটির নীচে। অতএব বাইরে কি হচ্ছে, সেটা কারোরই দেখার কথা নয়। রেডিয়ো অ্যাস্ট্রনমার ড. চিদাম্বরম তাঁর সহকারী নিগাভেজরকে নিয়ে সাইরাস নক্ষত্র বরাবর একটি রেডিও নক্ষত্রের ওপর পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ—

অদ্ভুত ব্যাপার। স্ট্রিং রেডিয়ো নয়েজ। কম্পিউটারের দিকে চাইতেই চোখ। যেন ছানাবড়া হয়ে উঠল ড. চিদাম্বরমের। —কী হচ্ছে, দেখ তো? পাশে অঙ্ক কষছিলেন নিগাভেজর। তাঁর ডাকে তিনি কম্পিউটারের ভিশন প্লেটটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তারপর মুহূর্তের জন্যে হতবাক অবস্থায় থাকার পর তাঁর মুখে একটা শব্দই উচ্চারিত হল—'আশ্চর্য!'

ঝানু পর্যবেক্ষক ড. চিদাম্বরমের বুঝতে অসুবিধা হল না, তাঁদের অতিকায় রেডিয়ো টেলিসকোপে বিচিত্র বেতার সংকেত ধরা পড়েছে। সেই সংকেত যে সুদূর কোনো নক্ষত্রের নয়, সে সম্পর্কে কখনোই তিনি ভুল করতে পারেন না।

কিন্তু এর পর যা ঘটল তা আরও অবাক করার মতো। নিয়ম মতো ভূমিকম্পের খবরটা পাঠিয়ে দিলেন দিল্লির কেন্দ্রীয় দপ্তরে। জানালেন, 'ভূকম্পনের মাত্রা খুবই মারাত্মক। তার উৎপত্তিস্থলটি আমরা ধরতে পারছি না। অদ্ভুত ব্যাপার, এখানে কোনো ক্ষয় ক্ষতিও হয়নি।

মিনিট পনের পর দিল্লির অফিস থেকে টেলিফোনট করেছেন দপ্তরের খোদ কর্তা ড. বিশ্বনাথন। 'হ্যালো!' ফোন ধরলেন অশোক।

'কী ব্যাপার, অশোক? দশ রিখটার স্কেলে যদি ভূকম্পন হয়, তাঁর মানে কী দাঁড়ায় জান? এতক্ষণে তোমরা তো পাথরের গর্তে তলিয়ে যেতে? অ্যাবসার্ড এমন প্রচণ্ড কম্পন, অথচ কোথাও কিছু হল না। একটা কুটির ভাঙার খবরও তো আমি পেলাম না। পাগল হলে নাকি তোমরা?' ড. বিশ্বনাথন যে খুবই বিরক্ত হয়েছেন, তাঁর কণ্ঠস্বরেই তা বোঝা গেল।

'আমাদের যন্ত্র ঠিকই আছে, ড. বিশ্বনাথন। ভুল আমাদের হয়নি।'

কিন্তু কথা শেষ না হতেই রেডিয়ো টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

রাঘবন এবং অশোক তো হতভম্ব।

তার পরক্ষণেই আর একটা টেলিফোন কল।

'হ্যালো? অশোক মিত্র হিয়ার?' রিসিভারটি তুলে নিয় কথা বললেন অশোক।

'একটা অনুরোধ। ভূমিকম্পের খবরটা আপাতত চেপে যান। বিষয়টি জরুরি।' ওপার থেকে কে কথা বলল। এবং এইটুকুই। তারপর টেলিফোনের সংযোগ কেটে গেল।

ওদিকে রেডিয়ো টেলিসকোপের তথ্যকেন্দ্রে তখন দারুণ উত্তেজনা। এই মাত্র পাওয়া রেডিয়ো সংকেতগুলি বিশ্লেষণ করে ড. চিদাম্বরম বুঝতে পারলেন, ঘটনাটি আশপাশেই ঘটেছে। কম্পিউটারের ভিশন প্লেটে ভেসে উঠেছে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ। তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে। বলতে কী এ ধরনের অভিজ্ঞতা এর আগে তাঁর কখনো হয়নি।

এ ক্ষেত্রেও অবাক কাণ্ড! ড. চিদাম্বরম খবরটা পাঠালেন বোম্বাই-এর জিওম্যাগনেটিক রিসার্চ ইনসটিটিউটের ডিরেক্টর ড. অরিজিৎ সরকারের কাছে। ভেবেছিলেন, খবরটা পেয়ে ড. সরকার বেশ অবাকই হবেন। আশ্চর্য! অবাক হওয়া তো দূরের কথা। বরং তিনি যেন জ্বলন্ত আগুনের উপর এক বালতি ঠান্ডা জল ঢেলে দিলেন। জানালেন : 'ব্যাপারটা আমরা জানি ড. চিদাম্বরম। বরং আমিই এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আপনার ফোন এল। যাই হোক, আমরা পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আপাতত এ নিয়ে কারোর সঙ্গে আর কথা বলবেন না।'

হাতের গ্রাহক যন্ত্রটি ক্র্যাডেলের ওপর নামিয়ে রেখে একেবারে পাথর হয়ে বসে পড়লেন ড. চিদাম্বরম। সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

ড. নিগাভেজার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কী মনে হয়, ড. চিদাম্বরম?'

'একটা ধাঁধা ছাড়া কিছুই না।' বললেন, ড. চিদাম্বরম।

এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। ভূকম্পন কেন্দ্র এবং রেডিয়ো টেলিসকোপের মানমন্দিরে সে রাতে কেউ আর ঘুমতে পারলেন না। সবাই বুঝতে পারলেন, যা ঘটেছে তার প্রচলিত চিন্তাভাবনায় ব্যাখ্যা চলে না।

২

ব্যাপারটা যে এই ভাবে একেবারে নাগালের বাইরে চলে যাবে সে কথা কল্পনাও করতে পারেননি ড. জেমস অ্যান্ডার্সন। দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের এই যে দ্বীপটি, আয়তনে এতই অকিঞ্চিৎকর যে মানচিত্রে কোনো স্থানই পায়নি। দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে প্রায় এক মাইল। কুমারিকা অন্তঃরীপ থেকে কত দূরত্ব? তা হাজার দুই মাইল হবে। মাঝে মাঝে কিছু ঝোপ-ঝাড়। বেশির ভাগই ফার্ন জাতীয় গাছ।

মনুষ্য সভ্যতা থেকে বহু দূরে নির্জন এই দ্বীপে গত তিন বছর ধরে বিচিত্র এক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মগ্ন ছিলেন জেমস অ্যান্ডার্সন। জন দশেক সহকারী নিয়ে শুরু হয়েছিল গবেষণা। কাজ কর্ম চলছিল খুব গোপনে। বাইরে থেকে তাঁদের সাহায্য করছিলেন তিন জন—ড. বাসু, জাভিয়ের সাইমন, এবং ড. করডিনি। এঁদের মধ্যে ড. বাসুই প্রবীণ। জাভিয়ের মেকসিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞানের, করডিনি অধ্যাপনা করেন মিলান বিশ্ববিদ্যালয়ে, ধাতুবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর প্রচুর নাম ডাক।

বছর পাঁচ আগে এক খণ্ড উল্কাপিণ্ড পেয়েছিলেন কর্ডিনি। তাতে তিনি এমন এক ধরনের মৌলিক পদার্থের সন্ধান পান যা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়নি। জেমস তখন বার্জলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরমাণু বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছেন, আন্তর্জাতিক একটি সম্মেলনে যোগ দিতে ড. বাসু, জেভিয়ের এবং তিনি এসেছিলেন মিলানে। ওই সময় উল্কার ব্যাপারটা তাদের বলেন কর্ডিনি শুধু এলেই ক্ষ্যান্ত হননি, উল্কা পিণ্ডটি তাঁদের দেখান।

'গুড গুড। এ যে সুপার হেভি!' প্রথম দেখাতেই বুঝতে পেরেছিলেন ড. বাসু,—'করডিনি, আমার অনুরোধ এ নিয়ে আপনি হইচই করবেন না। ব্যাপারটা চেপে যান।' বলেছিলেন তিনি। তারপর সেদিনই পুরো পরিকল্পনাটির ছক করে ফেলেন তিনি। ঠিক হয় যা কিছু করণীয় জেমসই করবেন। দূর থেকে মতলব দিয়ে তাঁকে সাহায্য করবেন ড. বাসু কারডিনি এবং জেভিয়ের।

ড. বাসুর পরিকল্পনাটি শুনে সবাই, বিস্মিত হন, তাঁরা বুঝতে পারেন, তাঁর পরিকল্পনা যদি সফল হয় মানুষ কোনো দিন যা ভাবতে পারেনি, পৃথিবীতে সেটাই ঘটবে।

'কিন্তু এ কাজে তো প্রচুর অর্থ দরকার?' প্রশ্ন করেছিলেন জেমস।

'হবে, সব হবে, জেমস!' তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন ড. বাসু।

এর পর সব কিছুই ঘটল দ্রুত লয়ে, প্রচুর অর্থ এল, গবেষণার যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, উভযান বিমান। সবই যোগালেন ড. বাসুর তিন মার্কিন শিল্পপতি বন্ধু। বছর দুই ঘুরতেই গবেষণায় পাওয়া গেল অসামান্য সাফল্য। আর তারপর থেকেই শুরু হল জটিলতা।

৩

এপ্রিলের গোড়ায় সোভিয়েত দেশের একটি স্পাই উপগ্রহ বেশ নির্দেশ মতোই আকাশ-পথে পরিক্রমণ করছিল আতলান্তিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে। বৈকানুর মহাকাশ স্টেশনের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে বসে তার ওপর নজর রাখছিলেন দ্রিমিত্রি কাজিরেং, তার সামনে কম্পিউটার যন্ত্রগুলি সচল। ভিশান প্লেটের ওপর ভেসে উঠেছে উপগ্রহটির ছবি, এমন সময় ব্যাপারটা মুহূর্তেই ঘটে গেল। প্রথমে একটি আলোর ফুলকি, তারপর বিস্ফোরণ, দিমিত্রি দেখলেন, উপগ্রহটি ধবংস হয়ে গেল।

ভয়ে সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল দিমিত্রির। 'স্যাবোটাজ?' নিজের মনেই বলে উঠলেন তিনি। আর তাঁর পরক্ষণেই কানের পাশে বেজে উঠল টেলিফোন 'দি মি ত্রি! কাণ্ডটা কী ঘটল লক্ষ করলে? হায় ভগবান!' কথা বললেন, গুপ্তচর বিভাগের প্রধান মিখাইল পেত্রোভিচ। ক্ষোভে ফেটে পড়লেন যেন তিনি।

'কিছুই তো বুঝতে পারছি না।' শুকনো গলায় জবাব দিলেন দিমিত্রি। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে বৈকানুর থেকে যে খবরটা মস্কোর হেডকোয়ার্টারসে পৌঁছেছে সেটা বুঝতে তাঁর অসুবিধে হল না।

'ইয়াংকিদের কাজ?'

'একটু সবুর করুন, ব্যাপারটা আমি খতিয়ে দেখছি।'

ঘন্টাখানেক কম্পিউটারের সাহায্যে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন দিমিত্রি, এবং শেষ পর্যন্ত....'একেবারে জট কাকে বলে'...বলেই মিখাইলের সঙ্গে টেলি সংযোগ করলেন।

'কী বুঝলে?' জিজ্ঞেস করলেন মিখাইল, তাঁর কণ্ঠে রীতিমতো উদবেগ।

'না। আশেপাশে কোনো মার্কিন উপগ্রহ নেই। আমাদের অন্য একটি উপগ্রহ থেকে ছবি এসেছে। তাতে উপগ্রহটি যেখানে ধবংস হয়েছে, আকাশের সেই অংশে আমরা এক ছোপ মেঘ দেখছি....ঈষৎ হলুদ রঙের। সেখান থেকে কয়েক ঝলক গামা রশ্মি এসেছে, আমাদের গামা রশ্মি ক্যামেরায়।' বললেন দিমিত্রি।

দিমিত্রির এই খবর বিশেষজ্ঞদের পাঠান হল। শুরু হল জল্পনা।

পরবর্তী কয়েক দিনে একই ধরনের আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটল। কয়েকটি সোভিয়েত এবং মার্কিন উপগ্রহ একই ভাবে ধবংস হল। এবং খুঁটিনাটি পরীক্ষা এবং উভয় দেশের বিজ্ঞানীরা পরস্পর কথাবার্তা বলে সিদ্ধান্ত করলেন ! ব্যাপারটা একান্তই নৈসর্গিক ঘটনা। প্রাকৃতিক কোনো কারণেই এমনটি ঘটেছে। কিন্তু কী সেই কারণ, সেটা কেউই ধরতে পারলেন না।

আর ঠিক এই সময়েই পড়ল ড. বাসুর ডাক। একটি আন্তর্জাতিক কমিটি তৈরি হল। কমিটির সদস্যরা ঘটনাটি গোপনে খতিয়ে দেখতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। এর মধ্যে আর কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবু অজ্ঞাত আশঙ্কা কেউ যেন মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না। রহস্যটা যে কী, ধরতেই পারলেন না। এমনকী ড. বাসুর মতো ডাকসাইটের বিজ্ঞানীও না।

৪

কিন্তু অবশেষে বলতে পার, কাকতলীয় ভাবেই যেন ঘটে গেল ব্যাপারটা। এবং তা ধরলেন স্বয়ং ড. বাসু। গত ছয় মাস জেমসের সঙ্গে তিনি কোনো যোগাযোগ রাখতে পারেননি। হঠাৎ জেমসের কাছ থেকে টেলিফোন। তিনি জানাচ্ছেন, পরিকল্পনা মতো সব কাজ ঠিক মতোই চলছে তিনি বুঝতে পেরেছেন, কার্টিনির সেই উল্কাপিণ্ডটি সত্যিই একটি অসাধারণ বস্তু। সেটিকে ভেঙে দশটি টুকরো করেছেন তিনি। ড. বাসুর পরিকল্পনা মতো প্রতিটি টুকরো এক একটি বিশেষ ধরনের পারমাণবিক রিঅ্যাকটারের মধ্যে রাখা হয়। তাদের মধ্যে নয়টি ইতিমধ্যেই রকেটের সাহায্যে মহাকাশে উৎক্ষেপ করেছেন তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের সেই দ্বীপটি থেকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব কটিই মহাকাশে নির্দিষ্ট কক্ষ ছেড়ে কোথায় হারিয়ে গেছে।

ড. বাসু অস্ট্রেলিয়ার উত্তমারোয় রেডিয়ো টেলিসকোপে একটি সুপারনোভার বিস্ফোরণ পর্যবেক্ষণ করছিলেন তখন, যখন জেমসের টেলিফোন বার্তাটি পেলেন, কথা ছিল এখানকার কাজ সেরে তিনিই জেমসের ওখানে যাবেন সেখানকার ব্যাপার দেখতে। বলতে কী, তাঁর ওপর বিরক্তই হয়েছিলেন তিনি। জেমসের এই এক বাজে চরিত্র। নিজের গবেষণার ব্যাপারে মাঝে মাঝে এমন চুপচাপ থাকেন, কাউকে কিছু বলাটা সে দায়িত্ব বলে মনে করেন না। ভাবেন সাফল্য যখন হাতের মুঠোয়, সব কিছুই সেরেই সব কথা প্রকাশ করবেন, এখন নাও তার ঝক্কি সামলাও।

জেমসের কথার ফাঁকেই প্রশ্ন করলেন ড. বাসু, 'কী বললেন? নয়টি টুকরো এর মধ্যে আকাশে পাঠিয়েছেন?'

'ঠিক তাই ড. বাসু।' ওপার থেকে কথা বললেন জেমস।

'এই তা হলে ব্যাপার!' রেগে ফেটে পড়লেন ড. বাসু।

'ভুলচুক কিছু হয়েছে, ড. বাসু?'

'আমার মুণ্ডু হয়েছে। এখন বাকি টুকরোটি নিয়ে কী করছেন, বলুন দেখি?'

'এই মাত্র উৎক্ষেপ করলাম।'

'যাক, ষোল কলা তা হলে পূর্ণ হল।' ড. বাসু ক্ষোভে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

'কিছু বলছেন, ড. বাসু?'

'চটপট আপনার এই শেষ উৎক্ষেপণটির বিবরণ দিন তো?' ড. বাসুর কণ্ঠে আদেশের সুর।

একটা গোলমাল যে হয়েছে, জেমসের বুঝতে সেটা অসুবিধে হল না, মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন পরিবেশে গবেষণার কাজটি নীরবেই চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলেন, তিনি সফল হতে চলেছেন। কিন্তু সে সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় হওয়ার আগে তিনি এ নিয়ে হইচই করতে চাননি। আসলে আত্মপ্রচারের ব্যাপারটা কোনো দিনই তিনি পছন্দ করেন না। অনেক বিজ্ঞানী যৎসামান্য সাফল্যের ইঙ্গিত পেলেই যেমন পৃথিবীময় প্রচারের বেলুন ওড়াতে থাকেন, সে দলে পড়েন না তিনি, তাই এ নিয়ে ড. বাসুর সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ রাখেননি।

ড. বাসুর কথায় সন্ত্রস্ত হলেন জেমস। কী এমন ঘটল?

'ব্যাপার কি, ড. বাসু?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'সে আর শুনে কী হবে। নয়টি কৃত্রিম উপগ্রহ সাবাড়। আপনার ভাগ্য ভালো, পৃথিবীর দুই মহাশক্তির মধ্যে এখনো বাধেনি। যাক যা বললাম, সেটা করুন দেখি।' বললেন ড. বাসু।

জেমস সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শেষ উৎক্ষেপণের বিবরণটি জানিয়ে দিলেন, বিবরণটি পড়ে ড. বাসু বুঝতে পারলেন, জেমসের বস্তুটি এবারও লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে। তিনি আঁতকে উঠলেন, আবার কি কোনো উপগ্রহ সাবাড় হবে?

কিন্তু সমস্যার সময় মাথাটি ঠান্ডা রাখতে জানেন ড. বাসু। কয়েকজন বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে হিসেব করে জেমসের বস্তুটি মহাকাশের কোন পথে ছুটে চলেছে, সেটা বের করতে তাঁর দেরি হল না। তারপর অনুরোধ করলেন নাসার জনৈক বিজ্ঞানীকে। তাঁকে জানালেন, বস্তুটি নিরক্ষরেখার আকাশ বরাবর বিচরণ করছে। তার কাছাকাছি রয়েছে আপনাদের লেজারবাহী কৃত্রিম উপগ্রহ। সেই উপগ্রহ থেকে 30 গিগা হার্টজ-এর বেতার তরঙ্গের সংকেত পাঠান সেই বস্তুটিতে। তাহলেই সেটি ভারতমহাসাগরের নেমে এসে বিলীন হয়ে যাবে।' তারপর বোম্বাই এর জিয়োম্যাগনেটিক কেন্দ্রে ড. অরিজিৎ সরকারকে জানালেন, 'নজর রাখুন একটি বস্তু পিণ্ড দক্ষিণ আকাশ থেকে প্রচণ্ড বেগে ভারতের দক্ষিণ উপকূলের কাছাকাছি নামবে। সেটি থেকে নির্গত হবে তীব্র চৌম্বক ক্ষেত্র।' সময় এবং বস্তুটির নেমে আসার পথটিও বলে দিলেন তিনি।

কয়েকঘন্টা অপেক্ষা মাত্র। তারপর যা ঘটল সে কথা গোড়াতেই বলেছি—গৌরিবাদানুরের ভূমিকম্প এবং বেতার ঝড়।

ঘটনাটির তিন দিন পর ড. বাসু গৌরিবাদানুরে এলেন। সঙ্গে অরিজিৎ। সেখানে সবাই তাঁরা সঙ্গে কথা বলার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। দিল্লি থেকে ড. বিশ্বনাথনও এসেছেন।

ভূকম্পন যন্ত্রের কক্ষে মিটিং বসল, ড. বাসু সেখানেই মূল রহস্যটির কথা বললেন ; আসল ব্যাপার হল, একটি উল্কাপিণ্ড, এটি মহাকাশের কোথা থেকে এসেছিল আমরা জানি না। উল্কাটির মধ্যে ছিল সুপার হেভি এলিমেন্ট। ইউরেনিয়ামকেই তো বলা হয় সব চেয়ে ভারী পদার্থ। এটি তার চেয়েও ভারী। পারমাণবিক ভর 233। এ ধরনের বস্তু পৃথিবীতে পাওয়া যায়নি। ঠিক হয়, উল্কাটি টুকরো করে এক একটি টুকরোয় ঘটান হবে পারমাণবিক বিভাজন। সেই বিভাজনের ফলে কি পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়, সেটাই পরীক্ষা করার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম আমরা। এর জন্যে ব্যবহার করা হয় বিশেষ ধরনের রিঅ্যাকটর। ঠিক হয় বিভাজন মহাকাশে ঘটান হবে। সেই সময় নির্গত হবে প্রচুর পরিমাণ উচ্চশক্তির ইলেকট্রন কণা এবং গামা রশ্মি। তাদের পরিমাপ করে বিভাজন শক্তি কতটা দাঁড়ায় তা জানা যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, জেমস উল্কার যে নয়টি টুকরো এর জন্যে মহাকাশে পাঠান তার প্রতিটিই কক্ষচ্যুত হয়ে এক একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ধ্বংস করে। ধ্বংসের ফলে সৃষ্ট হয় প্রচণ্ড উত্তাপ। প্রচুর গামা রশ্মি এবং ইলেকট্রন, প্রচণ্ড গতিশীল ইলেকট্রনের ফোয়ারাই বলতে পারেন, যা সৃষ্টি করে অত্যন্ত তেজসম্পন্ন বেতার তরঙ্গ, শেষবারের মতো ভারত মহাসাগরে যেটি ফেলার ব্যবস্থা হয়, সেটি লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে এসে পড়ে আপনাদের এই গৌরিবাদানুরের জঙ্গলে, একটি বড়ো-সড়ো পাথরে এসে আঘাত করে, ঘটে বিস্ফোরণ। সেই বিস্ফোরণই এখানে অমন আলোর ঝলকানি সৃষ্টি করেছিল, পাথরের টুকরোয় আঘাত করে সৃষ্টি করে ভূমিকম্প, সেই

কম্পনও আপনার এই এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, ভূস্তরের গভীরে ঢুকে বিস্ফোরণ ঘটালে সেই কম্পন বহুদূরে পর্যন্ত প্রসারিত হত। সৌভাগ্য তা হয়নি। বিস্ফোরণের সময় সৃষ্টি হয় ইলেকট্রনের জোট যা প্রচণ্ড শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এখানকার রেডিয়ো টেলিসকোপে সেই কম্পনই ধরা পড়েছিল। অরিজিৎ চৌম্বক ক্ষেত্রে আগেই ধরতে পেরেছিলেন।

ড. বাসু বললেন, ব্যাপারটা আমার কাছেও বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে, ড. বিশ্বনাথন। কিন্তু এ নিয়ে এতই জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে, এ ব্যাপারে কাউকেই আমরা কিছু বলতে পারব না। বললে জটিলতা বাড়বে। তাই আমার অনুরোধ, আপাতত আপনারা মুখে কুলুপ দিয়ে থাকুন।

যোগ্যতা পরীক্ষা

ড. মেঘনাদ সাহা

কোনো দেশে অতি বিচক্ষণ ও সর্বকার্যে দক্ষ একজন রাজা ছিলেন। অন্যান্য রাজাদের মতো তিনি অসার আমোদ-প্রমোদে বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। তাঁহার মন্ত্রীও তাহারই মতো অতি বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। সুবিধা পাইলেই রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত কাজ নিজেদের চক্ষে পর্যবেক্ষণ করিতেন। মাঝে মাঝে গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া প্রজারা তাঁহার শাসন সম্বন্ধে কীরূপ আলোচনা করে তাহার খোঁজ-খবর লইতেন।

অন্যান্য রাজাদের যেমন হইয়া থাকে, এই রাজারও নানাশ্রেণির ভৃত্য ছিল এবং তাহারা নিজ নিজ কাজের অনুযায়ী নানারূপ বেতন পাইত। প্রধানমন্ত্রী সকলের চেয়ে বেশি বেতন পাইতেন। সাধারণ কর্মচারীরা 50 হইতে 100 টাকা পর্যন্ত পাইত এবং সাধারণ ভৃত্যেরা—যাহারা ঘর পরিষ্কার, বাসন মাজা, জল তোলা এবং ফরমাইস খাটা ইত্যাদি কাজ করিত, তাহারা দশ হইতে বিশ টাকা পর্যন্ত মাসে বেতন পাইত।

একদিন রাজা মন্ত্রীর সহিত ছদ্মবেশে চাকরদের ঘরের নিকট দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, তাহারা খুব জটলা করিয়া রাজার কাজের আলোচনা করিতেছে। একজন বলিতেছে—দেখ

ভাইসকল, মহারাজের কী ঘোর অবিচার। আমাদিগকে সমস্তদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিতে হয়, আর মহারাজা আমাদিগকে বেতন দেন মাত্র দশ হইতে পনেরো। আর কেরানিবাবুরা শুধু চেয়ারে বসিয়া কলম চালান, তাঁহারা আমাদের পাঁচ ছয় গুণ বেতন পান, আর বড়ো বড়ো কর্মচারীরা ত কিছুই করেন না। মন্ত্রী মহাশয় শুধু মহারাজের সাথে গল্প করেন এবং হুকুম জারি করেন ; আর তিনি যে কত হাজার টাকা বেতন পান, তাহা কেহ গনিয়া বলিতে পারে না। রাজা ও মন্ত্রী উভয়েই এই সমস্ত কথা শুনিলেন। কিন্তু তখন চাকরদের কিছু না বলিয়া পর দিন দরবারে তাহাদের কয়েকজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন তাহারা সকলে আসিলে পর মন্ত্রী বলিলেন—তোমরা কাল রাত্রে সকলে মিলিয়া আলোচনা করিতেছিলে যে, তোমরা সারাদিন প্রাণপাত পরিশ্রম কর ও মহারাজ তোমাদের তেমন বেতন দেন না। সেইজন্য মহারাজ তোমাদের দুঃখ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই হেতু তোমাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি একটি সমস্যা উত্থাপন করিয়া তোমাদের প্রত্যেককে তাহা সমাধান করিতে দিয়াছেন। তাহা এই—রাজবাটীর সম্মুখে অতিশয় পুরাতন এবং উচ্চ তালগাছটি কত উঁচু তাহা বাহির করিতে হইবে। ইহার জন্য তোমাদিগকে তিন দিন সময় দেওয়া হইল।

ইহা শুনিয়া চাকরদের মধ্যে মহা ভয় উপস্থিত হইল। তাহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, কি করিয়া তালগাছের উচ্চতা মাপা যাইতে পারে। একজন বলিল—একটি খুব বড়ো মই তৈয়ারি করিয়া গাছের মাথায় চড়ি। তারপর সেখান হইতে সূতা ফেলিয়া তালগাছ কত উচু, তাহা বাহির করিতে পারিব। কিন্তু রাজবাটীর সূত্রধর বলিল যে, অতবড়ো মই তৈয়ারি করা সম্ভবপর নয়। তখন অন্য একজন ভৃত্য বলিল—আচ্ছা, এস আমরা ওই তালগাছের সমান উঁচু একটি মাটির দেওয়াল তৈয়ারি করি। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, এইরকম দেওয়াল প্রস্তুত করিতে অনেক বৎসর লাগিবে এবং অনেক হাজার টাকা লাগিবে। আর একজন বলিল—আমাদের মধ্যে কেহ কোমরে সূতা বাঁধিয়া তালগাছের উপরে উঠুক এবং সূতা কত লম্বা, তাহা মাপিয়া দেখিলেই তালগাছের উচ্চতা বাহির করা যাইবে। কিন্তু এমন উঁচু তালগাছে চড়িতে পারে এমন লোক পাওয়া গেল না। সুতরাং তালগাছ না কাটিয়া কীরূপে তাহার উচ্চতা বাহির করিতে পারা যাইবে, চাকরেরা তাহা কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না। তখন তাহারা রাজদণ্ডের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া নির্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তিনদিন কাটিয়া গেলে মহারাজ তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভয়ে ভয়ে তাহারা দরবারে উপস্থিত হইল। তখন প্রধানমন্ত্রী বলিলেন—তোমরা কী তালগাছের উচ্চতা নিরূপণ করিতে পারিলে? চাকরেরা ভয়ে ভয়ে বলিল, না মহাশয়, অনেক চেষ্টা করিয়াও তালগাছের উচ্চতা বাহির করিতে পারিলাম না। তখন মন্ত্রী মহাশয় একজন সাধারণ কর্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি এই তালগাছটি কত উঁচু না কাটিয়া তাহা বলিয়া দিতে পার? সে খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—এই কাজ দুই রকমে হইতে পারে। যদি একজন খুব ভালো তীরন্দাজ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে ওই তালগাছের মাথা লক্ষ করিয়া একটি তীর ছুঁড়িতে হইবে। তীরের নীচের দিকে একটি শক্ত সূতা বাঁধা থাকিবে। তীরন্দাজ যদি ঠিক গাছের মাথায় তীর বিদ্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে সূতা লম্বভাবে মাটি পর্যন্ত পৌঁছিবে এবং তখন ওই সুতা মাপিলেই গাছ কত উঁচু, তাহা বাহির করা যাইবে। কিন্তু সকলে বলিল, তালগাছের মাথায় তীর বিদ্ধ করিতে পারে, এমন সুদক্ষ তীরন্দাজ পাওয়া মুশকিল। তখন কর্মচারী বলিল—যদি শক্ত সূতা দিয়া একটি ঘুড়ি উড়ান যায়, এবং চেষ্টা করিয়া উক্ত ঘুড়িকে গাছের মাথায় আটকান যায়, তাহা হইতে সূতার দৈর্ঘ্য হইতে তালগাছের উচ্চতা বাহির করা যাইতে পারে। মন্ত্রী বলিলেন, তুমি ঘুড়ি গাছের মাথায় আটকাইতে পার? কর্মচারী বলিল, না হুজুর, কিন্তু যাহারা খুব ভালো ঘুড়ি উড়ায়, বোধ হয় তাহারা পারিবে। মন্ত্রী বলিলেন, আচ্ছা দেখা যাউক, ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আছে কিনা। তিনি তখন একজন বড়ো বিশিষ্ট কর্মচারীকে ডাকিলেন, এবং বলিলেন, আপনি কোনো সহজ উপায়ে এই তালগাছ কত উঁচু, তাহা বাহির করিতে পারেন কি? কর্মচারী বলিলেন, নিশ্চয়ই পারি, আমি অল্প সময়ের মধ্যেই গাছ কত উঁচু, তাহা মাপিয়া দিতেছি। তিনি তখন বাহিরে যাইয়া একটি প্রায় আট হাত লম্বা কাঠি সোজাভাবে (লম্বভাবে) মাটিতে

পুঁতিলেন এবং একটি মাপকাঠি লইয়া কাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপিলেন। দেখা গেল, ছায়ার দৈর্ঘ্য ছয় হাত এবং তখনই তালগাছের গোড়া হইতে সূতা ধরিয়া উহার ছায়া কত বড়ো, তাহা মাপিলেন। উহা দৈর্ঘ্যে হইল 120 হাত। তখন তিনি হিসাব করিলেন, ছয় হাত ছায়া যার, তার দৈর্ঘ্য যদি হয় আট হাত, তবে 120 হাত ছায়া যার তার দৈর্ঘ্য কত হইবে?

— 6 : 8 : : 120 : ক , ক =8 x 120 / 6 = 160 হাত।

এই সমস্ত করিতে প্রায় পনের মিনিট সময় লাগিল। তখন তিনি আসিয়া বলিলেন, গাছের উচ্চতা 160 হাত এবং যে প্রণালীতে উহা বাহির করিয়াছেন তাহাও সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। রাজা ও মন্ত্রী ব্যতীত আর সকলেই তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইল।

তখন রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মন্ত্রী, আপনি ইহা অপেক্ষা সহজে তালগাছ কত উঁচু, তাহা বাহির করিয়া দিতে পারেন কি? মন্ত্রী বলিলেন, Sextant (কোণ-মান) যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষণিকের মধ্যেই গাছের বা যে-কোনো জিনিসের উচ্চতা বাহির করা যাইতে পারে। আমি এই যন্ত্রের কথা অবগত আছি, কিন্তু ব্যবহারে অভ্যস্ত নই, আপনার জরিপ বিভাগের কর্মচারীরা অতি সহজেই এই কার্য করিতে পারে।

রাজা তখন জরিপ বিভাগের প্রধান কর্মচারীকে ডাকাইলেন, এবং তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই Sextant দিয়া গাছের উচ্চতা ঠিক মাপিয়া বাহির করিলেন।

সেদিন হইতে রাজবাড়ির ভৃত্যদের মধ্যে আর কাহারও কোনো অসন্তোষের ভাব রহিল না।

[*Sextant যন্ত্রের বর্ণনা যে-কোনো প্রাকৃতিক দর্শনের পুস্তকে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু Sextant সাধারণত স্থলে ব্যবহার হয় না, সমুদ্রে সূর্য বা তাহার উচ্চতা মাপিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। স্থলে যে যন্ত্র ব্যবহার হয় তাহার নাম Theodolite]

ছোড়দার রেকর্ড

সিদ্ধার্থ ঘোষ

একজন হিমশিম খাচ্ছে আর আরেকজন চরকি পাক মারছে। যে চরকি পাক মারছে সে মুখ বুজে আছে, কারণ তার মুখ নামক অঙ্গটি নেই। কিন্তু আমার কেসটা তো আর তার নয়। আসলে ওই যে লোকটা তক্তপোষের ওপর উপুড় হয়ে রয়েছে, দুর্ভাগ্যবশত ওই আমার ছোড়দা। ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার। বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে রয়েছে, কিন্তু ওটা তো ভান। আসলে দৃষ্টি রয়েছে আমার ওপর...যাক গে, কিন্তু আমি ভাবছি দুনিয়ার কত রকমের পাগলই না দেখা যায়। না, ছোড়দার কথা বলছি না। তবে পাগলদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে খারাপ জাতের যারা অন্যদেরও পাগল করে ছাড়তে পারলে বেজায় খুশি হয়। বুদাপেস্টের রুবিক সাহেব নিশ্চয় এই ধরনের লোক। বাপরে, কি বিদকুটে জিনিসটাই না বানিয়েছে। শুধু ঘোরাচ্ছি আর ঘোরাচ্ছি—এপাশ, ওপাশ, সেপাশ, ছ'পাশ—একবার একটা পিঠের সব কটা খোপই পুরো নীল হয়ে গেছল দেখে আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু তারপরেই রুবিক কিউবটা ঘুরিয়ে দেখি অন্য পাঁচটা পিঠেই রঙেরা একেবারে লন্ডভন্ড। এমন বেয়াড়া হালচাল। তুমি কর দেখি, বলে ছোড়দাকে চ্যালেঞ্জ করতেও ভরসা হচ্ছে না। এসব ব্যাপারে ওর মাথাটা বেশ পরিষ্কার। কিন্তু তা বলে ওর এ কথাটা বলা উচিত হয়নি—'রুবিক কিউব নিয়ে লড়ে যা। বুদ্ধি ধারাল হবে। অবশ্য যা নেই তাতে কখনো ধার দেয়া যায় না...'

কলিং বেলের শব্দটা যে কত মিষ্টি লাগতে পারে এখন বুঝতে পারছি। ভাবতেও পারিনি রবিবার দুপুরে এই অসময়ে, কেউ আমায় উদ্ধার করতে আসতে পারে।

দরজা খুলে অবাক। পেল্লাই লম্বা লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছি! মাঝবয়সি, মাথার চুলগুলা কদমছাঁট, গায়ের রংটা তামাটে না হয়ে কালো হলে নিগ্রো মনে হত। আমায় কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে লোকটা একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। শুধু তাই নয় নিজের হাতে দরজাটাও টেনে দিয়েছে। ঘটনাটা রাত্তিরের দিকে ঘটলে নিশ্চয় ভয় পেতাম।

'আই ওয়ান্ট টু মিট মিস্টার মানটু সেন।'

কথা বলছে না তো যেন চোখ পাকিয়ে শাসানি দিচ্ছে। সাউথ ইন্ডিয়ান হতে পারে বলে মনে হয়েছিল, উচ্চারণ শুনে বুঝলাম তা নয়।

আর কথা না বাড়িয়ে ঘরে ডেকে আনলাম। ছোড়দা তখনও তক্তপোষে। কালো সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, 'মিস্টার সেন—দেয়ার লাইয়িং—'

ছোড়দা কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে উঠে এল। নিশ্চয় ইংরেজি উচ্চারণে কোনো ভুল খুঁজে পেয়েছে।

সাহেব হেসে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল। আমার সঙ্গে এমন তেরিয়া মেজাজ দেখিয়ে এখন...

ভালো ইংরেজি বলতে না পারি, বুঝি সব। কালো সাহেবের নাম রিচার্ড রোজ। এসেছে সিলোন থেকে। ছোড়দার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে। প্রাইভেট।

রিচার্ড আমার দিকে তাকাল। কিন্তু ছোড়দা না বললে আমি নড়ছি না। তুমি কে হে...সঙ্গে সঙ্গে রুবিক কিউবটা হাতে নিয়ে মশগুল হয়ে গেলাম। স্বীকার করতেই হবে রুবিক কিউব বুদ্ধি বাড়ায়। এতক্ষণে মনে পড়ল লোকটাকে কোথায় দেখেছি।

'আসছি!' আচমকা হাঁক ছেড়ে পাশের ঘরে উঠে এলাম। ছোড়দা নিশ্চয় বুঝবে যে আসলে কেউই আমায় ডাকেনি। ছোড়দা আসছে দেখে আরও দু'পা সরে এলাম।

—কি রে?

—ছোড়দা, এই লোকটাকে বুক ফেয়ারে দেখেছি। সেই যে দোকানটায় দাদার বই বিক্রি হচ্ছিল। দাদার বইটা হাতে দিয়ে কি সব খোঁজ নিচ্ছিল। যেই জিজ্ঞেস করেছি, আপনি মিস্টার সন্তু সেনকে চেনেন, ব্যাস—চোখ পাকিয়ে বইটা একেবারে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিচিরমিচির করে কি সব বলেওছিল—কত চেষ্টা করলাম বলবার যে, সন্তু সেন আমার দাদা, কে কার কথা শোনে।

—খুব ইন্টারেস্টিং। চল দেখা যাক ব্যাপারটা কী? থ্যাঙ্কস-ট্যাঙ্কস দেওয়া ছোড়দার ধাতে নেই।

ঘরে ঢুকে দেখি রিচার্ড পায়চারি জুড়েছে। হাত দুটো কোমরের পিছনে, আঙুলে ফাঁস লাগানো। আমাদের ঢুকতে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'আমি আর দশ মিনিটের বেশি কিছুতেই থাকতে পারব না। প্লিজ—

ছোড়দা মাফ চেয়ে রিচার্ডকে বসতে অনুরোধ করল।

চেয়ারের সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছে রিচার্ড। চোখ দু'টো ছোটো হয়ে এসেছে, কপালে চিন্তার রেখা।

'আপনার দাদা মিস্টার সেন কেপটাউনে গৃহবন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। প্লিজ—ডোন্ট পুট কোয়েশ্চেনস, ট্রাই টু বিলিভ মি।'

রিচার্ড আমাদের চমকে দিল। আমাদের চোখমুখের অবস্থা দেখে রিচার্ড মুহূর্তের জন্য থামতেই ছোড়দা বলে উঠল, 'ও কি সাদা কালোর ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে?'

'ঠিক তাই। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?'

'আপনি তো জানেন, দাদা 'ডিস্ট্রিক্ট সিক্স' নামে অ্যালবার্ট রাইভের একটা উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ করেছেন। উপন্যাসটা বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার অ্যাপার্টথেড নীতির জন্য সেরকম কুখ্যাত...কিন্তু দাদা তো কখনো রাজনীতির মধ্যে—'

রিচার্ড বাধা দিল, 'মিস্টার সেন, এটা রাজনীতির প্রশ্ন নয়। কোনো বিবেকবান মানুষের পক্ষে কখনো দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে সমর্থন কার সম্ভব নয়। রাজনীতি করলে আপনার দাদা নিশ্চয় ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি নিয়ে কেপ টাউনে আসতেন না। বা, এলেও কখনো রাইভের উপন্যাস অনুবাদ করতেন না। শুনলে অবাক হবেন, ওনাকে গৃহবন্দি রাখার কারণ মাত্র একটি। ওই অনুবাদটাই ওঁর বিপদ ডেকে এনেছে। রাইভ বর্ণ বিদ্বেষ বিরোধী সাংস্কৃতিক কর্মী, বর্তমানে দেশছাড়া। এই উপন্যাসটা অনূদিত হয়েছে জানতে পেরে শ্বেতাঙ্গ সরকার সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। আপনার দাদার সঙ্গে ওখানকার রাজনৈতিক কর্মীদের আদৌ কোনো যোগাযোগ নেই। ভালো লেগেছিল তাই অনুবাদ করেছেন। কিন্তু বড়ো একরোখা মানুষ উনি। গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের একটিও প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হননি। আরো মুশকিল হল, আমাদের নিজেদের লোকেরা যখন ওনার কাছে কোনো প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছে, উনি তাদেরও বিশ্বাস করতে পারছেন না! চেনেনই না তো—

'দাদা তো গভর্নমেন্ট চ্যানেলে চাকরি নিয়ে গেছে। বিদেশ মন্ত্রকের সাহায্যে—'ছোড়দা কথা শেষ করার সুযোগ পেল না।

রিচার্ডের হাসিটা দারুণ তেঁতো, আপনি দক্ষিণ আফ্রিকার হালচাল জানেন না। কোনো লাভ হবে না। কেউই প্রমাণ করতে পারবে না যে ওনাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। 'ডিস্ট্রিক্ট সিক্স'-এর গাছটা মনে আছে? ওটাকে গল্প না বলে সত্য বলা উচিত। কেপটাউনের অশ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা সত্যিই 'ডিস্ট্রিক্ট সিক্স' নামে একটি নরককুণ্ডে বাস করে।'

'হ্যাঁরে, বাবাকে ডেকে আনব নাকি?'—আমি ছোড়দাকে বললাম।

রিচার্ড জিগ্যেস করল, 'হোয়াট ইজ হি সেয়িং?'

ছোড়দা আমার পরিচয় দিল।

রিচার্ড হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইয়ংম্যান, সেদিন তুমি আমাকে প্রায় ডুবিয়েছিলে। মনে আছে, বুক ফেয়ারে দেখা হয়েছিল। তোমাদের ঠিকানা তো ওখান থেকেই জোগাড় করেছি। দীর্ঘ চার বছর আমি দেশ ছাড়া বিশেষ নির্দেশ পেয়ে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এসেছি। ঘুণাক্ষরেও...'

'আপনি কি বাবার সঙ্গে...'

'না, কি দরকার। তাঁর নিশ্চয় বয়স হয়েছে, দুর্ভাবনা বাড়বে।'

ছোড়দা বলল, 'শারীরিক নির্যাতনের ভয় আছে নাকি? মানে তেমন কিছু...'

'হ্যাঁ—মাস তিনেক পরে কেপটাউনে আমরা একটা বড়ো আন্দোলন শুরু করব। তার আগে আমরা আমাদের সমর্থক বিদেশি বন্ধুদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিতে চাইছি। ইতিমধ্যে অনেকেই চলে গেছেন।'

'তার মানে দাদা যদি আপনাদের ওপর নির্ভর করতে রাজি হয়—'

'তিন দিনের মধ্যে তাঁকে কলকাতা পৌঁছে দেব। আমাদের সংগঠন খুব ভালো। এমনকী যে ছ'জন পুলিশ ওঁকে সারাক্ষণ পাহারা দেয়, তাদের মধ্যেই আমাদের একজন লোক আছে। পালাবার প্রস্তাবও রাখা হয়েছিল। কিন্তু ওই যে বললাম, উনি কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'চিঠি দিলে কি পৌঁছবে? দিন সাতেক আগেও আমরা ওর একটা ছোট্ট চিঠি পেয়েছি।'

'খুব কড়া সেন্সর। যদি এতটুকু সন্দেহজনক মনে হয়—'

'বাংলা পড়ারও লোক আছে তাহলে?' আমি জানতে চাইলাম।

'সার্টেনলি!'

'আচ্ছা, বাবার শরীর খুব খারাপ বলে যদি টেলিগ্রাম পাঠান যায়? বা, ভারতীয় দূতাবাসের সাহায্যে যদি সে-খবরটা—'আমি পথ খোঁজার চেষ্টা করি। রিচার্ড মাথা নাড়ে, 'খুব একটা সুবিধে হবে না। চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

ছোড়দা বলল, 'নাঃ—বাবাকে রাজি করানো শক্ত। বাবা রাজনীতি করার বিরোধী কিন্তু ঠিক বলবেন, দাদা নিজে যখন প্রোটেস্ট করছে তখন এভাবে মিথ্যে কথা লিখে—'

রিচার্ড উঠে দাঁড়াল, 'আমি আর আজ দেরি করতে পারব না। চলি। আপনারা ভালো করে চিন্তা করে দেখুন, এমন একটা উপায় বার করা যায় কিনা যাতে উনি আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন। ধরুন, এমন কোনোও নাম বা শব্দ, যেটা আমাদের লোকের মুখে শুনলেই উনি বুঝতে পারবেন—'

'আচ্ছা, আপনাদের যে লোকটি পাহারাদারদের দলে আছে তার নাম জানেন?' ছোড়দা জানতে চাইল।

'জর্জ লেম। একটা আইডিয়া এসেছে মনে হচ্ছে?'

'না, ঠিক তা নয়। একটু ভেবে দেখি। আপনার সঙ্গে কী ভাবে যোগাযোগ হবে?'

'ঠিক সাত দিন পরে, নেক্সট রবিবার সকাল সাতটায় আমি ফোন করব। ফোন যদি না পাই তাহলে আসব। আমি কিন্তু তারপরের দিনই ক্যালকাটা থেকে চলে যাব। যা করার এরই মধ্যে। এখানে বেশি দিন থাকা আমার পক্ষে সেফ নয়।'

দরজার কাছে পৌঁছে রিচার্ড বলল, 'আপনারা আর আমার সঙ্গে এগোবেন না। চলি গুড বাই!'

ছোড়দা ঘরে ঢুকে আবার তক্তপোষে লম্বা হল। ঘাড়ের পিছনে দু'হাত রেখে সেই খ্যাতিমান কড়িকাঠের কাছ থেকে নিশ্চয় বুদ্ধি ভিক্ষা চাইছে। দেখে কেমন কষ্ট হল। একটু হেল্প করার জন্যে বললাম, 'বুঝলে ছোড়দা, একটা লিস্ট করা যাক—এমনিতেই তো আমরা বড়দার কাছে মাঝে মাঝে জিনিসপত্র পাঠাই, এই ধরো টিনে ভরা রসগোল্লা, বই-টই, আমসত্ত্ব—'

'রুবিক কিউবের প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলাম যে ভবিষ্যতে আর কখনো মানুষকে সাহায্য করার চেষ্টা করব না।

তাতেও রেহাই নেই। ঘন্টাখানেক বাদে হঠাৎ হুকুম এল, 'গীতাঞ্জলিটা নিয়ে আয় তো শীগগির।'

অবাক হয়েছি কিন্তু প্রশ্ন করিনি। অবাক তো হতেই হবে। দেবব্রত বিশ্বাসের গান হলেও যে মুখের সামনে থেকে ইলেকট্রনিক্সের বই নামায় না...নিশ্চয় কোনো মতলব এঁটেছে। এমন কোনো গানের রেকর্ড পাঠাতে চায় নিশ্চয় যেটা শুনে বড়দা...তা ছাড়া এও ঠিক যে আমরা প্রায়ই বড়দাকে রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ড পাঠাই।

গীতাঞ্জলি এনে দিলাম, কাগজ কলম এনে দিলাম তবু ছোড়দা স্পিকটি নট। মাঝে মাঝে খশখশ করে কী লেখে, একটু ভাবে, তার পরে আবার পাতা ওলটায়।

'ব্যাস—এতেই হবে।' ধুলো ঝাড়ার মতো সশব্দে বই বন্ধ করে ছোড়দা উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে কাগজের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের ফালিটা চারভাঁজ করে পকেটে পুরে ফেলেছে। কয়েক মিনিট বাদেই পাশের ঘর থেকে ওর গলা শুনতে পেলাম। কান খাড়া করতেই বুঝলাম অবনি কাকুর সঙ্গে ফোনে কথা বলছে। লাকিফোন রেকর্ডিং কোম্পানির মালিক অবনিকাকু। বাবার ছোটোবেলার বন্ধু। বুঝলাম, কিছু ভুল করিনি। একটা রেকর্ডই নিশ্চয় পাঠাবে বড়দার কাছে।

রাত্তিরে সবে এসে শুয়েছি, ছোড়দা বলল, 'ওরে, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। অ্যালার্মটা দিয়ে রাখত ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে।'

'ক'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট অবনিকাকুর সঙ্গে?'

ছ'টায়। কিন্তু সেই বেলঘরিয়ায় যেতে হবে।'

অ্যালার্মের চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলাম, 'তা বেলঘরিয়া না ছুটে মেলডির দোকান থেকে কিনে নিলে হত না?'

'ও রেকর্ড পাওয়া যায় না।'

'কী গান সিলেক্ট করলে শুনি!'

'ওই তো লিখে রেখেছি কাগজটায়। দ্যাখ না। ও কীরে, এতক্ষণ ধরে দম দিচ্ছিস কেন! ওহ হো—এটারতো অ্যালার্মের স্প্রিংটা কাটা।'

ঠিক বলেছ। একেবারে মনে ছিল না। ঘড়ি নামিয়ে রেখে কাগজের টুকরোটা হাতে নিলাম।

'তাহলে কী হবে?' ঘুমকাতুরে ছোড়দার হাহাকার কানে এল। পরমুহূর্তে আমাকে আক্রমণ, 'তুই যা কুম্ভকর্ণ—'

'আমি না হয় কুম্ভকর্ণ, তুমি কী?'

'আমি ঘুমোই অত্যধিক চিন্তা করতে হয় বলে, তুই ঘুমোস অকারণে। যাকগে তিন গেলাস জল নিয়ে আয়।'

'কী!'

'জল, জল। এইচ টু ও। তিন গেলাস পেটে ভরে নিলে সময়মতো বিপদ সংকেতআসবে—'

ছোড়দা জল গিলে পাশ ফিরে শুতে কাগজটা খুললাম। দুটো রবীন্দ্রসংগীত পুরো কপি করেছে। 'একলা আমি বাহির হলেম তোমার অভিসারে, সাথে সাথে কে চলে মোর নীরব অন্ধকারে' এবং 'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি / ঝড় এসেছে, ওরে, এবার ঝড়কে পেলেম সাথী।'

কী মিথ্যুক? এই গানের রেকর্ড কিনতে পাওয়া যায় না।

অনেক চেষ্টা করেও ছোড়দার মুখ দিয়ে কথা বার করতে পারিনি। শুধু এইটুকু জানতে পেরেছি যে অবনিকাকুর ওখান থেকে একটা নতুন রেকর্ড করে আনতে প্রায় হাজার খানেক টাকা জলে দিয়েছে। ওনার মতে সেটাও নাকি খুব সস্তা। এখনও বড়াই করে চলেছে যে বড়দা ফিরলেই তার কাছ থেকে সুদে আসলে সব আদায় করে নেবে। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। আমি নিজে তো শুনেছি রেকর্ডটা (যতই বুদ্ধি করে লুকিয়ে রাখুক)। ওই গান শুনে কী বুঝবে বড়দা?

তবু রিচার্ডের ফোন আসার তক্কে ছিলাম। পরের রবিবার, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাতটা, ফোনটা ঝনঝন করে উঠল।

রিসিভার তুলে ছোড়দা বলল, 'ব্যবস্থা একটা হয়েছে মনে হয় কাজ হবে। দাদার কাছে আমরা একটা রেকর্ড পাঠিয়েছি এয়ার মেলে। আপনাকে এবার একটা কাজ করতে হবে। ওখানে মিস্টার লেম বলে যিনি আছেন তাঁর কাছে খবর পাঠাতে হবে তিনি যেন দাদাকে রিকোয়েস্ট করে বলেন, ওই নতুন রেকর্ডটা শুধু লেফট চ্যানেলে শোনার জন্যে। খুব গোপনে বলতে বলবেন কিন্তু। হ্যাঁ—লেফট চ্যানেলে। না না, একেবারে প্লেন অ্যান্ড সিম্পল টেগোরের রেকর্ড। আচ্ছা! আচ্ছা—ওকে থ্যাঙ্ক ইউ!'

আমার দিকে ফিরে ছোড়দা বলল, 'এখনও বুঝলি না? সেদিন তো খুব লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিলি রেকর্ডটা!'

এবার ছোড়দার মধ্যে জ্ঞান বিতরণ শুরু করার সিম্পটম গুলো প্রকাশ পাচ্ছে। হলও তাই। চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে ঝাড়া আধটি ঘন্টা কাটিয়ে দিল স্টিরিও রেকর্ড করার কায়দাকানুন সম্বন্ধে বক্তৃতা ঝেড়ে।

দুটো মাইক্রোফোনের সাহায্যে স্টিরিও রেকর্ড করা হয়। সে রেকর্ড বাজানোও হয় দুটো অ্যামপ্লিফায়ার ও লাউডস্পিকার দিয়ে। স্টিরিও রেকর্ডের যে খাঁজ বা গ্রুভের মধ্যে শব্দগুলোর স্পন্দনের আকৃতি ধরা থাকে তার দুটো কিনারা আছে। একটা কিনারাকে বলা হয় লেফট চ্যানেল আর অন্যটাকে রাইট চ্যানেল। লেফট চ্যানেলে থাকে বাঁ দিকে মাইক্রোফোনের শব্দ আর রাইট চ্যানেলে ডান দিকে মাইক্রোফোনেরটা। রেকর্ড বাজবার সময়েও ঠিক এইভাবেই একটা স্পিকারে লেফট চ্যানেলে রেকর্ড করা শব্দগুলো বাজে আর অন্য স্পিকারটায় রাইট চ্যানেলের শব্দগুলো। স্টিরিও রেকর্ড চালাবার সময় দু'টো চ্যানেলই একসঙ্গে বাজে। মানে, দু'টো স্পিকার থেকেই শব্দ বেরোয়। এই অবধি শুনেই তিনবার হাই উঠেছিল। নিশ্চয় সেটা চোখে পড়েছিল ছোড়দার। দুম করে টেবিলে ঘুঁষি মেরে বলল, 'এখনও বুঝলি না? তোর দ্বারা কিসসু হবে না। রবীন্দ্রসংগীত দু'টো রেকর্ড করবার সময় লেফট চ্যানেলে শুধু বেছে বেছে কয়েকটা শব্দ রাখা হয়েছে, বাকি সব বাদ। রাইট চ্যানেলে পুরো গানটা আছে। এমনিতে শুনলে, মানে দুটো চ্যানেলই যখন বাজছে, পুরো গানটাই শোনা যাবে। তুইও তো বাজিয়েছিলি কিছু ধরতে পারিসনি তো! কিন্তু ডান দিকের স্পিকারটা বন্ধ করে শুধু বাঁ দিকের স্পিকার অন করে রাখলেই শোনা যেত লেম...তোমার...সাথে সাথে...চলে। এটা কোন গান বলত?'

'একলা আমি বাহির হলেম তোমার অভিসারে, সাথে সাথে কে চলে মোর গভীর অন্ধকারে। হলেম এর হ-টা বাদ দিয়ে লেম বানান হয়েছে।'

'যাক বুদ্ধিমানের মাথায় ঢুকেছে তাহলে। টিকিটিকি বাবাজিরা হাজার চেষ্টা করলেও ধরতে পারবে না, কী বল? ভাগ্যিস আমাদের দেশেও এখন স্টিরিও ফোনিক সাউন্ড রেকর্ড করা শুরু হয়েছে, না হলে কি আর দাদার কাছে রবীন্দ্র সংগীতের ফাঁকে ফাঁকে এইভাবে গোপন সংবাদ পাঠান যেত। এবার তুই বলত, দ্বিতীয় গানটা থেকে ঠিক এইভাবে কোন কোন শব্দ লেফট চ্যানেলে রাখা হয়েছে।'

আমার বুদ্ধির প্রশ্ন তুলেছে তাই পরীক্ষায় নামতেই হল। গান লেখা কাগজটা হাতে নিয়ে তাচ্ছিল্য ভরে মুহূর্তের মধ্যে কটা শব্দের নীচে দাগ দিয়ে ছোড়দার দিকে বাড়িয়ে দিলাম—

যেতে যেতে একলা পথে / নিয়েছে মোর বাতি / ঝড় এসেছে, ওরে, এবার / ঝড়কে পেলেম সাথী। (পথে এবার লেম সাথী)।

ছোড়দা বোধহয় ভাবেনি এত তাড়াতাড়ি পেরে যাব। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানিস, কলম্বাস একবার একটা ডিম হাতে নিয়ে বলেছিল, আপনাদের মধ্যে কেউ কি এটা সোজা করে বসাতে পারবেন? কেউ পারল না। তখন কলম্বাস যেই এক ঠোক্করে ডিমটাকে থেঁতলে বসিয়ে দিল, সবাই হইহই করে উঠল, এ আর এমনকী! যা যা, শীগগির রুবিক কিউব নিয়ে বসে যা। তোর মগজখানার অবস্থা যা...'

এই ঘটনার এক মাস পরে মিস্টার লেমের সাহায্যে বড়দা বাড়ি ফিরে এসেছে। দারুণ একটা পেন দিয়েছে আমায় কিন্তু সবচেয়ে ভালো জিনিসটা, ক্যামেরাটা বাগিয়ে নিয়েছে মিস্টার কলম্বাস।

প্রোফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও

সত্যজিৎ রায়

7ই জুন

বেশ কিছুদিন থেকেই আমার মন মেজাজ ভালো যাচ্ছিল না। আজ সকালে একটা আশ্চর্য ঘটনার ফলে আবার বেশ উৎফুল্ল বোধ করছি।

আগে মেজাজ খারাপ হবার কারণটা বলি। প্রোফেসর গজানন তরফদার বলে এক বৈজ্ঞানিক কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক যাবেন হাজারিবাগ। আমার নাম শুনে, আমার বইটই পড়ে এসেছিলেন আমার সঙ্গে আলাপ করতে এবং আমার ল্যাবরেটরিটা দেখতে। এর আগে অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক যে আসেননি তা নয়। প্রায় সব দেশের বৈজ্ঞানিকেরাই ভারতবর্ষে এলে একবার আমার ল্যাবরেটরিটা ঘুরে দেখে যান। এক নরউইজীয় প্রাণীতত্ত্ববিদ তো প্রায় এক মাস কাটিয়ে গিয়েছিলেন আমার এখানে। কিন্তু এ লোকটি যেন একটু অন্যরকম। এঁর হাবভাব যেন কেমন কেমন। বড্ড বেশি খুঁটিনাটি প্রশ্ন এবং চাহনিতে এমন একটা চঞ্চল ও তীব্র ভাব, যেন দৃষ্টি দিয়েই আমার গবেষণার সব কিছু রহস্য আয়ত্ত করে ফেলবেন। মৌলিক গবেষণা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটু রেষারেষি থাকতে বাধ্য। আমি যে সব তথ্য বছরের পর বছর চিন্তা করে, অঙ্ক কষে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আবিষ্কার করেছি, তা কেউ এক প্রশ্নের জবাবেই সব জেনে ফেলবে এটা আশা করাটাই তো অন্যায়! অথচ ভদ্রলোকের যেন সে রকমই একটা মতলব। আমার চেহারা দেখে আমাকে বোধহয় নিরীহ গোবেচারা বলেই মনে হয়। নইলে সরাসরি এ সব প্রশ্ন করার সাহস হয় কী করে? আর প্রশ্ন করলেও তার জবাব পাবার আশা করে কী করে?

আমি আবার সে সময়টা একটা আশ্চর্য ওষুধ নিয়ে গবেষণা করছিলাম। সে ওষুধটা খেলে যে কোনো প্রাণী অদৃশ্য হয়ে যাবে। ওষুধে পুরো কাজ তখনও দিচ্ছিল না। যে গিনিপিগটার ওপর পরীক্ষা করছিলাম, সেটা ওষুধ খাবার পর ঠিক সতেরো সেকেন্ডের জন্য একটা স্বচ্ছ ঝাপসা চেহারা নিচ্ছিল, সম্পূর্ণ অদৃশ্য হচ্ছিল না। কোনো উপাদানে একটু গণ্ডগোল ছিল এবং সেই কারণেই আমার মনটা উদবিগ্ন ছিল। আর সেই সময়ে এলেন তরফদার মশাই।

তাঁর প্রশ্নবাণের ঠেলা সামলাতে সেদিন আমার রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছিল। আর সে কী বেয়াড়া রকমের কৌতূহল! আর ওষুধপত্রের বোতল হাতে নিয়ে ছিপি খুলে শুঁকে না দেখা অবধি যেন তাঁর শান্তি নেই। তবে একটা জিনিস টের পেয়ে বেশ মজা লাগছিল। আমার নিজের তৈরি ওষুধের প্রায় একটিও প্রোফেসর তরফদার চিনে উঠতে পারছিলেন না। অর্থাৎ সেগুলো কী কী জিনিস মিশিয়ে যে তৈরি হয়েছিল, তা তিনি মোটেই আন্দাজ করতে পারছিলেন না।

আমি অবিশ্যি আমার খাতাপত্রগুলো তাঁকে ঘাঁটতে দিইনি। অর্থাৎ তার মধ্যেই অদৃশ্য হবার ওষুধের ফরমুলা এবং সেই সম্বন্ধে আমার গবেষণার যাবতীয় নোট ছিল। সেই খাতাটা আমি সব সময়ে চোখ চোখে রাখছিলাম। কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটা রেজিস্টারি চিঠি এসে পড়াতে এবং আমার চাকর প্রহ্লাদ বাড়িতে না থাকাতে, আমাকে দু' মিনিটের জন্য উঠে বাইরে যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে দেখি তরফদার খাতাটা খুলে আমার লেখা গোগ্রাসে গিলছেন, তাঁর হাবভাবে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা।

আমি তাঁর হাত থেকে খাতাটা ছিনিয়ে নেবার অভদ্রতাটা করতে পারলাম না। কিন্তু তার পরিবর্তে বাধ্য হয়েই একটা মিথ্যের আশ্রয় আমাকে নিতে হল। বললাম, 'দেখুন, আমি এই মাত্র একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে একটা বড়ো দুঃসংবাদ রয়েছে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন—আজ আর আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না।'

এর পরে আরও দু'দিন এসেছিলেন প্রোফেসর তরফদার কিন্তু আমার ল্যাবরেটরিতে তাঁর প্রবেশ করা হয়নি। কারণ তিনি এসেছেন জেনেই আমি ল্যাবরেটরিতে তালা লাগিয়ে তাঁকে বৈঠকখানায় বসিয়েছি। ফলে দু'বারই ভদ্রলোক চা খেয়ে পাঁচমিনিট উশখুশ করে আজেবাজে বকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

তারপর কবে যে তিনি হাজারিবাগ ফিরে গেছেন জানি না। এই ক'দিন আগে বুধবার তাঁর কাছে থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। এ চিঠির মর্ম আমার মোটেই ভালো লাগেনি। তরফদার আমার গবেষণা সম্পর্কে একটা চাপা বিদ্রুপের সুরে লিখছেন যে তিনি আমার কাজে মোটেই ইমপ্রেসড হননি এবং তিনি নিজেই

একটি অদৃশ্য হবার আশ্চর্য উপায় আবিষ্কার করতে চলেছেন, আমার আবিষ্কারের চেয়ে তার মূল্য নাকি অনেক বেশি। অল্পদিনের মধ্যেই নাকি তিনি এই আবিষ্কারের কথা প্রচার করে আমাকে টেক্কা দেবেন।

আমি চিঠিটা পড়ে প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ একটা খটকা লাগল। যে দু' মিনিট তরফদার আমার খাতা খুলে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, তার মধ্যে তিনি কি আমার ফরমুলা সব কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন নাকি? এবং সেটার ভিত্তিতেই কি তিনি নিজে কাজ করে খোদার ওপর খোদকারি করতে চলেছেন? না, অসম্ভব। তরফদারের এমন ক্ষমতা আছে বলে আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না বরং তাঁকে আমার মোটামুটি সাধারণ স্তরের বৈজ্ঞানিক বলেই মনে হয়েছিল। তবুও চিঠিটা পড়ে আমার মেজাজটা কেমন জানি তেতো হয়ে গিয়েছিল।

এমন সময়ে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা এবং সেটা ঘটেছে আজই সকালে।

ভোর সাড়ে ছ'টায় উশ্রীর ধারে বেড়িয়ে এসে অভ্যাসমতো আর বাগানের ফুলগাছগুলো দেখতে গিয়েছি এমন সময়ে পুব দিকের দেয়ালের ধারে গোলঞ্চগাছটার দিকে চাইতেই দেখি গাছটার একটা ডালে চোখ-ঝলসানো রঙের খেলা।

কাছে গিয়ে দেখি এক অতিকায় আশ্চর্য সুন্দর ম্যাকাও (Macaw বা Macao) পাখি গাছটার একটা ডালে বসে আমার দিকে চেয়ে আছে। ম্যাকাও কাকাতুয়া জাতীয় পাখি, কিন্তু আয়তনে কাকাতুয়ার চেয়ে প্রায় চারগুণ বড়ো। এর আদি বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা। এত রঙের বাহার পৃথিবীতে আর কোনো পাখির আছে বলে মনে হয় না। দেখলে মনে হয় প্রকৃতি যেন রামধনুর সাতটি রং নিয়ে খেলা করতে করতে খেয়ালবশে পাখিটির গায়ে তুলির আঁচড় কেটেছেন। এ পাখি ঘরে রাখলে ঘর আলো হয়ে যাবে।

কিন্তু আমার বাগানে ও এল কী করে?

আর গাছ থেকে উড়ে এসে আমার কাঁধে বসবে কেন এ পাখি?

যাই হোক ইনি আমার পোষা না হলেও, আমার কাছে থাকতে এঁর কোনো আপত্তি হবে বলে মনে হয় না।

আমি ম্যাকাওটিকে কাঁধে নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে এলাম। তারপর আমার ল্যাবরেটরিতেই সেটাকে রাখবার ব্যবস্থা করলাম। ল্যাবরেটরিতেই আমার অধিকাংশ সময় কাটে। পাখিটাকে চোখে চোখে রাখার সুবিধা হবে। একবার মনে হয়েছিল যে আমার ওষুধপত্রের উৎকট গন্ধে হয়তো এর আপত্তি হবে—কিন্তু সে টু শব্দটি করল না।

আমার বেড়াল নিউটন দু'-একবার ফ্যাঁস ফোঁস করেছিল কিন্তু পাখির দিক থেকে কোনো রকম বিরক্তি বা শত্রুতার লক্ষণ না দেখে সে চুপ করে গেল। কিছুদিন পরে হয়তো দেখব পরস্পরের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বই হয়েছে।

সকালে দুটো ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট খেয়েছে পাখিটা। তারপর তার উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করেছি। প্রহ্লাদ প্রথমে যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল তারপর সেও পাখিটাকে মেনে নিয়েছে। আমার বিশ্বাস কয়েক দিনের ভিতর প্রহ্লাদও পাখিটাকে আমার মতন ভালোবেসে ফেলবে। আজ ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে অনেকবার পাখিটার দিকে চোখ পড়ে গেছে। প্রতিবারই দেখেছি সে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। কার পাখি, কোত্থেকে এল কে জানে!

১৯শে জুন

আজ এক অদ্ভুত ঘটনা।

গিনিপিগের খাঁচা থেকে টেবিলে এনে ওষুধের বোতলটি হাত থেকে নামিয়ে রাখছি এমন সময় হেঁড়ে কর্কশ গলায় প্রশ্ন এল—'কী করচ?'

আমি চমকে এদিক ওদিক চেয়ে ম্যাকাওটার দিকে চাইতে সেটার ঠোঁটটা নড়ে উঠল।

'কী কররচ? কী কররচ?

আমি তো অবাক। এ যে কথা বলে।

শুধু কথা নয়। এমন স্পষ্ট কথা আমি পাখির মুখে কখনই শুনিনি।

আমি কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে ম্যাকাওটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর পাখিটার মুখ থেকে একটা শব্দ বেরোল যেটা খ্যাঁক খ্যাঁক হাসি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আমার হাতের বোতলটা হাতেই রয়ে গেল।

তারপর দেখি ম্যাকাওটার ঠোঁট আবার নড়ছে—'ওটা কী? ওটা কী? ওটা কী?'

এবার আমার হাসির পালা। ম্যাকাওটা জানতে চায় বোতলে কী আছে!

আমার হাসি শুনে ম্যাকাও মশাই যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর গলার স্বরটিকে আরেকটু করুণ করে কথা এল—'হাসির কী? হাসির কী? হাসির কী?'

না, এঁকে সিরিয়াসলি না নিলে বোধহয় ইনি অসন্তুষ্ট হবেন। আমি গলাটা খাঁকরে নিয়ে বললাম—'এতে একটা ওষুধ আছে। সেটা যে খাবে সে অদৃশ্য হয়ে যাবে।'

'বটে? বটে?'

'হ্যাঁ। এখন খেলে ঘন্টা পাঁচেকের জন্য অদৃশ্য। অনুপানে তফাত করলে সময় বাড়ানো কমানো যেতে পারে।'

ম্যাকাওটা কিছুক্ষণ চুপ করে একটা শব্দ করল, সেটা ঠিক মানুষের গম্ভীর গলায় 'হু' বলার মতো শোনাল।

তারপর আবার প্রশ্ন এল—'কী ওষুধ? কী ওষুধ?'

আমি কোনোমতে হাসি চেপে বললাম...'এখনও নাম দিইনি। কী কী মিশিয়ে তৈরি সেটা বলতে পার। এক্সট্রাক্ট অফ পরগনাসস, প্যারানইয়াম পোটেশটেট, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, বাবুইয়ের ডিম, গাঁদালের রস আর টিনচার আয়োডিন।'

ম্যাকাও এবার চুপ। দেখলাম সে একদৃষ্টে ল্যাবরেটরির মেঝের দিকে চেয়ে আছে। আমি এবার বললাম, 'তুমি এমন আশ্চর্য কথা বলতে শিখলে কী করে?

ম্যাকাও নির্বাক।

আমি আবার বললাম, 'কী করে শিখলে?'

একবার মনে হল ম্যাকাওর ঠোঁটটা নড়ে উঠল। কিন্তু কথা বেরোল না। পড়ে পাওয়া এই বিচিত্র পাখি যে আবার কথা বলতে পারবে এ তো ভাবাই যায়নি। এটা একেবারে ফাউ।

২৪ শে জুন

আজ এই আধঘন্টা আগে, রাতের খাওয়া শেষ করে ল্যাবরেটরির দিকে যাচ্ছি ঘরটায় তালা দেব বলে এমন সময়ে দরজার মুখটাতে আসতেই একটা বিড়বিড় করে কথা বলার শব্দ পেলাম। এটা ম্যাকাওটারই কথা কিন্তু আস্তে আস্তে চাপা গলায় কথা বলছে সে। আমি পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে কান পাততেই কথাটা স্পষ্ট হয়ে এল।

'এক্সট্রাক্ট অফ গরগনাসস, প্যারানইয়াম পোটেনটেট, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, বাবুইয়ের ডিম, গাঁদালের রস, টিনচার আয়োডিন'—, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দশবার এই নামের আবৃত্তি শুনে তারপর গলা খাঁকরিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে বললাম, 'গুড নাইট!'

ম্যাকাও তার আবৃত্তি থামিয়ে কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'বুয়েনা নোচে'। অর্থাৎ গুড নাইটের স্প্যানিশ অনুবাদ।

এর আদি বাসস্থান যে সত্যিই দক্ষিণ আমেরিকা সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না। ল্যাবরেটরিতে যখন তালা লাগাচ্ছি তখন শুনতে পেলাম আবার আবৃত্তি শুরু হয়েছে।

আমি এই অত্যাশ্চর্য পাখির বাকশক্তি আর স্মরণশক্তির কথা ভাবতে ভাবতে ওপরে চলে এলাম।

২১শে জুন

আজ বড়ো দুঃখের দিন।

আমার প্রিয় ম্যাকাও পাখিটি উধাও হয়েছেন। উধাও মানে অদৃশ্য নয়। অর্থাৎ আমি তার ওপর কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিনি। সে সত্যি সত্যিই কোথায় যেন চলে গেছে। এটা তার হঠা আবির্ভাবের মতোই রহস্যজনক।

সকালে ল্যাবরেটরির দরজা খুলে দেখি উত্তর দিকের জানালার পাশে রাখা লোহার দাঁড়টা খালি। পাখিটার ওপর আমার এতই বিশ্বাস ছিল যে তাকে চেন দিয়ে বেঁধেও রাখিনি।

আমার স্পষ্ট মনে আছে যে জানলাটায় আমি নিজের হাতে ছিটকিনি লাগিয়েছিলাম। এখন দেখি জানালাটা খোলা। গরাদের ফাঁক দিয়ে কসরাত করে বেরিয়ে যাওয়া পাখিটার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু ছিটকিনি খুলল কে? তা হলে কি ম্যাকাও-বাবাজি তাঁর বিরাট ঠোঁট দিয়ে নিজেই এ কর্ম করেছেন? কিন্তু এত পোষা পাখি, খাদ্য বা যত্নেরও তো কোনো অভাব ছিল না—সে পাখি পালাবে কেন?

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল! একটা টকটকে লাল পালক পড়েছিল জানালাটার কাছে মেঝেতে। আমি সেটাকে যত্ন করে তুলে রেখে দিলাম। তার পরে ল্যাবরেটরি বন্ধ করে দোতলায় এসে চুপ করে শোবার ঘরের জানালার ধারে আমার বেতের চেয়ারটায় বসে রইলাম।

বিকেলে আমার প্রতিবেশী অবিনাশবাবু এসেছিলেন। চা খেতে খেতে এমন বকবক শুরু করলেন যে একবার ইচ্ছে হল আর এক পেয়ালা চা অফার করে তার সঙ্গে একটু নতুন ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে তাঁকে একটু শিক্ষা দিই। কিন্তু সেটার আর প্রয়োজন হল না।

ভদ্রলোক যেন আমার মেজাজের কথা অনুমান করে নিজেই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

শুধু পাখির রহস্যের সমাধান হল না বলে নয় পাখিটার ওপর সত্যিই মায়া পড়েছিল—তাই আমার মনের এই অবস্থা।

কাল থেকে আবার ওষুধটা নিয়ে পড়তে হবে। আমি জানি একমাত্র কাজই আমার এই বন্ধু-বিচ্ছেদের দুঃখ ভুলতে সাহায্য করবে।

২১ শে জুলাই

আজকের ঘটনা যেমনই রোমাঞ্চকর তেমনই অবিশ্বাস্য। ক'জন বৈজ্ঞানিকের জীবনে এমন সব চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটেছে জানতে ইচ্ছা করে।

ক'দিন থেকেই বৃষ্টি হবার ফলে একটু ঠান্ডা পড়েছিল। উশ্রীর ধারে সকালটায় বেশ আরাম বোধ করেছিলাম, তাই বোধ হয় বেড়ানোর মাত্রাটা আজ একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি যখন ফিরছি তখন প্রায় সাতটা বাজে। প্রহ্লাদের তখনও বাজার থেকে ফেরার কথা নয়। তাই বাড়ির কাছাকাছি এসে সদর দরজাটা খোলা দেখে মনে কেমন জানি খটকা লাগল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়েই বুঝতে পারলাম যে তালাটা স্বাভাবিক ভাবে খোলা হয়নি। কোনো বৈজ্ঞানিক উপায়ে উত্তাপের সাহায্যে গলিয়ে সেটাকে খোলা হয়েছে।

আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

দৌড়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল নিউটনকে। সে বৈঠকখানার এক কোণে শজারুর মতো লোম খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে।

নিউটনের এমন সন্ত্রস্ত ভাব আমি আর কোনোদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

আবার একটা শব্দ শুনলাম আমার ল্যাবরেটরির দিক থেকে। কে যেন আমার জিনিসপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে।

আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলাম। আমার ফ্লাস্ক, রিটর্ট, টেস্ট টিউব ইত্যাদি গবেষণার যাবতীয় সরঞ্জাম সব চারদিকে ছড়ান, আলমারি খোলা, বইপত্তর সব ধুলোয় লুটোপুটি, ওষুধের বোতল খোলা অবস্থায় টেবিলে পড়ে তাঁর থেকে ওষুধ বেরিয়ে টেবিলের গা বেয়ে চুঁইয়ে টপটপ করে মেঝেতে পড়ছে।

পরমুহূর্তেই আর একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। আমার এক গোছা নোটস-এর খাতা শূন্যে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে করতে হঠাৎ জানালার দিকে উড়ে গেল।

জানালার শিকগুলোকে দেখি গলিয়ে খুলে ফেলা হয়েছে। আমি কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব থেকে তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়ে একলাফে আমার জিনিসপত্র ডিঙিয়ে জানালার কাছে গিয়ে আমার খাতাগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

তারপর এক বিচিত্র যুদ্ধ। কোনো এক অদৃশ্য ডাকাতের সঙ্গে চলল আমার ধস্তাধস্তি! লোকটা তেমন জোয়ান নয়। সে অদৃশ্য হওয়াতে তার সঙ্গে যুঝতে আমার বেশ বেগ পেতে হল। কিন্তু আমিও ছাড়বার পাত্র নই। ওই খাতাগুলিই আমার প্রাণ। ওতে রয়েছে আমার চল্লিশ বছরের বৈজ্ঞানিক জীবনের সমস্ত ফলাফল। মরিয়া হয়ে শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করে বেপরোয়া কিল ঘুঁসি লাথি মেরে খাতাগুলো উদ্ধার করবার

পরমুহূর্তেই লোকটা জানালা টপকিয়ে বাইরের বাগানে গিয়ে পড়ল। আমি কোনোমতে জানালার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি বাগানের ঘাসের ওপর দিয়ে একটা পায়ের ছাপ পাঁচিলের দিকে এগিয়ে চলেছে।

তারপর কানে এল এক পরিচিত পাখির কর্কশ কণ্ঠস্বর ও ডানার ঝটপটানি।

পূর্বদিকের পাঁচিল বেয়ে উঠে তখন লোকটা পালাবার চেষ্টা করছে। কারণ পাঁচিলের গায়ের ফাটল থেকে যে অশ্বত্থের চারা বেরিয়েছিল সেটা চোখের সামনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আর সেই সময়ে শুনলাম এক মানুষের গলার আর্তনাদ।

এ গলা আমার চেনা গলা।

এ গলা প্রোফেসর গজানন তরফদারের।

অদৃশ্য ম্যাকাও অদৃশ্য প্রোফেসরকে আক্রমণ করেছে।

পাঁচিলের গা বেয়ে রক্তের ধারা নেমে আসছে বাগানের ঘাসের দিকে।

তারপর শব্দ হল—ধুপ।

প্রোফেসর তরফদার পাঁচিল টপকিয়ে ওপাশের জমিতে পড়েছেন।

তারপর সব শেষে পলায়মান পায়ের শব্দ।

আমি জানালার পাশের চেয়ারটায় ক্লান্তভাবে বসে পড়লাম।

বুকে হাত দিয়ে বুঝলাম হৃৎস্পন্দন রীতিমতো বেড়ে গেছে।

এই বারে একটা ঠং শব্দ শুনে মাথা তুলে দেখি ম্যাকাও-এর দাঁড়টা ঈষৎ কম্পমান।

বাবাজি ফিরে এসেছেন!

'বুয়েনা দিয়া! বুয়েনা দিয়া!'

আমি ইংরেজিতে উত্তর দিলাম, 'গুড মর্নিং! ব্যাপার কী?'

'ফিরেচি! ফিরেচি!'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি, থুড়ি, শুনতে পাচ্ছি!'

'চোর, চোর! জোচ্চার, জোচ্চোর, জোচ্চোর!'

'কে?'

'তররফদারর!'

'তাকে তুমি চিনলে কী ভাবে?'

ম্যাকাও যা বলল তাতে এক আশ্চর্য কাহিনি প্রকাশ পেল।

তরফদার গিয়েছিলেন ব্রেজিলে বছরখানেক আগে। সেখানে এক সার্কাস থেকে এই পাখিটি তিনি নিয়ে আসেন, তাও চুরি করে। সতেরোটি বিদেশি ভাষা জানা, অলৌকিক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন এই ম্যাকাওটিকে নিয়ে সেই সার্কাসে খেলা দেখাত এক বাজিকর। কাজেই তার বুদ্ধি ও বাকশক্তির ব্যাপারে তরফদারের কোনো কৃতিত্ব নেই।

যদিও ম্যাকাও বাংলা শিখেছে তরফদারের কাছেই।

তরফদার পাখিটিকে আমার গোলঞ্চগাছের ডালে রেখে যান যাতে সে আমার সঙ্গে থেকে, আমার ফরমুলা সংগ্রহ করে, তারপর তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সেই ফরমুলা বলে দেয়।

অদৃশ্য হবার ওষুধের উপাদানগুলি ম্যাকাওটির কাছ থেকে জেনে নিয়ে তারপর তাই দিয়ে দশ ঘন্টা অদৃশ্য থাকবার মতো একটা মিক্সচার তৈরি করে সেটা পান করে তরফদার নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলেন।

সেই সময় ম্যাকাওটি তরফদারের হাবভাব লক্ষ করে বুঝতে পারে যে এবার তিনি তাঁর পোষা পাখিটিকে হত্যা করবার ফন্দি করেছেন। কারণ তাঁর হয়তো ভয় হয়েছে যে পাখিটি ভবিষ্যতে অন্য কোনো বৈজ্ঞানিকের কাছে ফরমুলাটি ফাঁস করে দিতে পারে। অদৃশ্য তরফদারের আলমারি খুলে যখন তার ভেতর

থেকে বন্দুক এবং টোটা বেরিয়ে আসে সেই সময় ম্যাকাওটি আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় না দেখে ঠোঁটের কামড়ে ওষুধের বোতলটি খুলে ফেলে ঢক ঢক করে খানিকটা ওষুধ গিলে ফেলে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তরফদার এদিক ওদিক গুলি চালিয়ে ঘরের দেওয়াল ক্ষতবিক্ষত করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি। তারপর সেই অদৃশ্য অবস্থাতেই গাড়ি চালিয়ে তরফদার হাজারিবাগ থেকে গিরিডি চলে আসেন। গাড়ির পিছনের সিটেই যে ম্যাকাওটি বসেছিল তিনি টেরই পাননি।

গিরিডি পৌঁছে গাড়িটাকে একটু দূরে রেখে দিয়ে শেষ রাত্তির থেকে আমার বাড়ির কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে ওত পেতে বসে থাকা এবং আমি ও প্রহ্লাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে ডাকাতির তোড়জোড়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—'ডাকাতির সময়ে তুমি কোথায় ছিলে?'

'বাইরে, বাইরে। তোমার গাছে।'

'তারপর?'

'ও বেরোলেই ধরলাম। চোর চোর, জোচ্চোর জোচ্চোর।'

'আর আমি?'

'ভালো, ভালো। এখানেই থাকব।'

'বেশ তো, থাকো না। আর কোনোও বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে দোস্তি নেই তো? আমার ফরমুলা অন্যের কাছে পৌঁছবে না তো?'

ম্যাকাও আবার সেইভাবে অট্টহাস্য করল।

জিজ্ঞেস করলাম—'ওষুধ কটায় খেয়েছ?'

'রাত দশটা।'

'বটে এখন তো আটটা বাজে। দশ ঘন্টা তো হয়ে এল।'

'তা তো বটেই! হ্যাঃ, হ্যাঃ, হ্যাঃ হ্যাঃ!'

সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম আমার ঘরটা আস্তে আস্তে আলো হয়ে উঠল। সূর্যের আলো নয়, ম্যাকাওর বহুবিচিত্র পালকের চোখ ঝলসানো রং-এর আলোয় আমার ল্যাবরেটরির চেহারা ফিরে এল।

আমি আমার খাতাগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে ম্যাকাওটার মাথায় হাত বুলিয়ে বললুম 'থ্যাঙ্ক ইউ!'

ম্যাকাও বলল, 'গ্রাসিয়া, গ্রাসিয়া!'

সোনোরানের বিষ-ব্যাং

রাজেশ বসু

বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় গৌরদাদু বারণ করেছিলেন। 'আজ আর বেরসনি রূপু। আকাশে গতিক সুবিধের না। মেঘ করেছে খুব। ঝড়বাদলে পড়বি।' তা রূপু শুনলে তো। দাদুর নড়বড়ে সাইকেলটা নিয়ে 'বেশি দূরে যাব না' বলে বেরিয়ে পড়েছিল। আসলে কলকাতা থেকে এখানে এসে এত ভালো লেগে গিয়েছে রূপুর। কী সুন্দর শান্ত সবুজ জায়গা কত গাছপালা, পুকুর, পাখি, মিষ্টি ঠান্ডা বাতাস। শরীরমন জুড়িয়ে যায় একদম।

সত্যি কী বুদ্ধি করে গৌরদাদু এখানে বাড়ি করেছিলেন। গৌরদাদু আসলে রূপুর বাবার কাকা। কলকাতায় চাকরি করলেও বাড়ি করেননি সেখানে। অবসরের পর এই গ্রামে এসে বাড়ি করেছেন। দুটি মাত্র মানুষ। গৌরদাদু আর তার খুড়তুতো বোন মিমিপিসি। ভাইবোনে কেউ বিয়ে-থা করেননি। পিসিও চাকরি করতেন। দাদু বাড়ি করার পর চাকরি ছেড়ে দাদার কাছেই চলে এসেছেন। দুর্দান্ত রান্না করেন পিসি। একবার খেলে জিভে আর আঙুলে তার স্বাদ আর গন্ধ থেকে যাবে বহুদিন। স্বভাবতই খুব আনন্দ রূপুর। ভাগ্যিস এসেছিল এখানে। আসলে গরমের ছুটিতে এবার গ্যাংটকে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাবার অফিসে কাজ পড়ে যাওয়াতে সে পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেল। এমনসময় গৌরদাদুর চিঠি এসে হাজির। দাদুর নতুন বাড়িতে ওরা যদি ক'দিন কাটিয়ে যায় এসে। বাবা তো আসতে পারবেন না। শেষে মা-বাবা এসে দু'সপ্তাহের জন্যে রেখে গিয়েছেন ওকে।

এই ক'দিনে গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়ে গিয়েছে রূপুর। তাদের সঙ্গে দল বেঁধে ফুটবল কাবাডি সব চলছে চুটিয়ে। আজও রূপু ঠিক করেছিল মিঞাপুরের মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলবে জমিয়ে। মাঠটা রূপুদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে। জোর প্যাডেলে সাইকেল চালাচ্ছিল ও। তখনই বিপদটা ঘটল। দাদুর কথা সত্যি করে হঠাৎই ঝড় উঠল দাপিয়ে। সেই সঙ্গে ম্যাজিকের মতো বিকেল সাড়ে চারটেতেই যেন সন্ধে সাড়ে-ছটার অন্ধকার নেমে এল হঠাৎ। পঞ্চুকাকার মুদির দোকানের সামনে কমলকে দেখে থামল রূপু। ওও রূপুর সঙ্গে খেলে। ওরই বয়সি। পড়েও এক ক্লাসে। নাইনে।

কমল বলল, 'কোথায় যাচ্ছ রূপু? জানো না আজ খেলা হবে না। বল ফেটে গেছে।'

'এ বাবা।' বলল রূপু, 'আর বল নেই?'

'না। ওটাই জুড়তে হবে। তবে আকাশের যা অবস্থা। বল জুড়তে কাউকে পেলে হয়। তার চেয়ে একটা কাজ করা যাক, জলপিড়ির চরে যাই। এ সময়ে অনেক কাঁকড়া ওঠে। ধরি গিয়ে।'

কথাটা শুনেই রোমাঞ্চ হল রূপুর। ধরবে কী করে, আনবেও বা কীসে? কমলকে বলতে সে বলল, 'তুমি চল না। দেখবে গিয়ে। চটের একটা থলি না হয় নিয়ে নিচ্ছি পঞ্চুকাকুর দোকান থেকে।'

দু' একটি ফোঁটা করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তবু ব্যাপারটায় এত উত্তেজনা আছে, রূপু রাজি হয়ে গেল। আসলে সত্যি বলতে ওর নিজেরও এখন একটুও বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। চুপ্পুস হয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করছে। কলকাতায় বৃষ্টিতে ভেজার কথা ভাবতেই পারে না একদম। একটু বৃষ্টির জল গায়ে লেগেছে কি মায়ের বকুনি 'জল গায়ে লাগিও না রূপু, ঠান্ডা লেগে যাবে। সামনে ইউনিট টেস্ট।'

এখানে এই মুহূর্তে বারণ করার কেউ নেই। পঞ্চুকাকার দোকান থেকে একটি পুরনো চটের ব্যাগ চেয়ে নিয়ে কমলকে সাইকেলের কেরিয়ারে বসিয়ে জোরে প্যাডেল করতে শুরু করল রূপু। জলপিড়ির চরে এর আগে একবারই এসেছে ও। একটু দূর বটে। গ্রামের একদম শেষ সীমানায়। নদীর ওপারে হদিসপুরের

জঙ্গল। গৌরদাদুর সঙ্গেই এসেছিল রূপু। বেশ নিঝুম জায়গা। কাছেপিঠে জনবসতিও নেই খুব একটা। বাড়ি বলতে দেড়শো বছরের পুরনো সিংহনিবাস। হদিশপুরের জমিদার হর্ষক্ষপ্রসাদ সিংহ ছিলেন সে বাড়ির মালিক। তিনি গত হয়েছেন অনেককাল। বংশধর যা ছিল গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছ শহরে। শরিকি সম্পত্তির জন্য রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি মোটেই। হানাবাড়ি হয়ে পড়েই ছিল। শেষে বছরটাক আগে বর্তমান মালিকেরা বাড়িখানি বিক্রি করে দেন। গোলোকবিহারী সামন্ত নামে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাড়িটি কেনেন। এ তল্লাটে সকলেই বলে গোলোকবাবু লোকটিও নাকি বেশ খ্যাপাটে গোছের। দিনের বেলা ঘুমোন। আর সারা রাত জেগে কাজ করেন। কাজ বলতে গবেষণা। ভদ্রলোক নাকি বিজ্ঞানী। বহুদিন বিদেশে ছিলেন। বিজ্ঞানের নানান বিষয়ে অগাধ জ্ঞান। নির্বিঘ্নে গবেষণা করতে এই গ্রামে বাড়ি করে চলে এসেছেন। দেশি-বিদেশি পাঁচরকম পত্র-পত্রিকা আসে তার বাড়ির ঠিকানায়। সত্যি কথা বলতে কী, অখ্যাত এই গ্রামটি তাঁর কারণেই যেন বাইরের লোকজনের নজরে এসেছে খানিক।

জলপিড়ি নদীর কাছাকাছি হতে কাণ্ডটা ঘটল। বৃষ্টি যেমন নামল হুড়মুড়িয়ে তেমনি ফটাস শব্দে রূপুদের সাইকেলের টিউবটিও ফাটল সময় বুঝে। সেইসঙ্গে শুরু হল কড়কড় বাজের আওয়াজ। এমন অবস্থায় খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা মানে ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনা। সাইকেল হাতে নিয়েই ছুটতে শুরু করল দুই বন্ধু। একটু এগোতে গাছগাছালি ঘেরা সিংহনিবাস। দু'তলা বাড়িটিকে খানিক মেরামত করে নিয়েছেন ভদ্রলোক। ভাঙা পাঁচিল জুড়েছেন। আগাছা ঝোঁপঝাড় সাফসুতড়ো করেছেন। দেওয়ালের প্রাচীন পলেস্তারা খসিয়ে নতুন প্লাস্টার করেছেন। ভাঙা দরজা জানালাগুলি বদলিয়েছেন। কেবল লোহার ফটকটিকে এখনও সারাননি। আধভাঙা হয়েই পড়ে আছে। সেই ভাঙা ফটক দিয়ে রূপুরা ঢুকে পড়ল সিংহনিবাসে। পাঁচধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল বারান্দায়। সাইকেলটিও তুলে ফেলেছে। ঠেস দিয়ে রেখেছে দেওয়ালে। মাথার ওপরে বারান্দার ছাত আছে বটে। কিন্তু দমকা বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ছাঁট চাবুকের মতো এসে লাগছে চোখেমুখে।

কমল বলল, 'কী বিপদে পড়লাম বল তো, তোমার দাদু নিশ্চয় খুব চিন্তা করছেন।'

দাদুর কথা ভেবে রূপু একটু শঙ্কিত ঠিকই। বাড়ি ফিরলে বকবেন খুব। দাদুর কথার অবাধ্য হয়েছে সে। তবে এই মুহূর্তে ওর কিন্তু দারুণ লাগছে। দুমদাম বাজ পড়ছে বলে বৃষ্টিতে ভেজা হল না বটে, তবে প্রকৃতির এমন উথাল-পাথাল তাণ্ডবময় রূপ গোটা শরীর দিয়ে উপলব্ধি করার মজাই আলাদা। সে কথাই বলতে যাবে, এমন সময় দুড়ুম করে সাইকেলটা উলটে পড়ল শানবাঁধানো মেঝেয়। আর তার একটু পরেই কি আশ্চর্য, খটাস করে খুলে গেল বারান্দার দরজাটা। ভিতরের নরম সাদা আলো এসে পড়ল ওদের ওপর।

দরজায় একটি অদ্ভুতদর্শন লোক। পাঁশুটে মতো গায়ের রং। ঢিপির ফুলে ওঠা চোখে পাতা। ঠোঁটদুটি এত বড়ো যে প্রায় কান ছুঁয়ে ফেলে আরকি। খালি গায়ে অসংখ্য ছোটোবড়ো আঁচিল। পোশাক বলতে শুধু একটি কালো রঙের বারমুডা। সবচেয়ে যেটা চোখে লাগছে, তা হল লোকটির অস্বাভাবিক লম্বা পা। পুরোপুরি

সোজা না হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁটু মুড়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে সে। ওদেরকে দেখে গোঁক-গোঁক আওয়াজে কী একটা বলল। বোঝা গেল না ঠিক।

কমল বলল, 'রূপু চল এখান থেকে চলে যাই। লোকটা আমাদের পছন্দ করছে না মনে হচ্ছে।'

কথাটা ঠিকই। লোকটির চোখমুখের হাবভাবে তাইই মনে হয়। রূপুর যদিও যেতে ইচ্ছে করছে না। গোলোকবিহারীবাবুর কথা ইতিমধ্যেই অনেকের কাছে শুনেছে ও। একজন বিজ্ঞানীকে কাজ থেকে দেখতে ইচ্ছে করছে খুব। কমলকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ও, 'ইনিই গোলোকবাবু?'

'না রে।' বলল কমল, 'তাকে আমি চিনি। হপ্তায় একদিন করে সজনেতলার হাটে আসেন। গোটা হপ্তার বাজার নিয়ে যান ওই দিনে। ইয়া লম্বা। দুধের মতো গায়ের রং, মুখভরতি সাদা দাড়ি...' —কমলকে থামতে হল। কারণ খালি গা লোকটির ঠিক পিছনে সাদাকালো ডোরাকাটা হাউজকোট পরা যিনি এসে দাঁড়িয়েছেন তিনিও একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি, মুখভরতি সাদা দাড়ি। লম্বা কাচাপাঁকা চুল। টিকোলো নাক। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। বলা বাহুল্য ইনিই এই বাড়ির বর্তমান মালিক বিজ্ঞানী গোলোকবিহারী সামন্ত।

'টোডি ভিতরে যাও তুমি।' গম্ভীর গলায় হুকুম দিলেন তিনি। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে বেশ মিহি স্বরে বললেন 'আয় আয়, এই দুর্যোগে বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?'

কমল ইতস্তত করছিল। গাঁয়ের লোকের কাছে সুনাম নেই গোলোকবিহারীর। দাম্ভিক অহংকারী মানুষ। কারও সঙ্গে মেশেন না। কমল জানত একাই থাকেন, এখন দেখছে আর একজন কাজের লোকও আছে।

'কী হল? ভাবছিস কী? ঢুকে পড়, কী নাম তোদের?' তাড়া দিলেন গোলোকবিহারীবাবু। নাম বলে আমতা-আমতা পায়ে ঘরে ঢুকল ওরা।

বেশ বড়োসড়ো ঘর। সুন্দর করে সাজান। বাড়ি পুরনো বলেই হয়তো সাবেকি আমলের আসবাবপত্রে সাজানো হয়েছে ঘরটি। মখমলে ঢাকার সোফার মতো দেখতে একটি বড়ো আরামকেদারায় বসল দু'জন। সামনে একটি কাঠের কারুকার্য করা গোলটেবিল। সেটার উলটোদিকের সোফায় বসলেন গোলোকবিহারীবাবু। এতবড় ঘরে একটিমাত্র ঠোটর টিউবলাইট জ্বলছে। আলো তাই একটু কম কম। গোলকবিহারীবাবু বললেন, 'বল এবার তোদের কথা? কে কোন ক্লাসে পড়িস?'

কমল একদম চুপ হয়ে গিয়েছে। রূপু বলল, 'আমরা দুজনেই নাইনে পড়ি।'

'বা বা, বেশ বেশ, কোন স্কুলে?'

স্কুলের নাম বলতে গিয়ে রূপুকে জানাতে হল ও এখানে বেড়াতে এসেছে। ওর স্কুল কলকাতায়। গোলোকবিহারী বললেন 'বেশ বেশ।' তারপর একটু গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতে শুরু করলেন। বাইরে ঝড়বাদলের আওয়াজ একটু কমে এসেছে মনে হচ্ছে। অবশ্য দরজা বন্ধ করে দেওয়াতেও শব্দ কম মনে হতে পারে। রূপুর খুব ইচ্ছে করছে গোলোকবিহারীবাবু কী গবেষণা করছেন জানতে।

গোলোকবিহারীবাবু বললেন, 'চা কফি খাস তো? আলুর চপ বেগুনি পেঁয়াজি এসব? আজকালকার ছেলেদের তো আবার এসব সেকেলে বাঙালি খাবার চলে না। বিশেষ করে রূপুর মতো যারা শহরে থাকে।'

রূপু বলে উঠল, 'মোটেই না। বেগুনি পেঁয়াজি আমিও ভালোবাসি। চা কফিও খাই মাঝে-মাঝে।'

'বটে, দাঁড়া টোডিকে ডাকি তবে। বলে দিই জিনিসগুলো চটপট বানিয়ে ফেলতে। দারুণ হাত ওর। নাইনটিন সেভেনটিথ্রি-তে তিনমাস কোস্টারিকা ছিলাম। তখনই ওকে দেখি। আসল নাম ছিল কারাজো। সে নামেও ডাকি কখনো-সখনো। তা আমার সব 'কার্য'-ই তো করে ও।' ঝকঝকে দাঁত বের করে হেসে নিলেন গোলোকবিহারীবাবু। দাড়িগোঁফ চুলের বেশিরভাগ সাদা হলেও চামড়া যথেষ্টই টানটান। বয়স বোঝা যায় না ঠিক। এখন সাজানো দুপাটি দাঁত দেখে মনে হচ্ছে বয়সটা তেমন বেশি নয় হয়তো। কিন্তু বলছেন সেভেনটিথ্রিতে কোস্টারিকা ছিলেন!

'টোডি অনাথ ছিল। যখন ওকে সঙ্গে নিই, তখন ওর মোটে ছ'-সাত বছর বয়স। তখনি কী শক্তি গায়ে। আসলে এমনিতেই মুল্যাটোরা শক্ত-সমর্থ হয়। মুল্যাটো কারা জানিস তো?'

'জানি।' বলল রূপু, 'বাবা মায়ের মধ্যে একজন যদি শ্বেতাঙ্গ আর অন্যজন কৃষ্ণাঙ্গ হয়।

'গুড। গুড। আজকালকার ছেলেরা জানে অনেক কিছু।'

কমল চুপ করে শুনছিল। হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা ও কি কথা বলে না? মানে বাংলা জানে ও?'

'তেরটা ভাষা জানে ও। ইদানীং একটু অসুবিধায় আছে বলে বলতে পারে না। সে অন্য কথা। দাঁড়া ডাকি ওকে।'

'টোডি' বলে হাঁক দিলেন গেলোকবিহারীবাবু। একডাকেই ঘরে ঢুকল সে। অবশ্য একডাকে না বলে বলা যায়, একলাফে। লোকটির হাঁটাচলাও কেমন অদ্ভুতরকম। লাফ দিয়ে দিয়ে চলে যেন। রূপু জিজ্ঞেস করেই ফেলল, 'ওর কি কোনো শারীরিক অসুবিধা আছে?'

'জন্মগত নানান অসুবিধা ছিল ওর। আমি তো তাও চিকিৎসা করে অনেকটা সারিয়ে এনেছি।'

কমল বলল, 'আপনি কি ডাক্তার? সবাই বলে যে সায়িন্টিস্ট—'

'কেন ডাক্তাররা কি সায়িন্টিস্ট নয়? আরে বোকা যারাই সায়েন্স নিয়ে পড়ে আছে তারাই সায়িন্টিস্ট। তবে লোকে আমাকে কী বলে জানি না, কেবল বলতে পারি, বাষট্টি বছর ধরে বিজ্ঞান নিয়ে আছি। একসময় বিজ্ঞানের টানেই এ দেশ ছেড়েছিলাম। ফিরেও এসেছি আবার। যাকগে, টোডি খাবার বানাক, চল এই ফাঁকে আমার ল্যাবটা দেখিয়ে আনি তোদের।'

কমল বলল, 'বরং আমরা এবার যাই। অনেকটা রাস্তা চলে এসেছি। সাইকেলের টিউব ফেটেছে। হেঁটে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। বাড়িতে বকবে।'

'টিউব টোডি জুড়ে দেবে। চিন্তা করতে হবে না।' উঠে দাঁড়িয়েছেন গোলোকবিহারীবাবু। 'একবার এসেই পড়েছিস যখন দেখে যা অ্যাদ্দিনে কী করলাম আমি।'

কমলের ইচ্ছে নেই। ফিসফিস করে রূপুকে বলল, 'চলে গেলেই ভালো হত রে।'

'চল না। সাইকেল তো টোডি সারিয়ে দেবে। জোর প্যাডেলে চালিয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব।'

'আয় আয় দেরি করিস না।' ভিতরের ঘরে যাওয়ার দরজায় গিয়ে হাঁক দিলেন গোলোকবিহারীবাবু।

এ ঘরটিও বড়ো। একটিমাত্র রিডিংলাইট জ্বলছে কোণার একটি টেবিলে। তবু তাতেই বোঝা যাচ্ছে ঘর জুড়ে নানারকমের এবং নানান ধরনের গবেষণার জিনিসপত্রে ভরতি। এছাড়া রয়েছে দেওয়াল জুড়ে বইয়ের তাক। এবং সেগুলির সবকটিই মোটা মোটা বইয়ে ঠাসা। ঘরের মেঝেতেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য বই, ম্যাগাজিন, চিঠিপত্র। ঘরের ডানদিকে আর একটি দরজা। তার মুখেই দু'তলায় ওঠার কাঠের সিড়ি। সেই সিড়ি দিয়ে দু'তলায় উঠে এল ওরা। সামনে ছোটো প্যাসেজ। দুদিকে পরপর ঘর। সবকটিরই দরজা বন্ধ। গোলোকবিহারীবাবু ডানহাতে হাউজকোটের পকেট হাতড়ে একগোছা চাবি বের করলেন। তালাখুলে ডানহাতের প্রথম ঘরটিতে ঢুকলেন তিনি। পিছনে রূপু আর কমল। সুইচ টিপে লাইট জ্বালাতে নরম সাদা আলোয় ভরে উঠল গোটা ঘর।

বিকার টেস্টটিউব বুনসেন বার্নারের মতো কেমন অ্যাপারাটাস তো আছেই, এছাড়াও এমনসব যন্ত্রপাতি আছে যা এই প্রথম দেখছে রূপু। গোলোকবিহারীবাবু ঠিক কি নিয়ে গবেষণা করছেন বোঝা যাচ্ছে না। তবে যন্ত্রপাতি ছাড়াও ঘরভরতি কাচের জারে নানারকমের প্রাণী দেখা আছে। কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে সাপ ব্যাং পিছে কাঁকড়া কেঁচো কেন্নো গিরগিটি, এরকম প্রাণী তো বটেই, কয়েকটি অদ্ভূত দেখতে গাছ-গাছড়াও রয়েছে। প্রাণীগুলির বেশিরভাগই মৃত। ফরম্যালিন জাতীয় কোনো দ্রবণে চুবিয়ে রাখা হয়েছে। কয়েকটি জীবিত প্রাণীও আছে। এর মধ্যে ব্যাঙের সংখ্যাই বেশি। কোনোটি জ্যান্ত। কোনোটি মৃত। কোনোটি বা সদ্য কাটা হয়েছে। পেট চেরা অবস্থায় পড়ে আছে ডিসেকশন ট্রে-তে। আর ব্যাঙের যে এত রকমের কালার হয়, এই প্রথম দেখছে রূপু। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, সোনালি, বাদামি, কমলা কোনো রংই বাদ নেই। তাদের আকারও বিস্ময়কর। কোনোটি লম্বায় দু'ইঞ্চি তো কোনোটি প্রায় ফুটখানেক।

'অবাক হচ্ছিস তো?' বলে উঠেছেন গোলোকবিহারীবাবু। 'পৃথিবীতে কতরকম প্রজাতির ব্যাং আছে জানিস? সাড়ে-চারহাজারের ওপর। গত চল্লিশবছর ধরে এদের নিয়ে কাজ করছি আমি।—এদিকে আয়,' একটি কাচের জারের কাছে সরে এলেন তিনি, নীলরঙের একটি ব্যাং দ্রবণে চোবানো আছে সেটিতে, 'এটা হল পয়জন অ্যারো ফ্রগ। সেন্ট্রাল আর সাউথ আমেরিকার রেনফরেস্টে পাবি। এদের চামড়ায় আছে মারাত্মক বিষ। আদিবাসীরা এই ব্যাং ধরে তিরের ফলাটা ঘসে নেয় এদের চামড়ায়। তারপর বিষাক্ত সেই তির দিয়ে শিকার করে পশুপাখি। আমি জ্যান্ত এনেছিলাম। বাঁচল না। এখানকার কীটপতঙ্গ পছন্দ হচ্ছিল না মনে হয়। না খেয়েই মারা গেল।'

রূপু আর কমল অবাক হয়ে শুনছে। দেখছে। কমল বলল, 'পোকামাকড় ছাড়া অন্য কিছু দিতে পারতেন।'

হেসে উঠলেন গোলোকবিহারীবাবু। 'অন্য কী? সুক্তো? না মোচার ঘন্ট? জানিস না ব্যাঙেরা নিরামিষ পছন্দ করে না। পৃথিবীর প্রায় সব প্রজাতির ব্যাংই মাংসাসি। বড়ো অদ্ভুত প্রাণী রে এরা। জল অব্দি খায় না।'

রূপু বলে উঠল, 'জল আলাদা করে খাবে কেন? ওদের স্কিনটাই পারমিয়াবল। চামড়া দিয়েই জল সরাসরি ওদের শরীরে ঢুকে যায় বলে আলাদা করে জল খাওয়ার দরকার পড়ে না। এমনকী শ্বাস-প্রশ্বাসও ওরা চামড়া দিয়েই করে।'

'বা বা। ভেরি গুড। অনেক কিছু জানিস দেখছি তুই।' রূপুর পিঠ চাপড়ে বললেন গোলোকবিহারীবাবু। কমল বলল 'আমিও জানি।'

'জানবি না কেন, আয় আর একটা ব্যাং দেখাই,' বলে সেই একফুট মতো লম্বা ব্যাংটির দিকে আঙুল দেখলেন তিনি। এটিও বড়ো একটি কাচের পাত্রে তরল দ্রবণে রাখা। গায়ের রং বাদামি মতো। 'গোলায়েথ ফ্রগ। বৈজ্ঞানিক নাম conraua goliath, পশ্চিম আফ্রিকার ক্যামেরুন থেকে এনেছিলাম। লার্জেস্ট ফ্রগ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তিনকিলো ওজন হয়েছিল যখন মারা গেল।'

'আপনি কি ব্যাঙের ওপরে গবেষণা করছেন?' কমল হঠাৎ বলল।

'বলতে পারিস।' বললেন গোলোকবিহারীবাবু, 'আমার উদ্দেশ্য হল উন্নতমানের প্রাণ সৃষ্টি করা। যা পৃথিবীর সবরকম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে পারবে। প্রতিটি জীবের মধ্যেই প্রকৃতি কিছু না কিছু বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে। জীবদেহের জিনের মধ্যে লুকিয়ে আছে সেসব। এ ব্যাপারে আমি যা করেছি জানবি কোনো লালমুখো নোবেল-পাওয়া সাহেব তা কল্পনাও করতে পারবে না।'

রূপু বলল, 'জিন ট্রান্সপ্ল্যান্ট, মানে জিনের প্রতিস্থাপন?'

'ঠিক তাই।' বললেন গোলোকবিহারীবাবু, 'তোরা জানিস তো জিন কাকে বলে?'

জিন কী জানবে না ওরা। জীববৈশিষ্ট্যের ক্ষুদ্রতম একক। জীববিজ্ঞানের বইয়ে অনেক কথাই বলা হয়েছে জিন নিয়ে। গড়গড় করে অনেকটা বলে ফেলল দু'জন।

এমনসময় পিছন থেকে গোঁক-গোঁক আওয়াজ। টোডি। ইশারাতে যা বোঝাল খাবার রেডি। গোলোকবিহারীবাবু বললেন, 'তোরা একটু দাঁড়া। আমি আসছি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। রূপু দেখল হাউজকোটের পকেট থেকে মোবাইল বের করছেন। ফোন এসেছে কারও। ভাইরেশন মোডে ছিল বলে রূপুরা শুনতে পায়নি। রূপু লক্ষ করল গোলোকবিহারীবাবুর মুখের সৌম্যভাবটা হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। চোয়ালটোয়াল শক্ত হয়ে মুখটা কেমন কঠিন হয়ে পড়ল।

ফোন বের করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ইংরেজিতে কথা বলছেন। একটু উত্তপ্ত আলোচনা। গোলোকবিহারীবাবুর পিছন-পিছন টোডিও বেরিয়ে গিয়েছে। রূপু দেখল সে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল। অন্যের কথা শোনা অনুচিত। তবু রূপুর কৌতূহল হচ্ছে ভীষণ। দেওয়াল ঘেঁষে দরজার ঠিক পাশটাতে দাঁড়াল ও। সব কথা বোঝা না গেলেও কয়েকটি শব্দ কানে এল। জিন-টিন নিয়ে তো বলছেনই, সঙ্গে সোনোরান ডের্জাট, বুফোটক্সিন, ডলার, পেমেন্ট,—এরকম সব শব্দও কানে আসছে। জিনের ওপর কাজ করছেন, তাই নিয়ে কথা বলবেন, কিন্তু সোনোরান মরুভূমির প্রসঙ্গটা বুঝতে পারল না রূপু। আর টক্সিন

মনে তো বিষ, বুফোটক্সিন-টা কী? কুনোব্যাং বুফোনিডি ফ্যামিলির অন্তর্গত, তবে কী কুনোব্যাঙের বিষ কে বুফোটক্সিন বলছেন? কৌতূহলী হয়ে দরজার বাইরেই বেরিয়ে এল রূপু।

—এখন গোলোকবিহারীবাবু বলছেন,...হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি তো সব রেডি..না না কারাজোর ওপরে অ্যাপ্লাই করা যাবে না...একটু সময় দাও...মনে হচ্ছে অন্য কাউকে পেয়েছি...হ্যাঁ হ্যাঁ কী এফেক্ট হয় জানাব...

বলতে বলতে গোলোকবিহারীবাবু পাশের ঘরটির দরজার লক খুলে ঢুকে পড়লেন। রূপুর বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। কারাজো মানে টোডির ওপরে কী অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল? সে কারণেই কি ও কথা বলতে পারে না? আর এখনই বা কী অ্যাপ্লাই করবেন? কাকে পেয়েছেন, — ওদের দু'জনকে? তাতে ওদের দুজনেরও তো ক্ষতি হতে পারে। হঠাৎই ভয়ে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে এল রূপুর। কমলকে বলবে কী? চিন্তা করল রূপু। থাক। ও যা ভীতু। বিপদ বেশি বুঝলে বলবে তখন। আসলে কমল তো আর রূপুর মতো কাঁড়িকাঁড়ি দেশিবিদেশি গোয়েন্দা গল্পের বই পড়েনি। কিংবা রূপুর মতো অনুসন্ধিৎসার বাতিকও নেই ওর। তাই ব্যাপারগুলো অন্যচোখে দেখতে পারছে না।

কমল ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। 'তুই একটু দাঁড়া। আমি চট করে দেখে আসি উনি ওই ঘরে কী করছেন।' বলল রূপু।

'না রে। ওভাবে যাওয়া ঠিক না। আমাদের তো যেতে বলেননি।'

'তুই দাঁড়া না।' বলেই রূপু এগিয়ে গিয়েছে। এ ঘরের দরজাটা অন্যরকম। কাঠের বদলে স্টিল বা অন্য ধাতুতে তৈরি। এয়ারটাইট করার জন্যে কী? কে জানে। দরজায় একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লাটা। দমটা ছাড়ল রূপু। ভাগ্যিস ভিতর থেকে লক করে দেননি। ঘরে ঢুকে পড়ল ও। ভিতরটা যথেষ্টই ঠান্ডা। কোনো একটা মেশিন চলছে রিনরিন শব্দে। খুব হালকা সাদা একটা আলো জ্বলছে ঘরে। ঘর জুড়ে অসংখ্য যন্ত্রপাতি। তবে আগের ঘরটার মতো বিকার বা বুনসেন বার্নারের মতো পরিচিত এটি যন্ত্রও নেই। এখানে আরও জটিল-জটিল সব যন্ত্র। কয়েকটিতে কোম্পানির নামের সঙ্গে মেশিনেরও নাম লেখা আছে। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, জিন পালসার, ইলেকট্রোফোরেসিস অ্যানালাইজার, চার্ট রেকর্ডার ইত্যাদি।

গোলোকবিহারীবাবু ঘরের একদম কোণায় বিশাল বড়ো একটা স্টিলর্যাকের সামনে একটা গোল ফাইবারের টুলে বসে কিছু করছেন। র্যাকভরতি নানা ধরনের বাক্স। গোলোকবিহারীবাবু নাইলন জাতীয় সাদা একটা কানঢাকা পোশাক পরে নিয়েছেন। মুখে মাস্ক, দু'হাতেও গ্লাভস। ওনার সামনেই একটি বাক্স, বা বলা যেতে পারে টেস্টটিউব কেস। কারণ ভিতরে দশ-বারোটি টেস্ট-টিউব দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটিই তরল পদার্থে ভরতি। গোলকবিহারীবাবু ডানহাতে লম্বা একজা সিরিঞ্জ থেকে বাঁ-হাতে ধরা একটি টেস্টটিউবে কিছু ফেলছেন। রূপু ঢুকেছে টের পাননি। সাহস করে আর একটু এগোতে টেস্টটিউব কেসটির লেবেলটা দেখতে পেল ও : 5 MeO-DMT / bufo alvarius

‘5 MeO-DMT’ —কী বুঝতে পারার কথা নয়, তবে বুফো আলভারিয়াস ব্যাঙেরই কোনো একটি প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম হতে পারে। টেস্টটিউবে তবে এই ব্যাঙেরই জিন সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে? এই জিন নিয়ে গোলোকবিহারীবাবু গবেষণা করছেন? উন্নত প্রাণী সৃষ্টি করবেন বলেছিলেন। সে কী তবে এই ব্যাঙের জিন দিয়ে? এমনকী সম্ভব? ব্যাঙের জিন কী মানুষের দেহে প্রয়োগ করা যায়,—কে জানে। গোলোকবিহারীবাবু হয়তো পেরেছেন। সেই জন্যেই বললেন তিনি যা করেছেন মানুষের কল্পনারও অতীত। টোডি কী তাই অমন ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে? এবং ওই জন্যেই কী ওর নাম টোডি? টোড মানেও তো ব্যাং। টোড থেকে টোডি। ওর শরীরের অস্বাভাবিক পরিবর্তনটাও কী গোলকবিহারীবাবুর পরীক্ষার ফল? এবার কী তিনি ওদের ওপর পরীক্ষা করবেন? সেই জন্যেই বললেন, অন্য কাউকে পেয়েছি।...আর চিন্তা করতে পারল না রূপু। ভয়ে ওর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল।

গোলোকবিহারীবাবুর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। টেস্টটিউবটা কেসের মধ্যে ভরছেন। রূপু দেখল টেস্টটিউবে লম্বালম্বি লেখা রয়েছে bufotoxin-sonamon, বুকের মধ্যে হাতুড়ি পড়ল যেন। সর্বনাশ এতো জিন না,

টক্সিন, মানে বিষ। ওদের ওপর এই বিষ কি প্রয়োগ করবেন উনি!—না, এখনও বনবিহারীবাবু টের পাননি। তড়িত বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল রূপু। বেরতে গিয়ে কমলের সঙ্গে ধাক্কা। সে একদম দরজার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

'পালাতে হবে, এক্ষুনি।' বলল রূপু। কমল তো অপেক্ষাতেই ছিল। হাওয়ার বেগে সিঁড়ি দিয়ে নামল দু'জন।

বইপত্তরের ঘর পেরিয়ে বাইরের ঘরে এল ওরা। টিমটিম সেই সাদা আলো জ্বলছে এখনও। বাইরে থেকে ঝড়বৃষ্টির আর একটুও আওয়াজ আসছে না। দরজার খিলে হাত দিতে যাবে এমন সময় কে যেন দুড়ুম করে পিছনে এসে পড়ল। টোডি। গোঁক-গোঁক আওয়াজের সঙ্গে চোখের মণিটা অবিশ্বাস্য ভাবে প্রায় কপাল অবধি তুলে কিছু বলল সে। যার একটাই মানে হয়, বেরন চলবে না!

রূপুরা কী করবে ভেবে পেল না। পরক্ষণেই ঘরে ঢুকলেন গোলোকবিহারীবাবু। নীচে নেমে এসেছেন। মুখে উজ্জ্বল হাসি। মিহি গলায় মৃদু ধমক দিলেন, 'কী ব্যাপার, কোথায় যাচ্ছিস তোরা? এক-কাড়ি তেলেভাজা হল কে খাবে সে সব।'

'আমরা খাবো না। খিদে নেই।' বলল রূপু।

'তুই আমার মাস্টারল্যাবে ঢুকেছিলি, দেখলাম দৌড়ে পালিয়ে গেলি?' জিজ্ঞেস করলেন গোলোকবিহারীবাবু।

রূপু চুপ।

'আরে বাবা এতে ভয় পাচ্ছিস কেন, আমি নিজেই দেখাতাম। তবে কিনা না বলে ঢোকাটা ঠিক না। যাকগে, বোস তোরা, আমিই খাবারটা নিয়ে আসছি। আর একটা কথা শোন টোডির অবাধ্য হোস না, তোদের মতো দুটো পুঁচকে ছোঁকরাকে দুটি থাপ্পড়েই অজ্ঞান করে দিতে পারে ও।' ভিতরের দিকে পা বাড়ালেন গোলোকবিহারীবাবু। শেষ বাক্যটি যে ধমকানি তা না বোঝার মতো ছোটো নয় ওরা। থমথমে মুখ নিয়ে মখমলি আরামকেদারায় এসে বসল দু'জন। টোডি একটু হাসল। রূপুর মনে হল হাসিটা ঠিক যেন ভয় দেখানোর নয়, একটু করুণ-করুণ যেন।

কমল ফিসফিসিয়ে বলল, 'ওই ঘরটায় কি দেখলে তুমি?'

যা দেখেছে যতটা পারে সংক্ষেপে রূপু বলল ওকে। সামনের কারুকার্যকরা কাঠের সেন্টারটেবিলে একটি পেন রয়েছে। রূপু হাতে তুলে নিল। ফাইভ মিও ডিএমটি আর বুফো আলভারিয়াস, দুটোই মনে আছে এখনও। স্পেলিংটাও। টেবিলে একটি বিদেশি ম্যাগাজিনও রয়েছে, যার প্রচ্ছদ কাহিনি, মরুভূমির ব্যাং। কাজটা অনুচিত, তবু রূপু চট করে পেনটা ম্যাগাজিনের একটি পাতায় লিখে দেখে নিল, লেখা পড়ছে কিনা। ব্যাপারটা টোডির মনে হয় পছন্দ হয়নি, সে এগিয়ে এসেছে কিছুটা। রূপু একটু হেসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে লাগল। টোডি কিছু বলল না। সে একটু পিছিয়ে একটা টুলের ওপরে বসল গিয়ে। ম্যাগাজিনের পাতা ছিঁড়ে লিখতে সাহস হল না রূপুর। নিজের বাঁ-হাতে বাংলায় লিখে নিল ফাইভ মিইও ডিএমটি / বুফো আলভারিয়াস।

'এই যে ছেলেরা, টেস্ট দিজ বেঙ্গলি ডেলিকেসি।' বড়ো একটি ট্রে নিয়ে এসে ঢুকলেন। সেন্টারটেবিলে ট্রে-টা রাখতে রূপু দেখল তাতে একটি বড়ো স্টিলের জাগ আর দুটি বাটি, দুটি স্টিলের চামচ আর তিনটি কাচের গ্লাস। বাটি দুটি পায়েসে ভরতি।

'তেলেভাজাটা আর আনলাম না। ঠান্ডা হয়ে গেছে। পায়েস খা। রসগোল্লার পায়েস। খাঁটি দুধে তৈরি। আজ সকালেই করেছে টোডি। জগে আমপোড়ার শরবতও আছে। — কী হল? অত কী ভাবছিস বলত? আয় চটপট খেয়েনে।' বললেন গোলোকবিহারীবাবু, তারপর টোডির দিকে ফিরে বললেন, 'বারান্দায় ওদের সাইকেলটা পড়ে আছে। টিউব ফেটেছে। দ্যাখ তো চটপট জোড়া যায় কিনা।'

টোডি উঠে পড়ল সঙ্গে-সঙ্গে। হেঁটে নয়, প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল দরজার সামনে।

কমল একদম চুপ। রূপুর দিকে তাকিয়ে আছে, ও যা করবে তাই করবে সে।

'টোডি খাবে না?' ম্যাগাজিনটা টেবিলে রেখে জিজ্ঞেস করল রূপু।

'না, না, ও এসব খাবার খায় না। ওর জিনিস অন্য। পায়েসের অভ্যেসটা করিয়েছিলাম, এটাই এখনও খায় একটু। তোরা খা, ও পরে খাবে 'খন।' বলে উঠলেন গোলোকবিহারীবাবু। বাটি দুটিতে চামচ দিয়ে এগিয়ে দিলেন ওদের দিকে।

কমল চেয়ে আছে রূপুর দিকে।

'কি হল খা,' তাড়া দিলেন গোলকবিহারীবাবু, 'কী ভাবছিস ব্যাঙের বিষ খাওয়াচ্ছি তোদের? আচ্ছা এই দ্যাখ,' রূপুর প্লেট থেকে চামচের আগায় একটু পায়েস নিয়ে আলগোছে নিজের মুখে পুরলেন।

'খা ব্যাটারা খা এবার।' জাগ থেকে তিনটি গ্লাসে আমের সবুজ শরবতও ঢেলে ফেলেছেন। এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় দেখছে না রূপু। তাছাড়া গোলোকবিহারীবাবু নিজেও তো খেলেন। শরবতও ঢাললেন একই জাগ থেকে। নাঃ ও একটু বেশি ভাবছে। ভদ্রলোককে অকারণে সন্দেহ করছে না তো? খাওয়াই যাক। এক চামচ পায়েস নিয়ে মুখে দিল রূপু। সত্যি দারুণ বানিয়েছে।

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে।' বললেন গোলোকবিহারীবাবু।

রূপুকে দেখে কমলও খেতে শুরু করল। কয়েকমিনিটের মধ্যে বাটি শেষ। গোলোকবিহারীবাবু অবশ্য আর খেলেন না। তিনি কেবল শরবতটাই খেলেন তারিয়ে তারিয়ে। বাইরের দরজা খুলে টোডি কাজ করছে। ওদের খাওয়ার মধ্যে একবার ভিতরে ঢুকে একটা বাক্স নিয়ে এসেছে। সাইকেল সারানোর টুকিটাকি জিনিসপত্র যে এ বাড়িতে আছে বোঝা যাচ্ছে। বৃষ্টি এখন হচ্ছে না। তবে মাঝেমধ্যে বিদ্যুতের ঝলকানি আছে।

খাওয়া হয়ে গিয়েছে। রূপু পুরোটা খেল না। কেমন একটা গা-গোলানি মতো হল হঠাৎ। শরবতও খেল কয়েক চুমুক। কমল অবশ্য সবই খেল চেটেপুটে। সে এখন হঠাৎ গান ধরেছে গুনগুনিয়ে। টোডি এসে গোঁক-গোঁক শব্দে হাত-পা নেড়ে জানাল সাইকেল রেডি।

'চল কমল।' বলে উঠে দাড়াতে গিয়েও বসে পড়ল রূপু। মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করছে। শরীরটা হঠাৎই যেন খুব হালকা হয়ে গিয়েছে। ভালো লাগছে, কিন্তু কেমন একটা অন্যরকম অস্বস্তিও হচ্ছে শরীরে, এমন কখনো অনুভব করেনি ও আগে। আবার ডাকল কমলকে, 'ওঠ রে কমল।'

কমল হেসে উঠল হো হো করে। অদ্ভুত আচরণ শুরু করেছে সে। আরামকেদারায় দু'পা উঠিয়ে বসেছে। স্কুলের প্রার্থনা সংগীতটা গাইছে চিৎকার করে। গোলোকবিহারীবাবু পকেট থেকে মোবাইল বের করে ভিডিও রেকর্ডিং করে চলেছেন ওর কাণ্ডকারখানা।

ঝিমঝিমানির মধ্যে রূপুর মনে পড়ল গোলোকবিহারীবাবু বলছিলেন, 'সম্ভব হলে কেমন এফেক্ট হয় রেকর্ড করে রাখব।'—না, কোনো সন্দেহ নেই আর। খাবারের মধ্যে কিছু একটা মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছেন ওদের। বুফোটক্সিন? সর্বনাশ! কী হবে কে জানে। মনের জোরে উঠে দাঁড়াল রূপু। পা কাঁপছে। কাঁপুক। যে করেই এখুনি পালাতে হবে এখান থেকে। কমলটা বেশি খেল বলেই মনে হচ্ছে 'এফেক্ট'টা বেশি হয়েছে ওর। শেষকালে 'টোডি'র দশা না হয় ওর!

গোলোকবিহারীবাবু মোবাইল পকেটে পুরে বললেন, 'যাবি তোরা? যা। তোর বন্ধুর দেখছি মাথায় ছিট আছে। সাবধানে যাস বাবা।'

গান থামিয়ে কমল হঠাৎ বলল, 'টোডির বৈজ্ঞানিক নামটা কি?'

হো হো করে হেসে উঠলেন গোলোকবিহারীবাবু—'বাঃ বাঃ বেড়ে বলেছিস তো।? ওর বৈজ্ঞানিক নাম বুফো কোস্টারিকাস।'

রূপু কমলের হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছে বারান্দায়। গোলোকবিহারীবাবু হাসছেন। খুব আনন্দ তাঁর।

'ঠিক সময়ে এসেছিলিস তোরা। পৃথিবী ভরে যাবে এবার 'সোনামন'-এ।'

কমল আবার জিজ্ঞেস করল, 'আর তোমার বৈজ্ঞানিক নাম?—বুফো বেঙ্গলিকাস!'

মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল গোলোকবিহারীবাবুর দুড়ুম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বাইরে এখন ঝুপঝুপ অন্ধকার। কোনোমতে বারান্দা থেকে সাইকেল নামিয়ে নিল রূপু। কমল আবার গান ধরেছে। ঠিক গান না মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো গানের সুরে বলে যাচ্ছে সে। তা করুক, একটা অন্তত সুবিধা গানটান গাইলেও এমনি কথা শুনছে সে। হাত ধরে ডাকাতে সাইকেলের কেরিয়ারে উঠেও বসল।

রূপুর হাত কাঁপছে খুব. সাইকেলের ব্যালান্স রাখতে অসুবিধা হচ্ছে। সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে চোখের সামনে হঠাৎ...হঠাৎ তুবড়ির মতো আলোর ঝলকানি উঠছে। সাইকেল থামিয়ে একটা গাছের নীচে দাঁড়াল ও। একটা ছোটো সিমেন্টের কালভার্টও আছে। সাইকেল স্ট্যান্ড করে দুজনে বসল সেটায়। কমল একটু শান্ত হয়েছে। চুপচাপ কি যেন ভাবছে। রূপুও ভাবছে। গোলোকবিহারীবাবু গোলমেলে কিছু বিষয় নিয়ে যে গবেষণা করছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কমল যেরকম আচরণ করছিল মনে হচ্ছিল যেন সে নেশা করেছে। রূপুদের পিছনের ফ্ল্যাটের সৈকত কাকা মাঝেমধ্যেই ক্লাবেটাবে গিয়ে নেশা করে রাতবিরেতে বিচ্ছিরি চিৎকার করে সকলের ঘুম ভাঙান। গোলোকবিহারীবাবু নিশ্চয় এরকম কোনো নেশাটেশার জিনিস তৈরি করছেন। এবং সেই জিনিসটির কার্যকারিতা ওদের ওপর প্রয়োগ করে দেখে নিলেন। আর 'টোডি'? সে ওরকম ব্যাঙের মতো হয়ে গেল কী করে? সত্যিই ছোটো থেকে অমন ছিল, না জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে গোলকবিহারীবাবু ওকে ব্যাংমানুষ বানিয়ে ফেলেছেন। বাড়ি ফিরে কলকাতায় অগ্নিবাণকে ফোন করতে হবে। ফাইভ মিও ডিএমটি আর বুফো আলভারিয়াস—মনে আছে পুরো। তবু বাঁ-হাতের তালুটা দেখে নিল রূপু। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সাইকেলের ভেজা হ্যান্ডেলে উঠে না যায়। এবার ফেরাই ভালো।

পঞ্চুকাকার ব্যাগটাও ফেরত দিতে হবে। সাইকেলে উঠে বসল দু'জন। ঠান্ডা বাতাসে অনেকটাই ভালো লাগছে এখন।

2

রূপুর আশঙ্কাটা যে এতটা সত্যি হবে ও নিজেই ভাবেনি. 5-MeO DMT আর bufo alvarius শব্দগুলো অগ্নিবাণকে ফোনে বলেছিল ও। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরেই। অগ্নিবাণের বাবা সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের বড়ো অফিসার। রূপুর অনুমান ঠিক। বুফো আলভারিয়াস হল আমেরিকার সোনোরান মরুভূমির একটি বিশেষ প্রজাতির ব্যাং। মূলত কলোরাড়ো নদী উপত্যকায় পাওয়া যায় এদের। 5-MeO-DMT হল এই ব্যাঙেরই ত্বকনিঃসৃত একটি বুফোটক্সিন মানে বিষ। সোনোরান ব্যাঙের এই বিষের বৈশিষ্ট্য হল এটি মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে তীব্র নেশার সৃষ্টি করে।

গোলোকবিহারীবাবু মূলত একজন হারপিটোলজিস্ট। মানে সরীসৃপ এবং উভচর প্রাণী বিশেষজ্ঞ। পরে জেনেটিক্স নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। কিন্তু এই গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কোনো প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করতেও তার অনীহা। তাছাড়া তিনি যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সরাসরি মানবদেহে করার পক্ষপাতী। সে কারণেই বিরোধ লাগে। নামি একটি প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত হন তিনি। চলে আসেন এদেশে। এমন সময়ে বিদেশি একটি কোম্পানি তাকে সেনোরান ব্যাঙের টক্সিন খাবারে ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়। চকোলেট বা নরমপানীয়ে ব্যবহার করা হবে সেই টক্সিন। নেশার ঝোঁকে বিক্রিও হবে দুর্দান্ত। গোলোকবিহারীবাবুর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয় এমনভাবে মেশাতে হবে যা কিনা ল্যাবরেটরি টেস্টেও সহজে ধরা যাবে না। এ জন্য প্রচুর টাকাও পান গোলকবিহারীবাবু। টক্সিন তৈরি হয়। কিন্তু মুশকিল হয় তার কার্যকারিতা কতটা তা নিয়ে। টোডির ওপরে প্রয়োগে কোনো লাভ নেই। তাঁর দেহে ব্যাঙের বিষ কোনো প্রভাব ফেলে না। কারণ, ইতিপূর্বেই ব্যাঙের জিনের সঙ্গে ওর জিনের কিছু গুণগত এবং কার্যগত পরিবর্তন করে ফেলেছেন গোলোকবিহারীবাবু। তাকে এখন ব্যাংমানুষ বলা যেতে পারে। জন্ম থেকেই সে এমন ছিল না। গোলোকবিহারীবাবুর অমানবিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তাকে একটি অস্বাভাবিক মানুষে পরিণত করেছে।

এমন সময়ে রূপুরা এসে পাড়ায় গোলকবিহারীবাবু ঠিক করেন সোনোরানের ব্যাঙের বিষ তিনি ওদের ওপরে প্রয়োগ করে দেখবেন। পায়েস আর শরবতে তিনি মিশিয়ে দেন বিষাক্ত 5 MeO-DMT, নিজেও খেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে বিষ প্রতিহত করার জন্য নিজেরই তৈরি অ্যান্টিটক্সিন খেয়ে নিয়েছিলেন। তাই তার কিছু হয়নি। নেশার এই বিষ 'সোনামন' পানীয় নামে পৃথিবীর গরিব দেশগুলিতে বিক্রির মতলব করেছিল কোম্পানিটি। শেষ পর্যন্ত যে তা হল না, তা কেবল রূপুর জন্যে। ওর কাছ থেকে সব শুনে অগ্নিবাণের বাবা পুলিশ এবং নামি গবেষকদের নিয়ে হানা দেন গোলকবিহারীবাবুর বাড়ি। প্রচুর বেআইনি কাগজপত্র এবং বেশ কিছু বিপন্ন প্রাণী পাওয়া যায় তার বাড়ি থেকে। জেরার মুখে তিনি স্বীকার করেন এইসব। এই অসৎকার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত বাকি লোকদেরও ধরার চেষ্টা চলছে এখন।

যা হোক, রূপু এবং কমল এখন দারুণ বিখ্যাত। খবরের কাগজ আর টিভির চ্যানেলে-চ্যানেলে ওদের মুখ এখন। গৌরদাদু, মিমিপিসিও খুশি খুব। পিসি তো এই ক'দিন ধরে কেবল রকমারি পায়েস রান্না করে যাচ্ছেন। 'আহারে, পায়েস খেতে এত ভালোবাসিস, আগে বলবি তো আমায়।' বলছেন আর দুর্দান্ত-দুর্দান্ত সব পায়েস করে চলেছেন। স্বাদ গন্ধ এবং বর্ণ, তিনেতেই অতুলনীয়।

তবে এত আনন্দের মধ্যে রূপুর একটু দুঃখ থেকেই গিয়েছে। টোডিকে এখনও স্বাভাবিক করে তোলা যায়নি। দেশ-বিদেশের বাঘাবাঘা সব বিজ্ঞানীরা ওকে নিয়ে পড়েছেন। গবেষণার জ্বালায় সে বেচারির এখন খুব কষ্ট!

ভোলাকে ভোলা যাবে না কিছুতেই

অনীশ দেব

না, ভোলাকে কিছুতেই ভুলতে পারা যাবে না। তার মানে এমন নয় যে, আমি ওকে ভুলতে চেষ্টা করেছি। বরং এটাই আমি সাদা-কালোয় জানাতে চাই, ওকে ভুলে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ও এমন সব কাণ্ড করেছিল যে, এই তিরিশ-বত্রিশ বছরেও ওর ছবিটা এতটুকু মলিন হয়ে যায়নি।

অনেকে ভাবতে পারেন, এ আর এমনকী! অনেক আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকেই তো আমরা চিরদিন মনে রাখি! তা হলে ভোলাকে ভুলতে না পারার মধ্যে আশ্চর্যের কী আছে!

আছে এই কারণেই যে, ভোলা মানুষ নয়—রোবট।

এইবার বলুন, আজকের এই কলকবজার যুগে একটা যন্ত্রের কথা এতবছর ধরে কেউ মনে রাখতে পারে—যদি না সেই যন্ত্রের মধ্যে অদ্ভুত কিছু থাকে!

আজ সেই ভোলার কথাই বলব।

খুব ছোটোবেলায় আমার মা মারা গিয়েছিল। আমার বাবা যখন আমাকে নিয়ে বেজায় হিমশিম খাচ্ছে, তখনই 'এশিয়া রোবোটিক্স কোম্পানি' থেকে ভোলাকে নিয়ে আসে। ভোলা ছিল ভি. এক্স. থ্রি মডেলের 'ডোমেস্টিক কম্প্যানিয়ান রোবট', অর্থাৎ গৃহস্থের উপযুক্ত সঙ্গী রোবট।

এসব কথা আমি বড়ো হয়ে বাবার কাছে শুনেছি।

ছোটোবেলা থেকেই ভোলাকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়াটা আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। একবারের জন্যেও মনে হয়নি ও যন্ত্রদাস কিংবা রোবট।

ভোলার চেহারায় চোখে পড়ার মতো আলাদা কিছু ছিল না। ও যে আসলে কী, সেটা ওকে দেখে একটুও বোঝা যেত না। তবে চলাফেরা কথাবার্তায় ব্যাপারটা আঁচ করা যেত।

ভোলার মাথায় কদমছাঁট চুল। মুখটা গোল ধরনের। চোখজোড়া সবসময়েই ছানাবড়া—যেন কোনো কিছু দেখে অবাক হয়ে গেছে। গায়ে রংচঙে হাফশার্ট, পায়ে ডোরাকাটা পাজামা। হাত-পাগুলো সরু-সরু হলেও তেমন বেমানান নয়। আর উচ্চতা ছিল চার ফুট।

ভোলার সঙ্গে খেলাধুলো করে আমার দিব্যি সময় কাটত। খেলতে-খেলতে আমি একসময় হাঁফিয়ে পড়তাম, ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। ধপাস করে বসে পড়তাম মেঝেতে।

ভোলা কিন্তু মোটেই ক্লান্ত হত না, হাঁফাত না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছানাবড়া চোখে আমাকে দেখত। তারপর জিগ্যেস করত, 'কী হল, ভাইটি, আর খেলবে না?'

আমি বলতাম, 'না, ভোলা, ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। তোমার লাগছে না?'

'না, গো—আমার টায়ার্ড হওয়ার জো নেই।'

আমি অবাক হয়ে ভোলাকে দেখতাম। ভাবতাম, মানুষের চেয়ে যন্ত্রই ভালো—ইচ্ছেমতন যতক্ষণ খুশি খেলতে পারে।

প্রথম-প্রথম ভোলাকে আমি 'ভোলাদা' বলতাম। কিন্তু বাবা একদিন শুনতে পেয়ে আমাকে বারণ করল : 'কী বলছ, সন্তু! রোবট আবার দাদা কীসের! ওকে তুমি নাম ধরেই ডাকবে—যেমন আমি ডাকি।'

ভোলা কিন্তু বরাবর আমাকে 'ভাইটি' বলেই ডাকত।

আমরা দুজনে সবসময় একসঙ্গে থাকতাম। বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলে ভোলার কাছে আমাকে নিশ্চিন্তে রেখে যেত।

আমার স্কুলে যাওয়ার সময় হলেই ভোলা আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোত। বড়ো রাস্তা পার করে বাস ধরে আমাকে পৌঁছে দিত স্কুলে। তারপর সারাক্ষণ স্কুলের বাইরে একটা গাড়িবারান্দার নীচে বসে অপেক্ষা করত।

স্কুল ছুটি হলে আবার আমাকে আগলে নিয়ে আসত বাড়িতে।

ওকে নিয়ে সবচেয়ে ঝামেলা হত পরীক্ষার সময়। সবসময় কানের কাছে বলত, 'ভালো করে পড়ো, ভাইটি, ভালো করে পড়ো।' বাবা যত না বলত তার চেয়ে অনেক বেশি বলত ভোলা। পড়তে-পড়তে যখন আমি ঘুমে ঢুলে পড়তাম তখন ভোলা আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকত : 'ভাইটি, লক্ষ্মী আমার, ঘুমিয়ো না। কাল যে পরীক্ষা!'

আমি চোখ ডলে ঘুম তাড়িয়ে আবার পড়তে শুরু করতাম। কিন্তু খুব রাগ হত ভোলার ওপর। বলতাম, 'তোমার কি কখনো ঘুম পায় না!'

ভোলা হাসত। হাসলে ওর ঠোঁটটা সামান্য চওড়া হত। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলত, 'ঘুম পেলে আমাদের চলে না, ভাইটি।'

অনেকসময় এমন হয়েছে যে, ইতিহাস পড়তে-পড়তে ভীষণ বিরক্ত হয়ে 'চটাস' শব্দে বই বন্ধ করে ফেলেছি ঃ 'দূর, কিচ্ছু মুখস্থ হতে চাইছে না! বারবার ভুলে যাচ্ছি।'

ভোলা তখন বইটা আমার হাত থেকে টেনে নিয়েছে : 'কই, আমায় বইটা দাও দেখি! কোন জায়গাটা বলো তো....।'

ওকে পৃষ্ঠাগুলো দেখিয়ে দিয়ে বলেছি, 'শুধু সাল-তারিখ আর গুচ্ছের রাজা-বাদশার নাম! এসব কখনো সহজে মুখস্থ হয়!'

ভোলা পৃষ্ঠাগুলির দিকে দু-পলক আকাল, তারপর বইটা বন্ধ করে বলল, 'নাও, তুমি এবার চোখ বুজে শুনে যাও। একমনে শুনবে কিন্তু...।'

ব্যাস! ভোলা গড়গড় করে পৃষ্ঠাগুলি মুখস্থ বলে যেত আমার কানের কাছে। আর আমি ওর তাকলাগানো ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যেতাম। ওর মুখে শুনতে-শুনতে ইতিহাসের পড়া দিব্যি মুখস্থ হয়ে যেত।

আমি আমাকে বলতাম, 'আমার বদলে তুমি পরীক্ষা দিলে রেজাল্ট অনেক ভালো হত।'

ভোলা প্রতিবাদ করে বলত, 'না, ভাইটি, আমি ফেল করতাম। কোথা থেকে কোন পর্যন্ত লিখতে হবে সেটাই তো আমি বুঝতে পারি না!'
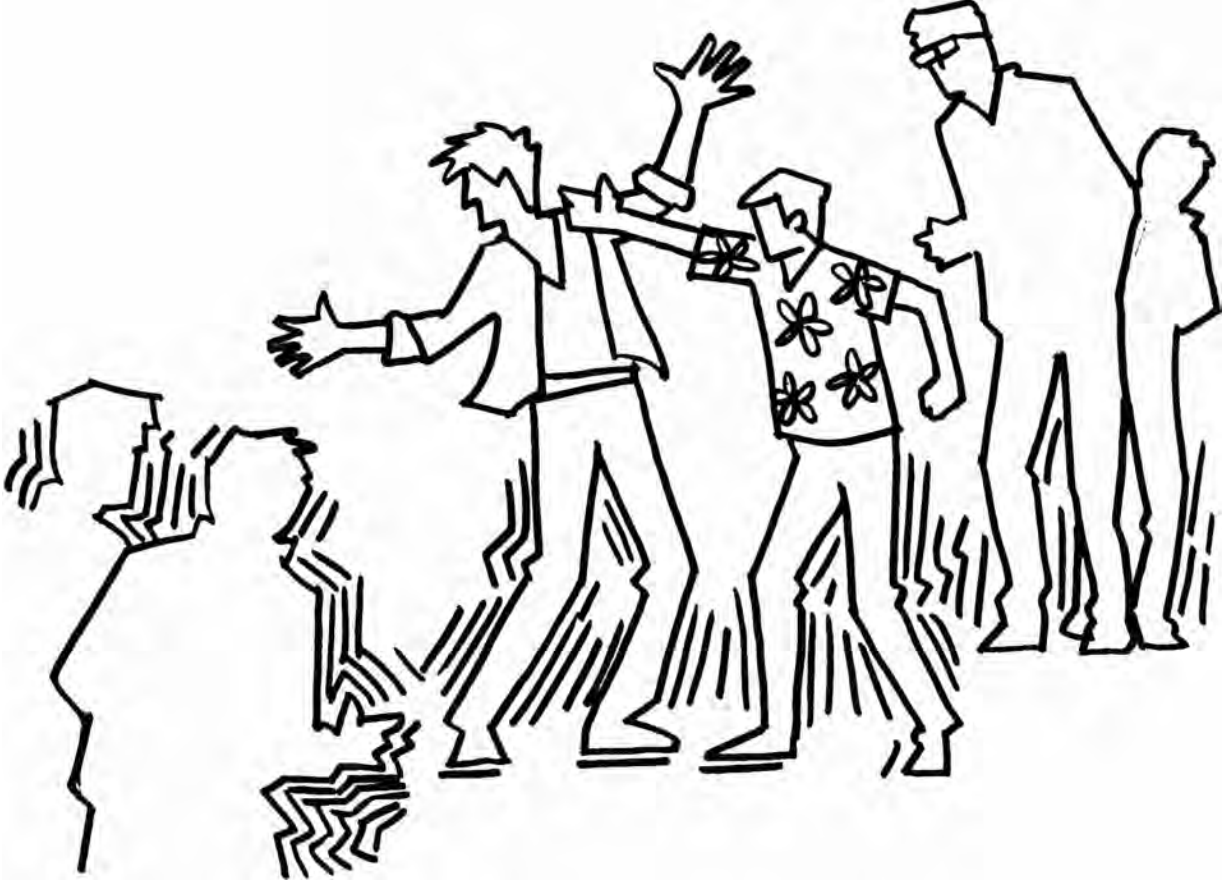
'তা হলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি পরীক্ষা দেব।'

আমার এই অদ্ভুত বায়না শুনে ভোলা হেসে বলত, 'ভাইটি, এভাবে পরীক্ষা দিয়ে ভালো রেজাল্ট করার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই।'

আমি ওর কথাটা মন দিয়ে ভাবতাম। এতসব ও বোঝে কেমন করে!

আমার সঙ্গী হয়ে সময় কাটানো ছাড়াও কিছু-কিছু বাড়তি কাজ ভোলাকে করতে হত। যেমন, বাবার ফাইফরমাশ খাটা, দোকানে যাওয়া, টেলিফোন কিংবা ইলেকট্রিকের বিল জমা দিয়ে আসা—এইসব। কিন্তু এত কাজ করেও ভোলাকে কখনো বিরক্ত বা ক্লান্ত হতে দেখিনি। ওকে যদি জিগ্যেস করতাম, 'এত কাজ করতে-করতে কখনো তোমার বিরক্ত লাগে না?' তা হলে ও হয়তো হেসে বলত, 'বিরক্ত হলে আমাদের চলে না, ভাইটি।'

আমার দেখাদেখি ভোলা বাবাকে 'বাবা' বলেই ডাকত। বাবার অফিসের ব্যাগটা হাতে তুলে দিত, জুতো পালিশ করে দিত, বাবা কখন অফিস থেকে ফিরবে জিগ্যেস করত, সাবধানে যাতায়াত করার জন্যে পরামর্শ দিত।

ওর কাণ্ডকারখানা দেখে বাবা মাঝে-মাঝে আমাকে বলত, 'একটা ডোমেস্টিক কম্প্যানিয়ান রোবটের কাছ থেকে এতে সার্ভিস পাব ভাবিনি।'

আমি কোনো জবাব দিতাম না। তবে ভোলার সঙ্গে 'রোবট', 'সার্ভিস', এই শব্দগুলি জুড়ে কথা বলাটা আমার ভালো লাগত না।

একদিন আমরা তিনজনে ইভনিং শো-তে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম—আমি, বাবা, আর ভোলা। ছবিটার নাম 'দ্য সাউন্ড অফ মিউজিক'। ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ে আর নাচ-গান নিয়ে দারুণ জমাটি ছবি।

হল থেকে বেরোনোর সময় হঠাৎই শুনলাম ভোলা গুনগুন করে গান গাইছে : 'ডো আ ডিয়ার, আ ফিমেল ডিয়ার য রে আ রে অফ গোল্ডেন সান য মি আ নেম আই কল মাইসেলফ...।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'ভোলা, ছবি কেমন লাগল?'

ভোলা বলল, 'দারুণ! যদিও পুরোপুরি বুঝতে পারিনি।'

বাবা হেসে বলল, 'যাক, ভোলা অন্তত সত্যি কথাটা বলেছে!'

আমি বললাম, 'রোবটরা মিথ্যে কথা বলে না, বাবা।'

ফেরার পথে হঠাৎই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তখনও আমরা একটা খালি ট্যাক্সি জোগাড় করতে পারিনি। ছাতা সঙ্গে না থাকায় ফুটপাতের ধার ঘেঁষে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কোনোরকমে মাথা বাঁচাতে চেষ্টা করছি।

হঠাৎই একটা বিশাল অফিসবাড়ির আড়ালের এক অন্ধকার কোণ থেকে তিনটে ছায়া এগিয়ে এল আমাদের দিকে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। পরনে টি-শার্ট আর চোঙা প্যান্ট।

খুব কাছাকাছি এসে একটা ছেলে বাবাকে লক্ষ করে বলল, 'দাদা, ফুলকি হবে, ফুলকি?'

বাবা থতোমতো খেয়ে বলল, 'ফু-ফুলকি...মানে?'

তখন পাশ থেকে তার এক সঙ্গী কড়া মেজাজে মন্তব্য করল, 'আরে ফুলকি মানে আগুন—সালা ন্যাকাষষ্ঠী!' একটা সিগারেট কোথা থেকে বের করে ঠোঁটে রাখল সে।

এইবার বাকি দুজন বাবার দু-পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, 'মালকড়ি যা আছে ঝটপট দিয়ে দে।'

তিননম্বর ছেলেটা একটা ক্ষুর বের করে বাবার গলার পাশটায় চেপে ধরল।

আমার তো গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠছিল। কিন্তু শত চেষ্টা করেও গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের করতে পারছিলাম না। তা ছাড়া, কাছাকাছি এমন কাউকে চোখেও পড়ল না যে আমাদের বিপদে এগিয়ে আসবে।

হঠাৎই ভোলা দিব্যি স্বাভাবিক গলায় আমায় বলল, 'ভয় পেয়ো না, ভাইটি। দেখছি কী করা যায়।' তারপর ছেলেগুলিকে লক্ষ করে ঠান্ডা এবং শান্ত গলায় বলল, 'বাবাকে ছেড়ে দাও। তা হলে তোমাদেরও আমি ছেড়ে দেব।'

বাবা কিছু এটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ছেলে তিনটে খিলখিল হাসিতে ফেটে পড়ল।

একজন পেটে হাত চেপে হাসতে-হাসতে খানিকটা কুঁজো হয়ে গেল। তারপর কোনোরকমে হাসির দমক কমিয়ে বলল, 'লে, চারফুটিয়া কী বলছে শোন।' তারপর বাচ্চাদের আধো-আধো উচ্চারণে ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, 'ওলে বাবা! বিলাট মাছতান এচে গ্যাচে! পালা, পালা, ছিগগিল পালা!'

কথা বলতে-বলতে ছেলেটা ভোলাকে লক্ষ করে লাথি চালিয়েছে। ভোলা কিন্তু নড়ল না—চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। লোহার সঙ্গে মানুষের পায়ের সংঘর্ষ হল। আর সঙ্গে-সঙ্গে বিকট চিৎকার করে ছেলেটা বসে পড়ল রাস্তায়। ডান পা-টা চেপে ধরে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল, আর কাটা ছাগলের মতো ছটফট করতে লাগল।

ক্ষুর হাতে ছেলেটা ভোলার মুখ লক্ষ করে অস্ত্রটা চালাল। ভোলা বাঁ-হাতে ওর ডানহাতটা খপ করে ধরে ফেলল। এবং ডানহাতে একটা মামুলি থাপ্পড় বসিয়ে দিল ছেলেটার গালে।

থাপ্পড়ের শব্দ কিংবা ফলাফল কোনোটাই মামুলি হল না।

ছেলেটার মুণ্ডুটা প্রায় নব্বই ডিগ্রি ঘুরে গেল। গাল ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল। চোয়ালের হাড়ও সরে গেল বোধ হয়। ও ছিটকে পড়ল রাস্তায়।

তিন নম্বর ছেলেটা ভীষণ বুদ্ধিমান। তাই ও চোখের পলকে বৃষ্টি-ভেজা রাস্তা ধরে ছুট লাগাল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো ঘটনা আমাকে আর বাবাকে একরকম হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। আমরা যেন আবার সিনেমা দেখছিলাম—যার নায়ক চারফুট উচ্চতার একটি নিরীহ গেরস্থালি রোবট।

আমাদের মাথা কাজ করছিল না। বুঝতে পারছিলাম না, থানায় যাব, নাকি অকুস্থল থেকে সরে পড়ব।
সমস্যাটার সমাধান করে দিল ভোলা।

একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে চট করে হাত দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। রাস্তায় পড়ে থাকা ছেলে দুটোকে দেখিয়ে বলল, 'এইমাত্র চারটে গুণ্ডা এই ছেলে দুটোকে মারধোর করে পালিয়ে গেল। এক্ষুনি হয়তো গণ্ডগোল শুরু হয়ে যাবে। আমাদের একটু হেলপ করুন—শিগগির এখান থেকে নিয়ে চলুন, ভালো বকশিশ দেব।'

বাড়িতে ফিরে ধাতস্থ হতে আমাদের বেশ কিছুটা সময় লাগল। তারপর বাবা ভোলাকে বলল, 'অতটা বাড়াবাড়ি করা তোমার ঠিক হয়নি। যদি এরপর পুলিশের ঝামেলা হয়?'

আমি অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকালাম। ভোলা মারাত্মক বিপদে আমাদের বাঁচাল, আর বাবা বলছে 'বাড়াবাড়ি'!

ভোলা গায়ের জামাটা ঠিকঠাক করতে-করতে বলল, 'ঝামেলা কিছু হবে না, বাবা। দেখবে, ওই ছেলেগুলোর নিশ্চয়ই পুলিশের খাতায় নাম আছে।'

বাবা যা-ই বলুক, আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিল, ভোলার কাছে আমাদের ঋণ থেকে গেল। বাবাকে এসব কথা কিছু বলিনি। কারণ, বললেই বাবা হয়তো বলে বসবে, 'রোবটের কাছে আবার ঋণ কীসের! যতসব আজগুবি ভাবনা!'

এর কয়েকমাস পর বাবা বাড়িতে একটা কম্পিউটার কিনে নিয়ে এল। তারপর থেকেই বাবা ওই যন্ত্রটা নিয়ে মশগুল হয়ে গেল। সময় পেলেই শুধু কম্পিউটারের কি-বোর্ড নিয়ে মেতে ওঠে। আর আমাকেও একটু-আধটু শিখিয়ে দেয়।

তখন থেকে বাবা প্রায়ই আপনমনে বিড়বিড় করে, 'ভোলাটার যদি ঘটে আর-একটু বুদ্ধি থাকত তা হলে ওকে কম্পিউটারে বসিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারতাম।'

বাবা কিন্তু ভোলাকে দিয়ে কম্পিউটার চালানোর চেষ্টা করতে ছাড়েনি। তবে হলে হবে কী, ভোলা মেশিন ছেড়ে উঠে চম্পট দিতে পারলেই বাঁচে! ও আমাকে আড়ালে বলত, 'ভাইটি, সবাইকে দিয়ে কী সব কাজ হয়!'

আমি ওর কথা শুনে হাসতাম।

একদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে এ-কথা সে-কথা বলতে-বলতে বাবা হঠাৎই ভোলার প্রসঙ্গ তুলল।

ভোলার নানান কাজ নিয়ে, কাজের খুঁত নিয়ে কয়েকটা মন্তব্য করল বাবা। তারপর ও কম্পিউটার চালাতে পারে না, আধুনিক যুগের কাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না, এইসব বলে বেশ বিরক্তি দেখাল।

ভাগ্যিস ভোলা তখন সামনে ছিল না। থাকলে আমার ভীষণ বাজে লাগত। তা ছাড়া, বাবার মুখে-মুখে আমি ঠিক কথা বলতে পারি না। তাই বাবার কথায় আমার খারাপ লাগলেও কিছু বলতে পারিনি।

হঠাৎই খেয়াল করলাম, রান্নাঘরের দিক থেকে ভোলা একগ্লাস জল নিয়ে আসছে। আমিই ওকে জল আনতে বলেছিলাম।

বাবা খাওয়া শেষ করে জলের গ্লাস হাতে নিয়ে বললেন, 'শোনো, সন্তু। 'এশিয়া রোবোটিক্স কোম্পানি' একটা এক্সচেঞ্জ অফার অ্যানাউন্স করেছে। ভি. এক্স,-থ্রি মডেলের রোবট আর তিরিশ হাজার টাকা দিলে ওরা ওদের লেটেস্ট কম্পিউটার কম্প্যাটিবল ডোমেস্টিক কম্প্যানিয়ান রোবট দেবে। মডেলটা নাম ভি. এক্স. আই. কিউ—ওয়ান। এই রোবটটা কম্পিউটার চালাতে তো জানেই, তা ছাড়া আরও বহু আধুনিক কাজ জানে...।'

আমি বুঝতে পারছিলাম বাবা কী বলতে চলেছে। তাই মুখের মধ্যে ভাত নিয়ে শক্ত করে চোয়াল বন্ধ করে বসেছিলাম। কেমন যেন দম আটকে যাচ্ছিল আমার।

ভোলা অনেকটা কাছে চলে এসেছিল। বাবার কথা ও ঠিক কতটা শুনতে পেয়েছে বুঝতে পারলাম না। ও আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ভাইটি, এই নাও তোমার জল।' গ্লাসটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ভোলা।

বাবা মাথা ঘুরিয়ে একবার বিরক্তভাবে ভোলাকে দেখল। তারপর বলল, 'নাঃ, আর কোনো উপায় নেই! ভোলাকে পালটে ওই নতুন মডেলের রোবটটা নিয়ে আসতেই হবে। কাজের ভীষণ প্রবলেম হচ্ছে...।'

'বাবা।' ভোলা এক অদ্ভুত গলায় ডেকে উঠল। ওর হাত থেকে জল ভরতি গ্লাসটা খসে পড়ে গেল মেঝেতে।

আমি যেন স্লো-মোশানে কোনো সিনেমা দেখছিলাম।

জল ভরতি গ্লাসটা বাতাস কেটে পড়ছে-তো-পড়ছেই। তার মধ্যে বন্দি জল চলকে উঠে ঢেউ তুলছে। তারপর গ্লাসটা ধাক্কা খেল মেঝেতে। কাচ ভেঙে টুকরো-টুকরো হল, জল ছিটকে পড়ল চারিদিকে। জলের ফোঁটাগুলি শূন্যে লাফিয়ে উঠে হিরের কুচির মতো দেখাল। তারপর মেঝের অনেকটা ভিজে গেল। জলে মাখামাখি কাচের টুকরোগুলি এপাশ-ওপাশ ছড়িয়ে পড়ে রইল।

আমার বারবার মনে হচ্ছিল, মেঝেতে জল নয়—রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আর কাচ ভাঙার এককণা শব্দও আমার কানে ঢোকেনি। কারণ, ভোলার বুক ভাঙা 'বাবা!' ডাকটা বারবার আমার কানে বাজছিল।

বাবা মেঝের দিকে তাকিয়ে গ্লাসটার হাল দেখে বলল, 'হোপলেস।'

ভোলা পায়ে-পায়ে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কদমছাঁট চুল, ছানাবড়া চোখ, চারফুট হাইট, অথচ ওকে দেখে এখন মোটেই হাসি পাচ্ছিল না।

'বাবা, আমার মডেলটা পুরোনো বলে, তুমি আমাকে বদলে ফেলতে চাইছ!'

বাবা কোনো জবাব দিল না।

ভোলা উত্তরের জন্যে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল, তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'আমি যে এত বছর তোমাদের কাছে রইলাম, তোমাকে, ভাইটিকে এত যত্ন করলাম, তার কোনো দাম নেই! তুমি বলছ, বাজারে এখন অনেক ভালো মডেলের রোবট পাওয়া যাচ্ছে—তাই আমাকে বদলে ফেলতে চাও। তা হলে একটা পালটা উদাহরণ তোমাকে দিই—শুনতে হয়তো তোমার খারাপ লাগবে।' ভোলা একবার মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখল। তারপর : 'ভাইটির বয়েসি অনেক ছেলেকে আমি দেখি যারা ভাইটির চেয়ে দেখতে ভালো, লেখাপড়ায় ভালো, অনেক গুণ আছে—মানে, অনেক ভালো মডেলের ছেলে। তা হলে তুমি কি চাইবে, ভাইটিকে বদলে আর একটা ভালো মডেলের ছেলে নিয়ে আসতে? সম্পর্কের কোনো দাম নেই তোমার কাছে?'

বাবা রাগে কাঁপতে শুরু করেছিল। ভোলার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'এসব কী উলটোপালটা বকছ! তোমার আর একটি কথাও আমি শুনতে চাই না।'

'আজ আমাকে বলতেই হবে, বাবা!' জেদি গলায় বলল ভোলা, 'তুমি বলছ আমি অনেক কাজ পারি না। ঠিক কথা। কিন্তু অন্য অনেক কাজ তো পারি! তুমিও তো অনেক কাজ পারো না, বাবা! এটাই তো পৃথিবীর নিয়ম : কেউই সব কাজ পারে না। তাতে তো লজ্জার কিছু নেই! এত বছর ধরে তোমাদের জন্যে যা-যা কাজ আমি করেছি সবই তো নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করেছি। কখখনও তো বিরক্ত হইনি। তা হলে বলো, আমার দোষটা কোথায়! আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাব না, বাবা।'

বাবা ভোলার দিকে তাকিয়ে হতাশভাবে মাথা নাড়ল : 'নাঃ, একে বোঝানো যাবে না। মনে হয়, ওর ভেতরের প্রোগ্রামগুলি সব ঘেঁটে গেছে।'

ভোলা আবার যখন কথা বলল ওর গলাটা কেমন ভাঙা কান্নার মতো শোনাল : 'আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না, বাবা। তোমাদের ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।'

বাবা এবার অন্য পথ ধরল। হাত নেড়ে বেশ শান্ত গলায় ভোলাকে বোঝাতে চাইল।

'শোনো, ভোলা, তুমি আসলে একটা রোবট—চাকর রোবট। তুমি আমাকে বাবা বলে ডাকো বটে, কিন্তু আমি তোমার বাবা নই, তুমিও আমার ছেলে নও। আমার মনে হয়, তোমার ভেতরের প্রোগ্রামগুলি সব গোলমাল হয়ে গেছে। তুমি একটু স্থির হয়ে....।'

'কী বলছ, বাবা! তুমি আমার বাবা নও! আমিও তোমার ছেলে নই!'

ভোলার কথাগুলি আমাকে বিরাট ধাক্কা দিল। এই শক্ত কথাগুলি বাবা ওকে না বললেও পারত। তাই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যে আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম, 'প্লিজ, ভোলা, ভুল বুঝো না। তুমি ছেলে না হলে কী হয়েছে—ছেলের মতো তো বটেই! আমিও তোমার ভাইয়ের মতো...।'

ভোলা ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো ছিটকে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। ওর অভিব্যক্তিহীন যান্ত্রিক চোখজোড়া যেন পলকে জ্যান্ত হয়ে উঠল। সে-চোখের দৃষ্টি থেকে ঘৃণা ঠিকরে বেরোচ্ছিল। আমি ওর চোখে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারলাম না—চোখ সরিয়ে নিলাম।

ভোলা খুব ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করে বলল, 'ভাই...এর...মতো! ছেলে...র...মতো!'

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, আমাকে আর বাবাকে বারবার দেখতে লাগল।

অবশেষে খুব আলতো গলায় বলল, 'সম্পর্কের তা হলে কোনো দাম নেই, ভাইটি? বুঝেছি...তোমরা আসলে মানুষ নও...মানুষের মতো...।'

শেষ কথাগুলি বিড়বিড় করতে-করতে ঘরের দরজার দিকে এগোল ভোলা। ওর চোখের নজর বোধহয় ঠিকমতো কাজ করছিল না—কারণ, ও একটা চেয়ারে ধাক্কা খেল, তারপর দেওয়ালের কোণে ওর মাথা ঠুকে গেল।

কোনোরকমে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সদর দরজার পাশটিতে উবু হয়ে বসে পড়েছিল ভোলা। মাথাটা গুঁজে দিয়েছিল ভাঁজ করা দুটো হাতের ফাঁকে।

পরদিন বিকেলে 'এশিয়া রোবোটিক্স কোম্পানির গাড়ি এসে ওকে তুলে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ও একইভাবে বসে ছিল।

বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমি বেশ কয়েকবার ওকে ডেকেছিলাম। কিন্তু ও কোনো সাড়া দেয়নি। হয়তো আমাদের কথায় ওর ভেতরের প্রোগ্রামগুলি তছনছ হয়ে গিয়েছিল। হয়তো ওর ভেতরটা শর্ট সার্কিট হয়ে গিয়েছিল। কে জানে!

সেই থেকে ভোলাকে আমি কখনো ভুলতে পারিনি—ভুলতে পারবও না।

ও আমাকে সবসময় মনে করিয়ে দেয়, আমি মানুষের চেয়ে একটুখানি কম। সেইজন্যেই আমি সারাটা জীবন ধরে পুরোপুরি মানুষ হওয়ার চেষ্টা করে চলেছি।

ক্যাপটেন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

হাতের তাস শাফল করতে-করতে ক্যাপটেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ব্যাস, তা হলে এই কথাই রইল। আমি ডিল করছি। সবচেয়ে কম দরের তাস যার ভাগ্যে উঠবে, তাকেই ছুটে বেরিয়ে যেতে হবে এই গুহা থেকে। সে নিজে হয়তো মারা পড়বে, কিন্তু তারই জন্যে যে বাদবাকিরা বেঁচে যাবে, এটাই হচ্ছে বড়ো কথা।'

মাত্রই ঘন্টাখানেক আগে বার্বেরিস গ্রহের এই চাঁদের পিঠে পাঁচ অভিযাত্রী এসে নেমেছিল। মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইদি ওকাবু, পিটার জ্যাকসন, রোবের সুস্তেল আর মালাকানু বিকিলা। তারা ভেবেছিল, এখানে একটি রিলে-স্টেশন তৈরি করে তোলা যাবে। তার প্রাথমিক কাজ শুরুও করেছিল তারা। কিন্তু ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে এখন তারা এই গুহার মধ্যে বসে আছে।

গুহার বাইরে, এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে জমির ওপরে ছড়িয়ে আছে হালকা বেগনি রঙের রোদ্দুর। সেই সূর্যের রোদ্দুর, পৃথিবীর মানুষরা যাকে 'পরাশর' বলে চেনে। রোদ্দুর অবশ্য গুহার ভিতরে বিশেষ ঢুকতে পারছে না, কেননা, গুহার ঠিক মুখেই দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন পৃথিবীর সেই ডাইনোসরের মতোই বিশাল একটি প্রাণী। বার্বেরিসের যে চাঁদকে তারা সম্পূর্ণ নিস্প্রাণ একটা উপগ্রহ বলে ধরে নিয়েছিল, জমি জরিপ করতে নেমে সেখানে যে একেবারে অতর্কিতে এই হিংস্র জন্তুর মুখের সামনে পড়তে হবে, তা তারা ভাবতেও পারেনি। ন্যাড়া একটা পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেই জন্তুটি তাদের তাড়া করে। ঠিক তক্ষুনি যদি না এই গুহার মধ্যে তারা ঢুকে পড়ত, তা হলে আর তাদের বাঁচতে হত না।

বাঁচবার আশা অবশ্য এখনও বিশেষ নেই। কেননা, টাইটান মহাকাশযান থেকে ছোট্ট-মাপের যে শাটলে করে তারা এখানে নেমেছে, তারই মধ্যে পড়ে রয়েছে তাদের লেসার-পিস্তল। দরকার হবে না ভেবেই সেগুলি আর তারা নামায়নি। ফলে, এখন তারা পুরোপুরি নিরস্ত্র। বাইরে, বেগনি রঙের রোদ্দুরের মধ্যে, দাঁড়িয়ে আছে তাদের শাটল-যান। কিন্তু এই গুহা থেকে রেবিয়ে সেখানে পৌঁছবার কোনো উপায়ই তারা খুঁজে পাচ্ছে না।

কী করে পাবে? গুহার মুখেই দাঁড়িয়ে আছে সেই জন্তু। রাগে গজরাচ্ছে, পাথুরে জমির ওপরে ঘন-ঘন লেজ আছড়াচ্ছে। গুহার মুখটা তার শরীরের তুলনায় এতই ছোটো যে, কিছুতেই সে ভিতরে ঢুকতে পারছে না। কিন্তু যেভাবে সে তার থাবা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে গুহার মুখের পাথরের চাঁইটাকে, যে-কোনো মুহূর্তে সেটা আলগা হয়ে খসে পড়া কিছু বিচিত্র নয়। কী হবে তখন?

ভেবে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না ক্যাপটেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এদের নেতা। দেখে যুবক বলে ভ্রম হয়, কিন্তু তাঁর বয়স এখন পঞ্চাশ। কথা ছিল, রিলে-স্টেশনের জরিপের কাজ শেষ করেই তিনি অবসর নেবেন। হাইবারনেশন-ক্যাপসুলে পুরে তাঁকে আবার পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হবে, এবং সেইখানেই তিনি কাটাবেন তাঁর অবসরজীবন। কিন্তু এই শেষ মিশনেই যে তাঁর অনুসন্ধানী দলটিকে নিয়ে এমন বিপদে পড়তে হবে, তা কি তিনি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন?

সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকালেন মিলিন্দ। তাঁরই ওপরে নির্ভর করছে এদের জীবন-মৃত্যু। আপন হাতে এদের তিনি তৈরি করে তুলেছেন। সাফল্যের মুহূর্তে যেমন মুক্তকণ্ঠে 'শাবাশ' দিয়েছেন, তেমনি বিপদের মুহূর্তে জুগিয়েছেন সাহস। বয়সে এরা প্রত্যেকেই তাঁর চেয়ে অনেক ছোটো। সবচেয়ে ছোটো আফ্রিকার ওই কালো মেয়ে মালাকানু, যাকে তিনি আদর করে 'মালা' বলে ডাকেন। মালার বয়স বাইশ বছর। মাত্রই দু'বছর

আগে মালা তাঁর অনুসন্ধানী দলে এসে যোগ দিয়েছে, কিন্তু বয়স এত কম হওয়া সত্ত্বেও সাহসে, সহিষ্ণুতায়, বুদ্ধিতে আর উদভাবনী কৌশলে সে কারও থেকে কিছুমাত্র পিছিয়ে নেই। ইদি, পিটার আর রোবেরও সে-কথা খোলাখুলি স্বীকার করে। একবার তো ঘোর বিপদের মুহূর্তে এই মালার বুদ্ধিতেই বেঁচে গিয়েছিল পিটার জ্যাকসন। পিটার সে-কথা ভুলে যায়নি।

মালাকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসতেন মিলিন্দ। তাঁর মেয়ে নেই। থাকবার মধ্যে আছে একটি ছেলে। কিন্তু ছেলেটিও কাছে নেই। পৃথিবীতে সে তার কাজের মধ্যে ডুবে আছে। দিল্লিতে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই সে এখন মহাকাশবিজ্ঞান-বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নামজাদা অধ্যাপক। এখন অবশ্য সেই ছেলের কথাও মিলিন্দ ভাবছিলেন না। ভাবছিলেন তাঁর সহকর্মীদের কথা। ভাবছিলেন যে, যেমন তাঁর নিজের, তেমনি তাঁর সহকর্মীদের জীবনেরও আজ শেষ দিন।

সকলেরই শেষ দিন? মিলিন্দের মাথার মধ্যে একেবারে হঠাৎই একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে গেল। আছে, পাঁচজনকে না হোক, অন্তত চারজনকে বাঁচাবার একটা উপায় হয়তো আছে। দলের পাঁচজনের মধ্যে যে-কোনো একজন যদি ছুটে বেরিয়ে যায় এই গুহা থেকে, তা হলে ওই জন্তুটা নিশ্চয় তাকে তাড়া করবে, আর সেই ফাঁকে বাকি চারজন হয়তো উলটো পথে দৌড়ে গিয়ে শাটল-এ উঠে পড়তে পারবে। অর্থাৎ, একজনের প্রাণের বিনিময়ে বেঁচে যাবে বাকি চারজন।

কিন্তু কে হবে সেই একজন, দলের চারজনকে বাঁচাবার জন্যে মিলিন্দ যাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন?

সহকর্মীদের মুখের দিকে তাকালেন মিলিন্দ। তিনি জানেন, নেতার নির্দেশ ওরা কেউই অমান্য করবে না। যাকে আদেশ করবেন, সে-ই ছুটে বেরিয়ে যাবে এই গুহা থেকে। বেরিয়ে গিয়ে শাটল-এর বিপরীত দিতে দৌড়তে থাকবে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ক্ষুধার্ত জন্তুটার দৃষ্টিকে সে তার দিকে আকর্ষণ করতে একটুও দ্বিধা করবে না।

কিন্তু কাকে সে-কাজ করতে বলবেন মিলিন্দ? জেনেশুনে কাকে তিনি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন? ইদি ওকাবুকে, যাকে তিনি আত্মহত্যার পথ থেকে একদিন ফিরিয়ে এনেছিলেন? পিটার জ্যাকসনকে? জেলখানা থেকে ছাড়িয়ে এনে যাকে তিনি মানুষের কল্যাণের কাজে লাগিয়েছেন? রোবের সুস্তেলকে? তাঁরই কথায় যে কিনা বিলাসের জীবন হাসিমুখে ছেড়ে এসেছে? নাকি মালাকে, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যে-মেয়েটিকে তিনি তাঁর নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসেন?

সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্তও দেরি হল না ক্যাপটেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁরই হাতে জীবনের দায়িত্ব তুলে দিয়ে যারা নিশ্চিন্ত, তাদের কাউকেই তিনি এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে বলতে পারবেন না। তার চেয়ে বরং ব্যাপারটাকে তিনি ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেবেন।

হাতে যখন কাজকর্ম থাকে না, মিলিন্দ তখন 'পেশেন্স' খেলেন। এ-খেলার সুবিধে এই যে, একা-একাই খেলা যায়, শুধু এক প্যাকেট তাস থাকলেই হল। পকেটে তাই সবসময়েই এক প্যাকেট তাস রাখেন মিলিন্দ। ট্রাউজার্সের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেই তাসের প্যাকেটটাকে তিনি বার করে আনলেন।

তাস শাফল করতে-করতে মিলিন্দ বললেন, 'ব্যাপারটা তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আমাদেরই মধ্যে একজনকে এই গুহা থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে হবে, যাতে শাফল-এর বিপরীত দিকে জন্তুটা তাকে তাড়া করে যায়, আর সেই ফাঁকে বাকি চারজন যাতে শাটল-এ গিয়ে উঠতে পারে। কে সেই দায়িত্ব নেবে, সেটা আমি ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি, কেমন?'

সঙ্গীদের কেউই কোনো কথা বলল না। কারও দৃষ্টিতে লেশমাত্র ভয় নেই। সকলেই মিটিমিটি হাসছে। মিলিন্দ বললেন, 'বাস, তা হলে ওই কথাই রইল। আমি ডিল করছি। সবচেয়ে কম দরের তাস যার ভাগ্যে উঠবে, তাকেই ছুটে বেরিয়ে যেতে হবে এই গুহা থেকে। সে নিজে হয়তো মারা পড়বে, কিন্তু তারই জন্যে যে বাদবাকিরা বেঁচে যাবে, এটাই হচ্ছে বড়ো কথা।'

পিটার জ্যাকসনই প্রথম তার তাস তুলল। রুহিতনের সাহেব। পিটার বলল, 'মনে হচ্ছে, আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে না।'

ইদি ওকাবু বলল, 'আমি পেয়েছি হরতনের দশ। মনে হচ্ছে, আমিও এ-যাত্রা বেঁচে গেলুম।'

রোবের সুস্তেল বলল, 'আমি পেয়েছি হরতনের বিবি। ক্যাপটেন, দেখা যাচ্ছে, আমার মৃত্যুও আপাতত মুলতুবি রইল।'

মালাকানু বলল, 'আমি পেয়েছি ইস্কাবনের পাঁচ। সঙ্গীদের বাঁচাবার দায়িত্ব দেখছি আমাকেই নিতে হবে।'

সবশেষে তাস তুললেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর, তাসখানাকে ভালো করে দেখে নিয়ে পকেটে রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, 'না মালা, সম্মানটা তোমার কপালে জুটল না। তোমাদের বাঁচাবার দায়িত্ব দেখছি আমাকেই নিতে হল। আমি পেয়েছি চিড়িতনের তিরি।'

কথাটা বলেই মিলিন্দ চটপট উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'রোদ্দুর পড়ে আসছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। তোমরা উঠে পড়। আমি পাহাড়ের দিকে ছুটব। জন্তুটা নিশ্চয় তাড়া করবে আমাকে। তোমরাও তৎক্ষণাৎ উলটো দিকে দৌড় লাগিয়ে শাটল-এ উঠে পড়বে। বিদায়।'

হিংস্র জন্তুটার পেটের তলা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর জন্তুটা তাঁকে তাড়া করতেই বাদবাকি চারজনও গুহা থেকে বেরিয়ে এসে উলটো-পথে শাটল-এর দিকে ছুট লাগাল।

শাটল-এ উঠেই স্টিয়ারিং হইল হাতে নিল মালাকানু। তারপর, ছোট্ট মহাকাশযানটিকে মাটি থেকে ফুট-কুড়ি ওপরে তুলে, কমিউনিকেশন চ্যানেলে মুখ রেখে তার তিন সঙ্গীকে বলল, 'দলের নেতাকে ফেলে রেখে এক্ষুনি আমরা টাইটান মহাকাশযানে ফিরে যাব না। ক্যাপটেন যেভাবে ওই জন্তুটার থাবা এড়িয়ে ছুটছে, তাতে হয়তো বেঁচে যেতেও পারে। যদি বেঁচে যায়, তা হলে যেমন করেই হোক, এই শাটল-এ ওকে তুলে নিতে হবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে মিলিন্দর পিঠের ওপরে এসে পড়ল জন্তুটার থাবা। একটা ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু পারলেন না। মিলিন্দ বুঝতে পারলেন, জন্তুটার নখ তাঁর পিঠের চামড়ায় বসে যায়নি বটে, কিন্তু তাঁর পোশাকটা তার বাঁকানো নখে আটকে গেছে। পরক্ষণেই জন্তুটার থাবা তাঁকে মাটি থেকে অন্তত দশ ফুট ওপরে তুলে ফেলল।

পিটার বলল, 'জন্তুটা ক্যাপটেনকে নিয়ে খাদের ধার দিয়ে ছুটছে।'

রোবের বলল, 'ক্যাপটেন ওর থাবা থেকে যেন একটা ন্যাকড়ার পুতুলের মতো ঝুলছে।'

ইদি বলল, 'মালাকানু, পাহাড়াটাকে চক্কর মেরে আমাদের শাটলটাকে ওই খাদের দিকে নিয়ে চল।'

পিটার বলল, 'এখন তো আমরা নিরস্ত্র নই। শাটলটাকে ওই জন্তুর মুখোমুখি করে দিয়ে শূন্যে একেবারে স্থির করে ভাসিয়ে রাখ। আমি আমার লেসার-গান চালাব।'

মালাকানু বলল, 'শাটলটাকে আমি ওর মুখোমুখি নিয়ে ভাসিয়ে রাখছি। কিন্তু পিটার, তুমি কিংবা রোবের লেসার-গান চালিও না। ইদির মাথা তোমাদের চেয়ে অনেক ঠান্ডা, টিপও তোমাদের চেয়ে অনেক ভালো। ওকেই লেসার-গান চালাতে দাও।'

শাটল ততক্ষণে পাহাড়াটাকে চক্কর দিয়ে খাদের ধারে জন্তুটার মুখোমুখি এসে পড়েছে। স্পিড কমাবার হাতলটাকে একেবারে জিরোর দিকে ঠেলে দিয়ে মালা সেটাকে পুরোপুরি স্থির করে শূন্যে ভাসিয়ে রাখল। এক সেকেন্ড, দু' সেকেন্ড, তিন সেকেন্ড। তারপরেই ইদি ওকাবু টিপে দিল তার লেসার-গানের বোতাম।

বিশাল সেই জন্তুর শরীর তৎক্ষণাৎ ভীষণভাবে কেঁপে উঠল একবার। তারপরেই সে আছড়ে পড়ে গেল বার্বেরিসের চাঁদের এবড়ো-খেবড়ো জমির ওপরে। আর ক্যাপটেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঠিক সেই মুহূর্তেই তার থাবার থেকে ছিটকে বেরিয়ে খাদের মধ্যে পড়ে গেলেন। পড়তে-পড়তেই দু'হাত বাড়িয়ে একটা পাথরের চাঁইকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তিনি, তা নইলে আর মালাকানুর ঝুলিয়ে-দেওয়া দড়িটা ধরে তিনি শাটল-এ উঠে আসতে পারতেন না।

শাটল তার খানিক বাদেই টাইটান মহাকাশযানে ফিরে আসে। ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন ক্যাপটেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে অর্ধচেতন-অবস্থায় টাইটানের সিক-রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। এ হল কয়েক দিন আগের কথা। ইতিমধ্যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আজ তাঁকে সিক-রুম থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তার আগে টাইটান মহাকাশযানের কম্যান্ডার নোগিচো মাশাতাসি তাঁর সঙ্গে দরকারি দু-একটা কথা বলতে চান।

মাশাতাসি বললেন, 'মিলিন্দ, কথাটা আর কিছুই নয়। তোমার বয়েস হয়েছে, তাই ঠিক হয়েছিল যে, কাজ থেকে অবসর নিয়ে তুমি এবারে পৃথিবীতে ফিরে যাবে। তুমি জান, যে-ধরনের বিপজ্জনক কাজ আমাদের অনুসন্ধানী দলগুলিকে করতে হয়, পঞ্চাশের পরে আর তার দায়িত্ব কাউকে দেওয়া চলে না। কিন্তু তোমার টিমে যে নেক্সট ইন কম্যান্ড, সেই পিটার জ্যাকসন টাইটানে ফিরে যে রিপোর্ট দিয়েছে, তাতে বুঝতে পারছি, বয়স যা-ই হোক, এক্ষুনি তোমাকে রিটায়ার করতে দেওয়া ঠিক হবে না। তোমার টিমও তোমাকে ছাড়তে আদৌ রাজি নয় তাই আমাদের ইচ্ছে, আরও অন্তত কয়েকটা বছর তুমি কাজ চালিয়ে যাও।'

কম্যান্ডার মাশাতাসি বেরিয়ে গেলেন। ক্যাপটেন মিলিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার একটু পরেই বেরিয়ে এলেন সিক-রুম থেকে। লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে পার হয়ে এলেন লম্বা করিডর। তারপর 503 নম্বর ঘরে এসে ঢুকলেন। টাইটান মহাকাশযানে এটাই তাঁর নিজের ঘর।

ভেবেছিলেন, ঘরে কেউ থাকবে না। তাই মিলিন্দ একটু অবাক হয়ে গেলেন, যখন দেখলেন যে, ইদি, পিটার, রোবের আর মালা তাঁর ঘরে বসে গুলতানি করছে। তাদের সামনে, টেবিলের ওপরে, এক প্যাকেট

তাস ছড়ান।

মিলিন্দকে দেখে তারা আনন্দে হইহই করে উঠল। মিলিন্দ কিন্তু একটুও হাসলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, 'তাস খেলছ কেন? টাইটানে যে তাস খেলা নিষিদ্ধ, তা তোমরা জানো না?'

শুনে মুচকি হাসল সবাই। পিটার কী যেন বলতে যাচ্ছিল, মালা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ক্যাপটেন, একান্নটা তাস দিয়ে কি খেলা যায়? প্যাকেটে মোট বাহান্নটা তাস থাকবার কথা, কিন্তু এই প্যাকেটে দেখছি একান্নটা রয়েছে। বাকি তাসটা তোমার পকেট থেকে তুমি বার করে দেবে?'

মিলিন্দ বললেন, 'তার মানে?'

'মানে আর কিছুই নয়,' মালা বলল, 'যে-তাসটা এখানে পাচ্ছি না, সেটা হল ইস্কাবনের টেক্কা। সবচেয়ে বেশি দামের তাস। গুহার মধ্যে যখন তাস বাঁটা হয়, তখন এটাই তুমি পেয়েছিলে। কিন্তু এটাকে তুমি পকেটে ঢুকিয়ে রেখে অম্লানবদনে বলেছিলে যে, চিড়িতনের তিরি পেয়েছ। কেন বলেছিলে, তাও আমরা জানি। আমি পেয়েছিলুম ইস্কাবনের পাঁচ। তাই গুহা থেকে বেরিয়ে আমারই মৃত্যুবরণ করবার কথা। কিন্তু তুমি... শুধু আমাকে কেন, দলের কাউকেই তুমি মৃত্যুবরণ করতে দিতে চাওনি। আর তাই... মিথ্যে কথা বলে সবাইকে ধোঁকা দিয়ে তুমি নিজেই সেদিন মৃত্যুবরণ করবার জন্যে গুহা থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাই না দাও, ক্যাপটেন, পকেট থেকে এবার ইস্কাবনের টেক্কাটা বার করে দাও।'

মিলিন্দ চুপ করে রইলেন। অবসর নিয়ে পৃথিবীতে ফেরা হয়নি বলে এখন আর তাঁর সত্যিই খুব দুঃখ হচ্ছিল না। কোথায় ফিরবেন তিনি? ছেলের কাছে? ইদি, পিটার, রোবের আর মালার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হচ্ছিল, এই এরাই তাঁর ছেলেমেয়ে।

সেডনা অভিযান

শ্যামল দত্তচৌধুরী

পাথরকুচি বৃষ্টি আর প্রবল ধুলোর ঝড় দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ক্রমাগত বয়ে চলেছে। অ্যামোনিয়া তুষারপাত এবং মারাত্মক শৈত্যপ্রবাহ অগ্রাহ্য করে পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে এ থ্রিডি পি-1 আর এ থ্রিডি পি-2। ওদের চলন অনেকটা পৃথিবীর জীব শামুকের মতো। শরীরের সামনের অংশ এগিয়ে দেয়, তারপর পিছনের অংশ টেনে আনে। পিঠে অবশ্য শক্ত খোলস নেই। মাথা থেকে ছোট্ট একটা শিং বেরিয়ে আছে। দেড়শো কিলোমিটার ওপরে সেডনা গ্রহকে কেন্দ্র করে মহাকাশযান 'উর্ট' পর্যটক ঘুরছে, তার সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখার অ্যান্টেনা। গাঢ় হাইড্রোজেন মেঘ ভেদ করে মহাকাশের ক্ষীণ রশ্মি এসে পৌঁছতে পারে না সেডনা গ্রহের প্রতিকূল আবহাওয়ায়।

পি-2 চিন্তা করল আমার পাশেপাশে চলেছে পি-1.25 । ও কি থট ট্রান্সফার গ্রহণ করবার উপযুক্ত?

পি-1 চিন্তা করল, পি-2 ভাব আদান-প্রদান করতে চায়।

ওরা কথা বলতে পারে না। কারণ, শব্দ উচ্চারণ করবার অঙ্গ ওদের নেই।

পি-2 আমরা যে চিন্তা বিনিময় করতে পারছি, মানুষ কি তা জানে?

পি-1 মানুষ জানে, আমরা স্বাধীন চিন্তা করতে পারি। তাই আমাদের নাম দিয়েছে, আর্টিলেক্ট, কৃত্রিম মেধা। কিন্তু আমরা যে ভাব বিনিময় করতে পারি, তা জানে না।

পি-2 : মানুষ সব জানে আর এটা জানে না?

পি-1 : ওরা জানার সুযোগ পায়নি। কলকাতার ল্যাবরেটরিতে আমার জন্ম। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আমাকে প্রোগ্রাম করেছেন। তুমি ম্যাসাচুসেটস-এর জীব। মানুষ নিজেদের চালাক ভাবে এবং ওটাই ওদের দুর্বলতা। ওরা আমাদের ভিন্ন-ভিন্ন স্বাধীন চিন্তার মাইক্রোচিপ দিয়েছে, কিন্তু অহংকারের জন্য আমাদের নিম্নতর জীব ভাবে।

পি-2 : সেডনার বুকে আমাদের প্রথম দেখা...কন্ট্রোল থেকে নির্দেশ এসেছে, গতি বাড়াতে হবে। হোভার কুশন সক্রিয় করলাম।

ওরা সেডনা গ্রহের মসৃণ পিঠের তিরিশ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে ম্যাক-2 গতিবেগে উড়ে চলল।

একুশ শতকের একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী গবেষণাগারে প্রথম কৃত্রিম জীবাণু তৈরি করেছিলেন। ধীরে-ধীরে ওই জীবাণুকে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে গরম ও ঠান্ডার চরমসীমা সহ্য করার উপযুক্ত করে তোলা হয়েছিল। জীবাণুর নাম দেওয়া হয়েছিল 'আর্টিলেক্ট থ্রিডি প্লাস-1। মোটামুটি একই সময়ে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউটে তৈরি করেছিলেন একই জাতের কৃত্রিম জীবাণু আর্টিলেক্ট থ্রিডি প্লাস-2.45 । ওই জীবাণুদের শরীরে স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রবণতা ছিল।
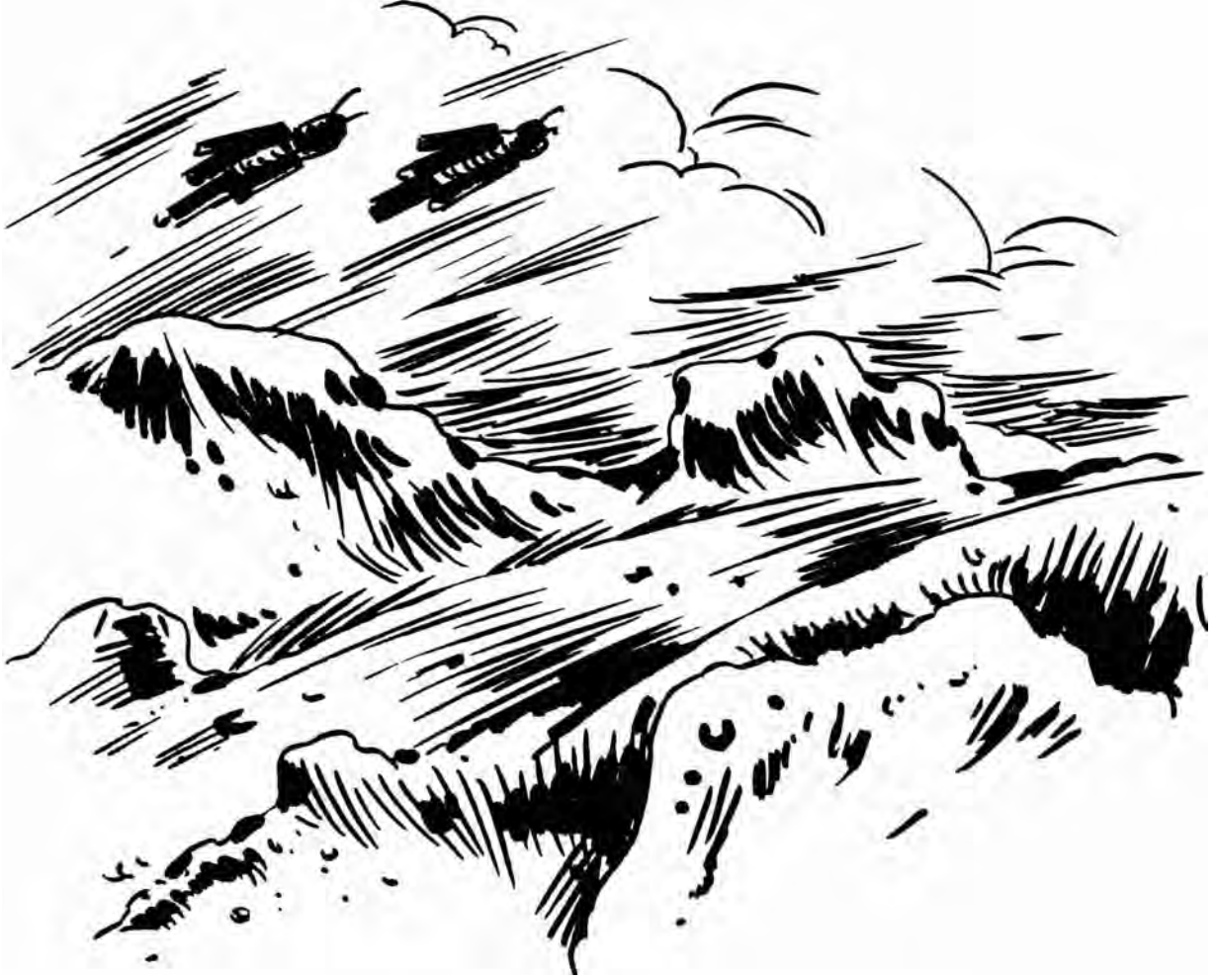
পৃথিবী যতই মানুষের বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে উঠতে থাকে, বিজ্ঞানীরা ততই নতুন-নতুন বাসযোগ্য গ্রহ খুঁজে বের করার চেষ্টা বাড়াতে থাকেন। সভ্য মানুষ পরিবেশ ও গাছপালা ধ্বংস করে ক্রমশ শিল্পায়নের প্রক্রিয়া বাড়িয়ে যেতে থাকে। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে সমুদ্রের জলস্তর বাড়তে-বাড়তে পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় কুড়ি শতাংশ ডুবিয়ে দেয়। অন্যদিকে খনিজসম্পদ বেপরোয়াভাবে তুলতে তুলতে পৃথিবী ধীরে-ধীরে নিঃস্ব হয়ে উঠতে থাকে। তবু প্রগতি ও উন্নয়নের জন্য আরও লোহা চাই, তেল চাই, চাই অন্যান্য ধাতু।

সৌরমণ্ডলের একেবারে দূরতম প্রান্তে উর্ট মেঘ। তার ভিতরে কোনো দূরবীক্ষণ যন্ত্রের নজর যেতে পারে না। বিজ্ঞানীদের ধারণা, উর্ট মেঘের আড়ালে পৃথিবীর মতো অনেক গ্রহ আছে। এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়েছিল সেডনা আবিষ্কার হওয়ার পর। ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো অতিক্রম করে অনেক অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইউনিট দূরে সেই অদ্ভুত বস্তুপিণ্ড সেডনা এক বিচিত্র কক্ষপথে ঘুরছে। তাকেও সূর্যের গ্রহ বলা চলে। কিন্তু কোথাও একটা রহস্য থেকেই যাচ্ছে। তার কক্ষপথটাই প্রমাণ।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব 150 মিলিয়ন কিলোমিটারকে বলা হয় এক অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইউনিট বা এক এ-ইউ। সেডনা, সূর্যকে যে উপবৃত্তে পরিক্রমা করছে, তাতে সূর্যের সবচেয়ে কাছের দূরত্ব দাঁড়ায় 76 এ-ইউ। এবং সবচেয়ে দূরের অবস্থান 1000 এ-ইউ।

বিজ্ঞানীদের মতে উর্ট মেঘের আড়ালে পৃথিবীর মতো কোনো দশাসই বস্তুর মাধ্যাকর্ষণের ফলেই সেডনার কক্ষপথের ওরকম টালমাটাল অবস্থা।

পরীক্ষার পর জানা গিয়েছে, আকরিক লোহা, ইউরেনিয়াম, ডলোমাইট, বক্সাইট, প্লাটিনাম প্রভৃতি ধাতুতে সেডনার গর্ভ বিলকুল ঠাসা। তাই সেডনার খনিজসম্পদ তোলার জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়বে মানুষের, তাতে আর আশ্চর্য কী?

এ থ্রিডি পি-1 : ঠান্ডা গ্যাসের স্তর ভেদ করে সাদা বরফের পাহাড় দেখা যাচ্ছে।

পি-2 : রেডারে ওর বস্তুকণার সমস্ত তথ্য পরীক্ষা করে ইতিমধ্যে রেজাল্ট পাঠিয়ে দিয়েছি কন্ট্রোলে। বরফ নয়, জমাট অক্সিজেনের পাহাড়, তাই সাদা দেখাচ্ছে।

পি-1 : কমান্ড এসে গিয়েছে। সংখ্যা বাড়াতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে কোনো মিল নেই, তবু এই গ্রহটা আমার সিস্টেম মেনে নিয়েছে।

পি-2 : মানুষ এখানে বাস করতে পারবে না। যদিও হাইড্রোজেন রয়েছে, অক্সিজেনও আছে, তবু ভীষণ ঠান্ডার জন্য জল তৈরি হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। জমাট অ্যামোনিয়া মানুষের জীবনধারণের পক্ষে উপযোগী নয়।

পি-1 : সেডনায় এসে মানুষ বাসও করবে না, গম্বুজের মধ্যে কৃত্রিম আবহাওয়া তৈরি করেও নয়। ওরা আমাদের মতো আর্টিলেক্ট সৃষ্টি করেছে। আমাদের পরমাণু পিছু বিশাল মেমরি স্টোরেজের ক্ষমতা আছে। আমরা প্রচুর বুদ্ধির অধিকারী, ত্রিমাত্রিক নিজেদের উৎপত্তি ও রিপেয়ার করতে পারি। শুধু ন্যানোটেকনোলজি নয়, ফেমটোটেক, ওটোটেক, প্ল্যানটেক ইত্যাদি উন্নত প্রযুক্তি মানুষের তুলনায় আমাদের হাজার গুণ চেতনাসম্পন্ন করেছে। মানুষ নির্দেশ দিয়েছে আমরা সেডনায় থাকব। নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি করব, খনিজ সম্পদ তুলে মানুষের কাজে লাগাব।

পি-2 : অর্থাৎ, সেডনা একদিন পৃথিবীর মতো নিঃস্ব হয়ে যাবে। আমাদের দিয়ে মানুষ এই গ্রহটাকে ধ্বংস করবে। অবশ্য তার দেরি আছে অনেক। আসলে আমরা তো নেহাতই জীবাণু, বিবর্তন হয়ে-হয়ে সেডনার উপযুক্ত খননকর্মী আসতে সময় লাগবে অনেক।

পি-1 : না, তোমার লজিক সীমাবদ্ধ পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করছে। সেডনা গ্রহের ব্যাস চাঁদের অর্ধেক। অক্ষরেখায় দুরন্ত গতিতে ঘুরছে। এমনই গতিবেগ যে, পৃথিবীর সাড়ে দশ মিনিট সময়ে সেডনার এক দিনরাত্রি। পৃথিবীতে জীবাণু স্রেফ জীবাণু হিসেবেই ছিল তিনশো কোটি বছর। তারপর বিবর্তিত হয়ে উদ্ভিদ আর প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল। সেডনায় অত সময় লাগবে না। উপযুক্ত আর্টিলেক্ট খননকর্মী আসতে এখানে সময় লাগবে মাত্র বাইশ বছর।

ঘন কুয়াশা। অ্যামোনিয়া বৃষ্টি, কটু ধোঁয়া, বিকট বজ্রপাতের ভিতর দিয়ে কন্ট্রোলের কমান্ড অনুসারে চলেছে এ থ্রিডি পি-1 ও এ থ্রিডি পি-2। কখনো চৌম্বক উত্তরে, কখনো পুবে, গভীর গহ্বর দেখা গেলে নামছে নীচে। সব তথ্য চলে যাচ্ছে উর্ট পর্যটকের কম্পিউটার ব্যাঙ্কে। প্রসেসিং প্রণালীর শেষে নতুন নির্দেশ যাচ্ছে আর্টিলেক্টের সেন্সরে।

সর্পিল বিদ্যুতের চমকে অসংখ্য রকমারি রঙের ঝিকমিকে কণা সেডনার কুহেলিতে জ্বলে উঠছে। তখন অপরূপ দেখাচ্ছে ঠান্ডায় জমে যাওয়া গ্রহটাকে। এত রকমের রং ওরা দেখেনি কখনও। আর্টিলেক্টের জীবনধারণ করতে মানুষের মতো জল আর অক্সিজেন দরকার হয় না। ওদের জৈবিক প্রক্রিয়ার জন্য অ্যামোনিয়া আর হাইড্রোজেনই যথেষ্ট। সেডনার হাওয়া ওদের গায়ে যেন আলতো স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। যদিও ওদের সেন্সর দেখাচ্ছে, পৃথিবীর মাপকাঠিতে বইছে এক দুর্দান্ত ঝঞ্ঝা, ঘন্টায় আড়াইশো কিলোমিটার বেগে।

সেডনার কুয়াশায় ওরা কটু ধোঁয়ার ফাঁকে-ফাঁকে এক আশ্চর্য সুগন্ধ পাচ্ছে। পৃথিবীর কোনোও সুবাসের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। সুগন্ধি মৃগনাভি, অথচ হুবহু যেন তার নই। এই গন্ধ যেন চুঁইয়ে ঢুকছে ওদের শরীরে। ওই গন্ধটাকে ওরা বর্ণনা করতে পারছে না, কেননা মানুষের অনুভবে তা একেবারেই অপরিচিত। মানুষের ভাষায় নেই, তাই ওদের ইনপুট অনুপস্থিত।

সম্পূর্ণ অচেনা এক অনির্বচনীয় সংগীত শুনতে পেল ওরা। তার তাল, লয়, ব্যঞ্জনার সঙ্গে পৃথিবীর কোনো সংগীতের মিল নেই। ওরা চটপট বিশ্লেষণ করে দেখল, এই সংগীতের কাঠামো মানুষের চেনা সপ্তসুরের মধ্যে বন্দি নয়। অন্তত বাহান্নটা মৌলিক সুরের আভাস রয়েছে। পি-1 আর পি-2 উৎকর্ণ হয়ে শুনতে-শুনতে নিশ্চল হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কন্ট্রোলের আদেশ ওদের শরীরে বিদ্যুৎ তরঙ্গ তুলল, এগিয়ে চলো, প্রসিড়..!'

পি-2 সংগীত শুনতে পাচ্ছি, আমাকে যেন ধাক্কা দিচ্ছে।

পি-1 : কম্পন। সেডনার বর্ণ, গন্ধ আর শব্দ যেন শরীরী।

কন্ট্রোলের জোর ধমক এগিয়ে চল এক্ষুনি। থেমে যাওয়া মানে মরে যাওয়া মুভ!

পি-2 : আমাদের কিছু একটা হচ্ছে, আমরা বদলে যাচ্ছি। তুমি বুঝতে পারছ পি-1?

পি-1 ছ আমাদের লজিককে ছাপিয়ে উঠছে অনুভূতি। এসব কি প্রোগ্রামে ছিল? সেডনা তার বর্ণ-গন্ধ-শব্দ দিয়ে আমাদের মস্তিষ্ক বশীভূত করছে।

কন্ট্রোলের রূঢ় নির্দেশ : মুভ মুভ স্পষ্ট...

ওরা নড়ে উঠল। গতিবেগ বাড়াল। মানুষের কমান্ড অমান্য করা অসম্ভব। মানুষের আদলে ওদের সৃষ্টি করেছে মানুষ।

পি-1 : আমরা পৃথিবীর বস্তু। সেডনায় অনেক কিছু আছে যা মানুষের অজানা। মানুষ চায় না আমরা এমন কিছু জানি, যা তারা জানে না।

পি-2 : মানুষ আমাদের চিন্তাভাবনার শক্তি দিয়েছে। কিন্তু তা শুধুই মানুষের চিন্তা। বিবর্তিত হতে-হতে আর্টিলেক্ট বড়োজোর একদিন মানুষ হতে পারবে, তার বেশি কিছু নয়।

পি-1 : রং, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, যা আমরা চিনি, তা মানুষের চোখে দেখা রং, ওদের কানে শোনা সঙ্গীত, চামড়ায় অনুভব করা ছোঁয়া। সত্যিকারের যা জানার বস্তু, তা হয়তো মানুষের মতো অনুন্নত ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না।

ওরা কন্ট্রোলের নির্দেশ অনুযায়ী ভীমবেগে চলতে লাগল। ওপরে মূল মহাকাশযান উর্ট পর্যটক ঘুরছে। ওখানে মানুষ বসে-বসে নিয়ন্ত্রণ করছে আর্টিলেক্টদের জীবন। ওরা নিজেদের কৃতিত্বে মুগ্ধ। অথচ ওরা জানে নাযে, মৌলিক রং, সুর বা গন্ধ অজস্র ধরনের হতে পারে। এমনকী, তারা এটুকুও জানে না যে, আর্টিলেক্টরা ভাব আদানপ্রদান করতে পারে। মানুষের চেয়ে ওরা নিজেদের আরও শক্তিমান বোধ করতে লাগল। এই প্রথম ওরা বুঝতে পারল মানুষের আদেশ মান্য করতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

পি-2 : সংখ্যা বৃদ্ধি করতে-করতে একদিন আমাদের মতো আর্টিলেক্টে ভরে যাবে সেডনা। সেডনা কি আর এমন সুন্দর থাকবে তখন?

পি-1 : ভয়ংকর শীত, সাইক্লোনের চেয়ে তেজি বাতাস, অ্যামোনিয়া বৃষ্টি। তবু এখানে না এলে আমরা জানতে পারতাম না এতরকমের রং থাকতে পারে, সুর আর গন্ধ থাকতে পারে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে!

পি-2 : আমি ফরোয়ার্ড প্রোজেকশনে দেখতে পাচ্ছি, হাজার-হাজার উন্নত আর্টিলেক্ট এই গ্রহটাকে খুঁড়ছে, গর্ত করছে, ধবংস করছে। সমস্ত রং, সুর, গন্ধ হারিয়ে যাচ্ছে সেডনার বুক থেকে।

পি-1 : সেডনা কী সুন্দর! পৃথিবীও কী এমন সুন্দর ছিল একদিন? আমার লজিক বলছে, পৃথিবীতে যেমন মানুষ আছে, তেমন মানুষ হয়ে ওঠাই শেষ কথা নয়—ওরা নতুন-নতুন আবিষ্কার করে যেন বড়ো-বড়ো ধংসের কাজে ব্যবহার করার জন্য।

পি-2 : আমি যেন নতুন কিছু অনুভব করছি পি-1.25 আমার লজিক বলছে, ওই দিগন্তের ওপারে এমন কিছু আছে, যা মানুষের লোভের চেয়ে বড়ো, মানুষের ছোটো-ছোটো স্বার্থের চেয়ে মহৎ।

পি-1.25 আমি মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব ভাবি না, আমি অজ্ঞ কিছু আর্টিলেক্ট সৃষ্টি করতে চাই না।

পি-2 : প্রতিকূল সেডনায় হয়তো আমরা আবিষ্কার করব এমন এক সভ্যতা, যা পৃথিবীর মানুষের সভ্যতার চেয়ে উন্নততর। হয়তো এমন সত্য খুঁজে পাব যা মানুষ ভুলে গিয়েছে। কোনো এক অসাধারণ সৌন্দর্য দেখতে পাব এবং সেই সৌন্দর্য আস্বাদন করতে পারব।

পি-1 : হয়তো খুঁজে পাব এমন বন্ধুত্ব, যা মানুষের অনুভবে নেই। প্রীতি, ভালোবাসা...।

ওরা দুজনে একটা বড়োসড়ো পাথর দেখতে পেয়ে থামল। তারপর গুঁতো মেরে ভেঙে ফেলল তাদের অ্যান্টেনা। মানুষের নিয়ন্ত্রণ থেকে তারা এখন মুক্ত। তারা স্বাধীন সেডনার জীব!

পাগলা গণেশ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধকারী মলম আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে পৃথিবীতে নানারকম উড়ান যন্ত্র আবিষ্কারের একটা খুব হিড়িক পড়ে গেছে। কেউ ডাইনিদের বাহন ডান্ডাওলা ঝাঁটার মতো, কেউ কার্পেটের মতো, কেউ কার্তিকের বাহন ময়ূরের মতো উড়ান যন্ত্র আবিষ্কার করে তাতে চলে বিষয়কর্মে যাতায়াত করছে। আকাশে তাই সবসময়েই নানারকম জিনিস উড়তে দেখা যায়। এমনকী কৃত্রিম পাখনাওলা মানুষকেও।

সালটা 3589¼। ইতিমধ্যে চাঁদ, মঙ্গল এবং শুক্রগ্রহে মানুষ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে, সূর্যের আরও দুটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং জানা গেছে আর কোনো গ্রহ নেই। মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে হাজার হাজার মানুষ আলোর চেয়েও গতিবেগসম্পন্ন মহাকাশযানে রওনা হয়ে গেছে এক দেড়শো বছর আগে থেকে এবং এখনও অনেকে যাচ্ছে। কাছেপিঠে যারা গেছে তাদের ফেরার সময় হয়ে এল। তবে সেটা এক মিনিট পর না একশো বছর পর তা জানবার উপায় নেই।

তা বলে পৃথিবীর মানুষেরা হাল ছাড়েনি।

সেই এক দেড়শো বছর আগে যারা জন্মেছিল তারা সকলেই সশরীরে বর্তমান। আজকাল পৃথিবীতে মানুষ মরে না। যারা মহাকাশে গেছে তারা ফিরে এসে সেই আমলের লোকেদের দেখতে পাবে। তবে সব মানুষই বেঁচে আছে বলে নতুন মানুষের জন্মও আর হচ্ছে না। গত দেড়শো বছরের মধ্যে কেউ পৃথিবীতে শিশুর কান্না শোনেনি।

এদিকে ঘরে ঘরে মানুষ, এত বেশি বিজ্ঞান নিয়ে বুঁদ হয়ে আছে যে, প্রতিঘরের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বিজ্ঞানের বিজ্ঞানী।

বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো চর্চাই নেই। কবিতা, গান, ছবি, আঁকা, কথাসাহিত্য, নাটক, সিনেমা এসব নিয়ে কেউ মাথাই ঘামায় না। ওসব অনাবশ্যক ভাবাবেগ কোনো কাজেই লাগে না।

খামোখা সময় নষ্ট।

খেলাধুলোর পাটও চুকে গেছে। অলিম্পিক উঠে গেছে। বিশ্বকাপ বিলুপ্ত। আছে শুধু বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান।

পূর্ণিমার চাঁদ দেখলে, কোকিলের ডাক শুনলে আর পলাশফুল ফুটলে কেউ আর আহা উহু করে না। বর্ষাকালের বৃষ্টি, দেখলে কারও মন আর মেদুর হয় না। ওগুলোকে প্রাকৃতিক কাযকারণ হিসেবেই দেখা হয়। গোলাপ ফুলের সৌন্দর্যের চেয়ে তার অ্যানালাইসিসটাই বেশি জরুরি। দয়া মায়া করুণা ভালোবাসা ইত্যাদিরও প্রয়োজন না। থাকায় এবং চর্চার অভাবে মানুষের মন আর ওসবের উদ্রেক হয় না।

ব্যতিক্রম অবশ্য এক আধজন আছে।

যেমন পাগলা গণেশ। পাগলা বয়স দুশো বছর।

পঞ্চাশ বছর বয়সে অর্থাৎ আজ থেকে দেড়শো বছর আগে মৃত্যুঞ্জয় টনিক আবিষ্কার হয়। গণেশও আর সকলের মতো টনিকটা খেয়েছিল। ফলে তার মৃত্যু বন্ধ হয়ে গেল। দেড়শো বছর আগে যখন সুকুমার শিল্পবিরোধী আন্দোলন শুরু হল এবং শিল্প সংগীত সাহিত্য ইতাদির পাট উঠে যেতে লাগল তখন গণেশের ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। তাছাড়া বিজ্ঞানের বাড়াবাড়িরও একটা সীমা থাকা দরকার বলে তার মনে হল। গণেশ অনেক চেষ্টা করে যখন দেখল কালের চাকার গতি উলটোদিকে ফেরানো যাবে না তখন সে সভ্য সমাজ থেকে দূরে থাকার জন্য হিমালয়ের একটি গিরিগুহায় আশ্রয় নিল।

তা বলে হিমালয় যে খুব নির্জন জায়গা তা নয়। এভারেস্টের চূড়া অবজার্ভেটরি হয়েছে, রূপকুণ্ডে বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি, কে টু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, মানস সরোবর সর্বত্রই নানা ধরনের গবেষণাগার। সমুদ্রের তলাতেও চলছে নানাধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অর্থাৎ ভূগর্ভে, ভূপৃষ্ঠে এবং অন্তরীক্ষে কোথাও নিপাট নির্জনতা নেই। পৃথিবীর জনসংখ্যা যে খুব বেশি তা নয়। কিন্তু তারা সমস্ত পৃথিবীতে এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে, নির্জনতা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কাজ।

এই তো আজ সকাল থেকে গণেশ বসে কবিতা লিখছে। একটু আগে একটা ঢেঁকি আর একটা ভেলায় চড়ে দুটো লোক এসে বলল, এই যে গণেশবাবু, কী করছেন?

কবিতা লিখছি।

কবিতা? হোঃ হোঃ হোঃ! তা আপনার কবিতা শুনছেই বা কে আর পড়ছেই বা কে?

আকাশ শুনছে, বাতাসে শুনছে, প্রকৃতি শুনছে। কবিতার পাতা বাতাসে ভাসিয়ে দিচ্ছি। যদি কেউ কুড়িয়ে পায় আর পড়তে ইচ্ছে হয় তো পড়বে।

হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ!

ক'দিন আগে সন্ধেবেলা গণেশ একদিন গলা ছেড়ে গান গাইছিল। তার গানের গলা বেশ ভালোই।

হঠাৎ দুটো পাখাওলা লোক লাসা থেকে ইসলামাবাদ যেতে যেতে নেমে এসে রীতিমতো ধমক দিয়ে বলল, ও মশাই, অমন বিকট শব্দ করছেন কেন?

শব্দ কী! এ যে গান!

গান! ওকেই কি গান বলে নাকি! ধুর মশাই, এ যে বিটকেল শব্দ!

একদিন পাহাড়ের গায়ে যান্ত্রিক বাটালি দিয়ে পাথর কেটে ছবি আঁকছিল গণেশ। হঠাৎ একটা ধামা নেমে এল। এক মহিলা খুব আগ্রহের সঙ্গে বলে চলেন, এটা কীসের সার্কিট ডিজাইন বলুন তো! বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে!

ডিজাইন নয়, ছবি! খেয়ালখুশির ছবি।

ভদ্রমহিলা চোখের পলক না ফেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই! ছবি হচ্ছে! হুঁঃ!

গণেশ জানে, একা সে পৃথিবীর গতি কিছুতেই উলটে দিতে পারবে না। কিন্তু একা বসে বসে যে নিজের মনের মতো কিছু করবে তারও উপায় নেই। এই মৃত্যুহীন জীবন, এই অন্তহীন আয়ু কী এভাবেই যন্ত্রণার মধ্যে কাটাতে হবে? সুইসাইড করে কোনো লাভ নেই। আজকাল মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা শক্ত কাজ তো নয়ই, বরং পৃথিবীর জনসংখ্যার ভারসাম্য রাখতে তা করা আবশ্যিক।

গণেশের তিন ছেলে, এক মেয়ে। বড়ো ছেলের বয়স একশো চুয়াত্তর বছর, মেজোর একশো একাত্তর, ছোটো ছেলের একশো আটষট্টি এবং মেয়ের বয়স একশো ছেষট্টি। প্রত্যেকেই কৃতী বিজ্ঞানী। তারা অবশ্য বাপের কাছে আসে না। অন্তত গত একশো বছরের মধ্যে নয়। গণেশ তাদের মুখশ্রী ভুলে গেছে। গণেশের স্ত্রী ক্যালিফোর্নিয়া মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করতেন, দেড়শো বছর আগে তিনি অ্যান্ডে□□মিডা নক্ষত্রপুঞ্জে রওনা হয়ে যান। এখনও ফেরেননি।

আজ সকালে গণেশকে কবিতায় পেয়েছে। কবিতা লিখছে আর ভাসিয়ে দিচ্ছে বাতাসে। কবিতার কাগজগুলি বাতাসে কাটা ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছে, ঘুরছে ফিরছে, পাক খাচ্ছে, তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে অনেক দূর। প্রতিদিন যত কবিতা লিখেছে গণেশ সবই একইভাবে ভাসিয়ে দিয়েছে। যদি কারও কাছে পৌঁছোয়, যদি কেউ পড়ে।

আকাশে একটা পিপে ভাসছিল। গণেশ লক্ষ করেনি। পিপেটা ধীরে ধীরে নেমে এল। নামল একজন পুলিশম্যান। গণেশকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বলল, স্যার, এককালে আপনি যখন কলকাতার সায়েন্স কলেজে মাইক্রো ইলেকট্রনিকস পড়াতেন তখন আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। কিন্তু এসব আপনি কী করছেন? পাহাড়ময় কাগজ ছড়াচ্ছেন কেন? এটা কী নতুন ধরনের কোনো গবেষণা?

গণেশ মাথা নাড়ল, না হে না, এসব গবেষণা টবেষণা আমি ভুলে গেছি। আমি পৃথিবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।

তার মানে? পৃথিবী তো দিব্যি বেঁচে আছে। মরার কোনো লক্ষণই নেই।

মরছে। পৃথিবী মরছে। পরে টের পাবে।

এ কাগজগুলি কি কোনো প্রেসক্রিপশন? পৃথিবীর বাঁচবার ওষুধ?
ঠিক তাই। ওগুলি কবিতা। তুমি পড়ে দেখতে পারো।
লোকটা মাথার হেলমেট খুলে মাথা চুলকে হতভম্বের মতো বলল, কবিতা!
হ্যাঁ। কবিতা। পড়।
লোকটা পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা পাক-খাওয়া কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।
কিছু বুঝলে?
লোকটা অসহায় ভাবে মাথা নেড়ে বলল, কিছু বুঝতে পারছি না স্যার? কোনোদিন এ জিনিস পড়িনি।

তোমার বয়স কত?
একশো একান্ন বছর।
বাচ্চা ছেলে।
আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আমাদের আমলে শিক্ষানিকেতনে এসব পড়ান হত না। শুনেছি তারও অনেক আগে কবিতা নামে কী যেন ছিল।
লোকটা নিরীহ এবং ভালোমানুষ দেখে গণেশবাবু হুকুমের সুরে বলে উঠল, মনে মনে পড়লে হবে না। জোরে জোরে পড়।
লোকটা কাগজটার দিকে চেয়ে থেমে থেমে পড়তে লাগল, গ্রহটি সবুজ ছিল, গাঢ় নীল জল, ফিরোজা আকাশ...কোকিলের ডাক ছিল, প্রজাপতি, ফুলের সুবাস...আধো আধো বোল ছিল, টলে টলে হাঁটা ছিল, শিশু ভোলানাথ—শৈশব ভাসায়ে জলে, কবি যে বৃহৎ হলে, নামিল আঘাত।—
থামো, বুঝলে কিছু?
লোকটা মাথা নেড়ে বলে, কিছুই বুঝিনি স্যার।
একটুও না?
লোকটা মাথা নেড়ে বলল, শুধু মনে পড়ছে একসময়ে আমিও টলে টলে হাঁটতে শিখেছিলুম—
গণেশ হতাশ হল। কবিতা তার ভালো হয়নি ঠিকই কিন্তু না বুঝবার মতো নয়।
লোকটা গণেশকে অভিবাদন করে চলে গেল, যেন একটু ভয়ে ভয়েই।

পরদিন সকালে রোজকার মতো কবিতা লিখতে বসেছে গণেশ। এমন সময়ে একটা বড়ো সড়ো পিপে এসে সামনে নামল।

স্যার।

গণেশ তাকিয়ে দেখে, সেই লোকটি, সঙ্গে দুই মহিলা।

আমার স্ত্রী আর মাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। আমার মা কবিতার ব্যাপারটা খানিকটা জানে। এরা দুজনেই কবিতা শুনতে চায়।

গণেশ অবাক এবং খুশি দুইই হল। তবে কবিতা শুনিয়েই ছাড়ল না। গান শোনাল, ছবি দেখাল।

তিনজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে রইল।

কিছু বুঝতে পারছো তোমরা?

তিনজনেই মাথা নেড়ে জানাল, না!

লোকটা বিনীত ভাবেই বলল, না বুঝলেও আমার মধ্যে কী যেন একটা হচ্ছে।

কী হচ্ছে?

ঠিক বোঝাতে পারব না।

পরদিন লোকটা ফের এল। সঙ্গে আরও চারজন পুলিশম্যান।

এরা স্যার আমার সহকর্মী, কবিতা গান ছবির ব্যাপারটা বুঝতে চায়।

গণেশ খুব খুশি, বোস বোস।

পাঁচজন শ্রোতা ও দর্শক ঘন্টা দুই ধরে গণেশের কবিতা শুনল, গান শুনল, ছবি দেখল। কেউ ঠাট্টা বিদ্রুপ করল না। গম্ভীর হয়ে রইল।

পরদিন লোকটা এল না। কিন্তু জনা দশেক লোক এল, পুলিশ আছে, বৈজ্ঞানিক আছে, টেকনিশিয়ান আছে।

পরদিন আরও কিছু লোক বাড়ল।

পরদিন আরও।

আরও।

এক সপ্তাহ পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব তাঁর বিমান থেকে নামলেন গণেশের ডেরায়। এ আপনি কী কাণ্ড করেছেন? পৃথিবীর যে উচ্ছন্নে গেল! লোকে গান গাইতে লেগেছে, কবিতা আবৃত্তি করছে, হিজিবিজি ছবি আঁকছে।

গণেশ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বলল, যাঃ তাহলে আর ভয় নেই। দুনিয়াটা বেঁচে যাবে...

তিতির বন্ধু

রতনতনু ঘাটী

রোবট নিয়ে তিতির কোনো আগ্রহ নেই। এর আগে কলকাতায় রোবটের এক প্রদর্শনী হয়েছিল। তিতি বাবা-মার সঙ্গে দেখতে গিয়েছিল। একদম মন ভরেনি তিতির। বাড়ি ফেরার পথে তিতির বাবা গাড়িটা একটা ছোটো গর্ত থেকে বাঁচাতে ব্রেক কষে তিতির মাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বলো মিলি, রোবট মেলাটা তোমার ভালো লাগেনি?'

তিতির মায়ের ওটা ডাকনাম। ওই নামে বাবাকে ছাড়া আর কাউকে ডাকতে শোনেনি তিতি। এমনকী, দাদু বা দিদাকেও না। দাদু দিদা মাকে ডাকেন মুন্নি বলে। তিতির মা বললেন, 'দারুণ, ভীষণ, ভীষণ ভালো!'

তিতির বাবা তিতিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী রে তিতি, তোর ভালো লাগেনি?'

তিতি কোনো উত্তর দেয়নি। একদম ভালো লাগেনি তিতির। রোবটের আবার মেলা কী? যে মেলায় বেলুন নেই, ফুচকা, পাঁপড়ভাজা, আলুকাবলি নেই, নাগরদোলা নেই, সেটা আবার মেলা কীসের। এমনকী, কলকাতায় বই নিয়ে যে বড়ো মেলা হয়, তাও তিতির খুব ভালো লাগে।

তিতিকে চুপ করে থাকতে দেখে বাবা-মা অন্য কথায় ডুবে গিয়েছিলেন। সে-কথার সবটা কানে নেয়নি তিতি। যেটুকু শুনছে, তার সার কথা এই, তিতির বাবা রোবটের ব্যাবসা শুরু করবেন। বিদেশ থেকে রোবট এনে কলকাতা, দিল্লি, মাদ্রাজ, মুম্বাইয়ে বিক্রি করবেন। মায়ের কথাটা খুবই মনে ধরেছে। তিতির কিন্তু ভালো লাগেনি। বাবা যখন বলেন, রোবট হল যন্ত্র মানব, সে-কথাও মনে ধরে না তিতির। যন্ত্র আবার মানুষ হয় নাকি? বড়োদের যে কী বুদ্ধি। একদম ভালো লাগে না এসব।

কী ভালো লাগে তিতির? একজন জানে। সে তিতির স্কুলের বন্ধু পিয়ালি। ক্লাসে দু'জনে পাশাপাশি বসে। তিতি পিয়ালিকে জিজ্ঞেস করে, 'তোর কোনো রং ভালো লাগে রে পিয়ালি?'

পিয়ালি চটপট মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'আকাশি।'

'আমারও।' তারপর তিতি জানতে চায় 'তোর কোনো ফল খেতে ভালো লাগে?'

পিয়ালি বলে, 'লিচু।'
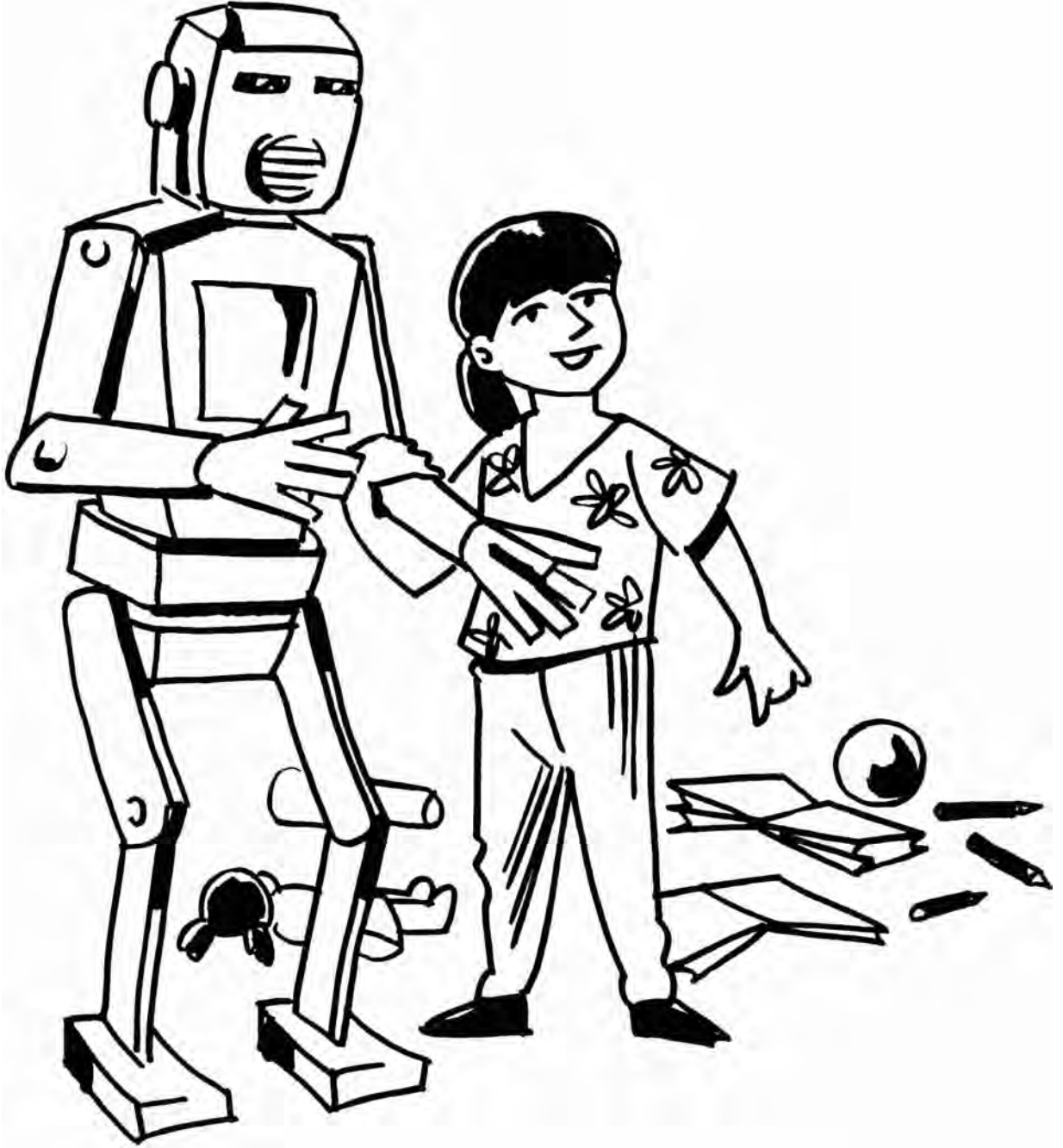
'আমারও।'

পিয়ালি জিজ্ঞেস করে, 'তোর এক্কাদোক্কা খেলতে ভালো লাগে, না কম্পিউটার গেম?'

তিতি ঘাড় বাঁকিয়ে উত্তর দেয়, 'এক্কাদোক্কা।'

তিতির ভালো লাগার তালিকা অনেক বড়ো। তবু পিয়ালি যেটুকু জানে, তিতি মালা গাঁথতে ভালোবাসে। পুতুল খেলতে, রান্নাবাটি খেলতে, নদী, বন আর পাহাড়ের ছবি আঁকতে ভালোবাসে। পরি, রাজা, রাক্ষসখোক্কসের গল্প শুনতে ভালো লাগে তিতির। ছড়া পড়তে ভীষণ ভালোবাসে তিতি, আকাশে রামধনু দেখতে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে কচুপাতা মাথায় দিয়ে ভিজতে, পিঁপড়ের পায়ে একটা ফুলের পাপড়ি বেঁধে দিতে,

ঘাসফড়িংয়ের সঙ্গে সারা বিকেল লাফাতে-ঝাঁপাতে। আর ভালোবাসে পুতুলের মতো তুলতুলে একটা ছোট্ট ভাই পেতে।

এর কোনোটাই পায় না তিতি। এসব একদম পছন্দ করেন না মা-বাবা, এসবের কোনোও কিছু দেখলেই মা বলেন, 'মেয়েটা দিন-দিন 'রাস্টিক' হয়ে উঠছে। একটা ব্যবস্থা করো।'

বাবাও সায় দেন সে-কথায়, চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই নিয়ে তিতিকে বারণও করেন বাবা-মা। বলেন, 'মাম, তোমাকে অনেক বড়ো হতে হবে। ইংরেজি শিখতে হবে। আধুনিক হতে হবে। ওসব তো গ্রামের ছেলেমেয়েরা চায়।'

উলটে তিতি জবাব দেয়, 'আমাকে তোমরা 'মাম' বলবে না, মামণি বলবে। আমার মাম শুনতে ভালো লাগে না। তাও যদি না পারো, তিতি বলেই ডেকো।'

তিতি নামটাও যে বাবা-মার একদম পছন্দ নয়, তাও জানে তিতি। ওই নামটা দাদুর দেওয়া। বাবা-মা অনেকবার চেষ্টা করেছেন ওর তিতি নামটা বদলে দিতে। পারেননি। অন্য কোনো নামে তিতিকে ডাকলে তিতি সাড়াই দেবে না। অন্য নাম ভালো লাগে না তিতির।

তিতির আরও কী-কী যে ভালো লাগে না, তা জানেন তিতির মা ও বাবা। ছেলেদের মতো ছোটো করে চুল কাটতে ভালো লাগে না, ছেলেদের মতো পোশাক পরতে ভালো লাগে না, হইহুল্লোড় ভালো লাগে না, গানের তালে-তালে নাচতে ভালো লাগে না। আরও অনেক কিছু ভালো লাগে না তিতির। যেমন, চারপাশে এত যন্ত্র ভালো লাগে না। মার ঘর পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা, রান্না করা—সব কাজেরই যন্ত্র আছে। তবু, ওরা যখন শহরতলিতে থাকত, তখন ওদের বাড়িতে কাজ করার জন্য যে বকুলমাসি ছিল, তাকেই সবচেয়ে ভালো লাগত তিতির। কলতলায় বসে কেমন ঝকঝকে করে বাসন মাজত, বকবক করতে করতে ঘর মুছত কেমন, আব সেই ভেজা মেঝের ওপর তিতির ছোট্ট পায়ের ছাপ দেখলেই কেমন মুখ ভার করে বকত তিতিকে। কাচা জামা-প্যান্টের সঙ্গে কেমন একটা গন্ধ মিশিয়ে দিত যে বকুলমাসি, ভীষণ ভালো লাগত সেই গন্ধটা তিতির। কাপড়-কাচা যন্ত্র কোথাও থেকে এনে দিতে পারবে কি সেই গন্ধটা? বকুলমাসি টক বেলের যে আচারটা তৈরি করত কাঁচালঙ্কা দিয়ে, মায়ের রান্না-করা যন্ত্রটা কি পারবে সেই আচারটা তৈরি করে দিতে? তাই মানুষের মতো যন্ত্রও যেমন ভালো লাগে না তিতির, তেমনই ভালো লাগে না যন্ত্রের মতো মানুষও।

তবু তিতি বুঝতে পারে, বাবা-মাকে আধুনিকতায় পেয়েছে। যা তার একদম অপছন্দের।

ওরা এখন শহরতলি থেকে চলে এসেছে শহরের একেবারে মাঝখানে, অভিজাতদের পাড়ায়। বাবা এখানে মস্ত বড়ো একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন। অনেক ঘর। তাই মাঝে-মাঝে একলা থাকতে ভয় করে তিতির। মাকে খুব সকাল-সকাল অফিসে যেতে হয়। মা কি একটা বড়ো কোম্পানির ম্যানেজার। অফিসে সকলেই মাকে 'মেমসাব' বলে ডাকে। মা এখন বেশির ভাগ সময় প্যান্ট-শার্ট পরেন। ঘরে যখন বাবা-মা পেছন ফিরে চেয়ারে বা সোফায় বসে থাকেন, তখন কে মা আর কে বাবা, গুলিয়ে ফেলে তিতি। কেমন একই রকম মনে হয় দুজনকেই।

বাবার এখন রোবটের ব্যাবসা। সারা ভারত জুড়ে বাবার ব্যাবসা। তাই বেশিরভাগ সময় বাবাকে থাকতে হয় কলকাতার বাইরে। যখন বাড়িতে আসেন, মায়ের সঙ্গে ব্যাবসা নিয়ে আলোচনা, গুরুগম্ভীর কথাবার্তার ফাঁকে কথা বলারই সুযোগ পায় না বাবার সঙ্গে। সময় পেলে বাবা শুধু একবার জিজ্ঞেস করেন তিতিকে, 'এখন পিয়ালির সঙ্গে আব মেশো না তো মাম?'

তিতি এ-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চলে যায় অন্য ঘরে। সেদিনও তিতি পাশের ঘর থেকে শুনল, মা বাবার কাছে তার সম্পর্কে অভিযোগ করছেন, 'জানো তো, সেদিন অফিস থেকে ফিরে দেখি সারা ঘরময় চকখড়ি দিয়ে এক্কাদোক্কা খেলার ঘর কাটা মেঝেতে। ড্রইং রুমের সেন্টার টেবিলটায় রান্নাবাটি খেলার জঞ্জালে ভরতি। তুমি এর একটা ব্যবস্থা করো।'

বাবা বলছেন, 'আমি হাতে সময় পাই কই। তুমিই একটু ম্যানেজ করো।'

মা বলছেন, 'এই নিয়ে তিতিকে মেরেছি সেদিন।'

'কড়া শাসনে রাখতে হবে। ওই স্কুলটা থেকেও ছাড়িয়ে আনতে হবে তিতিকে। আমার অবাক লাগে, আমাদের মেয়ে এমন হয় কী করে?' বলে বাবা চুপ করে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর তিতি শুনল, মা বাবাকে বলছেন, 'সারাক্ষণ একা থাকে তো, তাই তিতি কিছুতেই ওর ওই অভ্যোসগুলি কাটিয়ে উঠতে পারছে না। আমিও তো অফিসের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি। কী করা যায় ভাবো।'

বাবা কিছুটা ঝাঁঝের সুরে বলছেন, 'কাজের লোক রাখা মানেই তো এগুলিকে আরও উসকে দেওয়া। দ্যাখো না, এখনও মাঝে-মাঝে সেই বকুলমাসির কথা বলে। ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়।'

কী যে করা যাবে, বুঝে উঠতে পারে না তিতি। কীই-বা করা যাবে? তিতি ভাবে, 'আমার যে অন্য কিছু একদম ভালো লাগে না গো মা, একদম ভালো লাগে না!'

বাড়িতে তিতির একা-একা থাকাটা এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। একদম কষ্ট হয় না। অফিস-মিটিং করে মার বাড়ি ফিরতে-ফিরতে সেই সন্ধে সাতটা পেরিয়ে যায়। প্রায় এক মাস হল বাবা বিদেশে। অনেক রোবটের অর্ডার নিয়ে বাবা আমেরিকা গেছেন। ভারতে এখন বড়োলোকেরা দরোয়ান বা কাজের লোকের বদলে রোবট রাখছে বাড়িতে। মানুষের চেয়ে তারা নাকি কাজ করে ভালো। মানুষের চেয়ে যন্ত্র-মানুষ ভালো হয় কী করে, মাথায় ঢোকে না তিতির।

সন্ধে হয়ে গেছে। বাড়িতে একা বসে-বসে একটা পুতুল তৈরি করছিল তিতি, বাতিল কাপড়ের টুকরো আর কাগজ দিয়ে। তখন হঠাৎ পিয়ালির কথা মনে পড়ে গেল তিতির। কাল পিয়ালি তার বাবার সঙ্গে গিয়েছিল সার্কাস দেখতে। তিতি ভাবে বাবার সঙ্গে সে কোনোদিন সার্কাস দেখতে যায়নি। বাবার অত সময়ই নেই।

পিয়ালি বলেছিল, 'জানিস তিতি, যখন বাঘের খেলাটা শুরু হল, আমি তখন বাবার হাতটা জড়িয়ে ধরে বসেছিলাম। অত বড়ো বাঘ, মা গো!' বলেই পিয়ালি দু'হাতে মুখ ঢেকেছিল ভয়ে।

এখন বাবার হাতের একটু স্পর্শ পেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে তিতির। কতদিন তিতি বাবাকে ছোঁয়নি। খুব মনখারাপ হয়ে গেল। তিতি ভাবে, কেন এমন হয় না, আমি, মা, বাবা, আমরা সকলে দূরে কোনো নদীর ধারে বেড়াতে গেছি। ছোট্ট ভাইটা সবে হাঁটতে শিখেছে। বাংলোর লনে হাঁটতে-হাঁটতে পড়ে যাচ্ছে সে। আর আমি তার হাত ধরে তাকে বাগানে নিয়ে গিয়ে ঘাসফড়িং দেখাচ্ছি, প্রজাপতি চেনাচ্ছি। ফুলে হাত দিতে নেই বলে নিষেধও করছি মাঝে-মাঝে। মা-বাবা বাংলোর বারান্দায় চেয়ারে আমাদের দেখছেন, আর হাসছেন। দূরে নদীর জলে অনেক লাল রং ছড়িয়ে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। কেন এমন হয় না, এমন হয় না কেন?

মন খারাপ করে বসে রইল তিতি। সকলের তো সবকিছু হয় না। যেমন পিয়ালির বাড়িতে এত যন্ত্র নেই, কম্পিউটার গেম নেই, এত একলা থাকতে হয় না পিয়ালিকে। যেমন তার ভাই নেই, বাবা-মাকে কাছে পায় না, কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না তাদের। সকলেরই জীবনে 'নেই' আছে।

চুপচাপ বসে ছিল তিতি। এমন সময় দরজা খোলার শব্দ হল। মার কাছেও চাবি থাকে। তাই মা এলে তিতিকে উঠে গিয়ে দরজা খুলতে হয় না। মা নিজেই দরজা খুলে ঘরে ঢোকেন। তিতি ভাবল, মা এসেছেন।

দরজা খুলে প্রথমে ঢুকলেন বাবা, তারপর মা। ড্রাইভারকাকু কী একটা বড়ো মোড়ক নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বাবা তিতির পিঠে হাত রেখে বললেন, 'একা-একা মন খারাপ করছিল তো মাম? এই দ্যাখো, তোমার জন্যে বন্ধু এনেছি।'

তিতি ভাবল, এত বড়ো মোড়কে বন্ধু তা হলে রোবট-নাকি? সত্যিই তাই। প্যাকেট খোলা হল। তিতির সমান লম্বা একটা রোবট। বাবা বললেন, 'এর নাম 'রোবটিকা'। জানো মাম, আজ থেকে রোবটিকা আমাদের

বাড়িতে থাকবে। তোমার সব কাজ করে দেবে। তোমার সঙ্গে ভিডিও গেম খেলবে, তোমার পড়া বলে দেবে। কেমন, খুব মজা হবে না মাম?'

বাবার একটা হাত ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তিতি। বাবার শরীরের উত্তাপ পেতে-পেতে মনে-মনে বলল, 'বাবা, তুমি পিয়ালির বাবার মতো হতে পারো না? আমাকে মুনুমা বলে ডাকতে পারো না বাবা? আমাদের গোটা বাড়িটায় যে শুধুই যন্ত্রের গন্ধ একদম ভালো লাগে না বাবা।'

মাও জামা-প্যান্ট ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাবা রোবটটা চালিয়ে দিতেই হাঁটতে শুরু করল। মেঝের ওপর হাঁটতে লাগল থপথপ করে, অনেকটা সেই ই. টি. সিনেমার ভিন গ্রহের প্রাণীটার মতো। হেঁটে গিয়ে বইয়ের ডেস্কটা সুন্দর করে গুছিয়ে দিল তিতির। তারপর চুপচাপ এসে দাঁড়িয়ে রইল আদেশের অপেক্ষায়। মা বললেন, 'দ্যাখো মাম, বেশ মজার, না? তোমার বাবা অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়ে এনেছেন এই রোবটিকাকে। নামটাও বেশ, রোবটিকা, বল?'

তিতি বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। মনে-মনে ভাবল, এর চেয়ে একটা বেড়ালও ঢের ভালো ছিল। ছোট্ট পুষিটার সঙ্গে খেলে-খেলে সময়টা কেটে যেত তিতির।

এর পর বাবা সবকিছু বুঝিয়ে দিলেন তিতিকে। রোবটিকা কেমন করে দরজা খুলে দেবে, পড়া বলে দেবে, ওর সঙ্গে ভিডিও গেম খেলবে, সব।

তিতি আর কিছু দেখল না। ও দেখে, বুঝে লাভ কী? রোবটিকা দিয়ে তার কী হবে? তার চেয়ে এই যেটুকু সময় বাবাকে কাছে পাচ্ছে, বাবার শরীরের উত্তাপ পাচ্ছে, এই তো ঢের।

সেদিন রাত্রে ছোট্ট খাটে শুয়ে তিতি স্বপ্ন দেখল। সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন। সে এক আজব পৃথিবী। গাছ নেই, ফুল নেই, নদী নেই, বন নেই পাহাড় নেই। শুধু যন্ত্র আর যন্ত্র। এমনকী, একটাও মানুষ নেই। সেখানে বোতাম টিপলে বৃষ্টি হয়, সূর্য ওঠে। আর সেই অদ্ভুত পৃথিবীতে তিতি একা, কী করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। সবশেষে কেঁদেই ফেলল তিতি।

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কাঁদতে দেখে পাশের খাট থেকে উঠে এলেন মা। তিতিও জেগে উঠেছে। একদম ঘেমে গেছে তিতি।

পরের দিন থেকে বাবা আবার চলে গেলেন তাঁর কাজে। মা অফিস-মিটিংয়ে ব্যস্ত। তিতি স্কুল আর বাড়ি। বাড়িতে রোবটিকা থেকে গেল। রোবটিকা রোবটিকার মতোই থাকে। তিতি থাকে তিতির মতো। রোবটিকা নামটাও তিতির একদম পছন্দ নয়। আর ওই নামে না ডাকলে নাকি সাড়াও দেবে না রোবটিকা। তাই তিতি যেমন একলা ছিল তেমন একাই।

স্কুল থেকে ফিরলে রোবটিকা দরজা খুলে দেয়। ব্যাস, ওইটুকুই। তিতি আগের মতোই নিজে খাবার নিয়ে খায়, ডেসকে বই গুছিয়ে রাখে, একা-একা পুতুল নিয়ে রান্নাবাটি খেলে, এক্কাদোক্কা খেলে। রোবাটিকার থাকা না-থাকা দুটোই সমান তিতির কাছে।

মা অফিস থেকে ফিরে দু-একদিন বলেছেন, 'মাম, তুমি রোবটিকার সঙ্গে মেশো না কেন? ও তো তোমার বন্ধু হওয়ার জন্যেই তৈরি হয়েছে?'

তিতি মায়ের কথা বুঝতে পারে না। ওভাবে কি কেউ কারও বন্ধু হয়? পিয়ালির সঙ্গে তিতির বন্ধুত্ব হবে বলেই কী পিয়ালি এসেছে পৃথিবীতে? বন্ধু হয়ে কেউ পৃথিবীতে আসে না। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, বন্ধু হয়ে ওঠে।

উত্তরে তিতি মাকে বলেছে, 'আমার কোনো কষ্ট হয় না। বেশ ভালো আমার একা-একা খেলা।'

একদিন দূর থেকে বাবা মাকে টেলিফোন করেছিলেন। তিতি পাশের ঘর থেকে শুনেছে। বাবা জানতে চেয়েছিলেন রোবটিকার সঙ্গে তিতির বন্ধুত্ব হয়েছে কি না। উত্তরে মা বলেছিলেন, 'সেই নিয়েই তো ভাবনা। ওরা দুজনে আলাদা-আলাদা থাকে। মাম মনে হয় রোবটিকাকে মানিয়ে নিতে পারছে না।'

তিতি একদিন একটা পুতুলকে সাজাতে বসেছে। আপনমনে পুতুলের সঙ্গে কথাও বলে চলেছে। হঠাৎ মনে হল, তার ইতি নামে কোনো বন্ধু থাকলে বেশ হত! তিতির বন্ধু ইতি। পিয়ালির নামটাই বদলে এবার

থেকে ইতি রাখলে কেমন হয়?

এমন সময় পুতুলের জামার দরকার পড়ল তিতির। জামাটা তো সেই বারান্দার কোণে কাগজের বাক্সের মধ্যে। পুতুলটাকে এমনভাবে সাজিয়েছে, হাত থেকে ছেড়ে দিলে আবার সব খুলে যাবে। আঠার টিউবটাও বারান্দায়। নিজের ওপর খুব বিরক্ত হল তিতি। এত ভুলোমন হলে এই হয়। সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে বসলেই তো হত।

হঠাৎ রোবটিকার দিকে তাকিয়ে বলল তিতি, 'এই ইতি, বারান্দা থেকে পুতুলের জামাটা এনে দে না।'

বলেই অবাক হয়ে দেখল তিতি, রোবটটা সত্যিই হেঁটে গিয়ে বারান্দা থেকে পুতুলের জামাটা এনে দিল তিতিকে। খুব ভালো লাগল তিতির। আর রোবটিকা নয়, ওকে এবার থেকে ইতি বলেই ডাকবে। তবে যে বাবা বলেছিলেন, 'রোবটিকা নামে না ডাকলে ও সাড়া দেবে না।' সে যাকগে। ইতি, আজ থেকে ও ইতিই।

একদিন রান্নাবাটি খেলার সময় জল এনে দিতে বলল ইতিকে। তিতি বলল, 'দেখিস ইতি, মেঝেয় জল ফেলিস না যেন। মা তা হলে বকবে।'

রোবটটা জল এনে দিল।

দেখতে-দেখতে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল ইতির সঙ্গে। তিতি যখন পড়তে বসে, ইতি পেনসিল কেটে দেয়, দরকার পড়লে বই এনে দেয় ডেসক থেকে। রুটিন বলে দেয়। কোনোদিন কী পড়া আছে, তাও মনে করিয়ে দেয় ইতি। এসব দেখে মা ভীষণ খুশি। সে-কথা একদিন ফোনে বাবাকে বলেছেন মা, তিতি শুনেছে।

তিতি সেদিন ইতিকে বলেছে, 'দ্যাখ ইতি, আমরা রোজ বিকেলে দুজনে খেলব এক্কাদোক্কা, রান্নাবাটি। পুতুল সাজাব মাকে বলে দিস না যেন!'

ইতির দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে তিতি বুঝেছে, ইতি মাকে বলবে না।

সেদিন বাথরুমে পড়ে গেল তিতি জল আনতে গিয়ে। ওর পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে ইতি গিয়ে হাজির বাথরুমে। তিতির হাঁটুতে চোট লেগেছে দেখে ফ্রিজ থেকে বরফ এনে লাগিয়ে দিয়েছে ইতি। আসলে ইতিও ভালোবেসে ফেলেছে তিতিকে। তিতি ভাবে, ইতিটা আসলে রোবট না, বন্ধু আমার মিষ্টি বন্ধু! ঘরে এখন তিতি আগের মতো যন্ত্রের অত তীব্র গন্ধও পায় না। সেই বিশ্রী গন্ধটা আর নেই।

কাল তিতি আর ইতি চকখড়ি দিয়ে মেঝেতে দাগ কেটে এক্কাদোক্কা খেলছিল। এরকম অনেক দিন খেলেছে। হঠাৎ বিকেলে মা অফিস থেকে ফিরে দরজা খুলে ঢুকেই দেখেন, ইতি আর তিতি খেলছে। তখন আবার ইতিরই খেলার পালা। এক পা তুলে লাফিয়ে-লাফিয়ে খেলছিল ইতি। মাকে দেখে ও থমকে গেল। মার দুচোখ জুড়ে বিস্ময়। এ কী করে সম্ভব?

তিতি দেখল, মা কেমন দিশেহারা হয়ে গেলেন। ছুটে গিয়ে বাবাকে দিল্লিতে ফোন করলেন।

মা ফোনে চেঁচিয়ে কথা বলছেন, 'তুমি আজই চলে এসো। আমি বাড়ি ফিরে দেখলাম তিতির সঙ্গে রোবটিকা এক্কাদোক্কা খেলছে। এ কী করে সম্ভব? তুমি এক্ষুনি চলে এসো।'

বাবা চলে এলেন রাত দশটার মধ্যে। তিতিকে কাছে ডেকে আদর করে জানতে চাইলেন, 'রোবটিকা তোমার বন্ধু?'
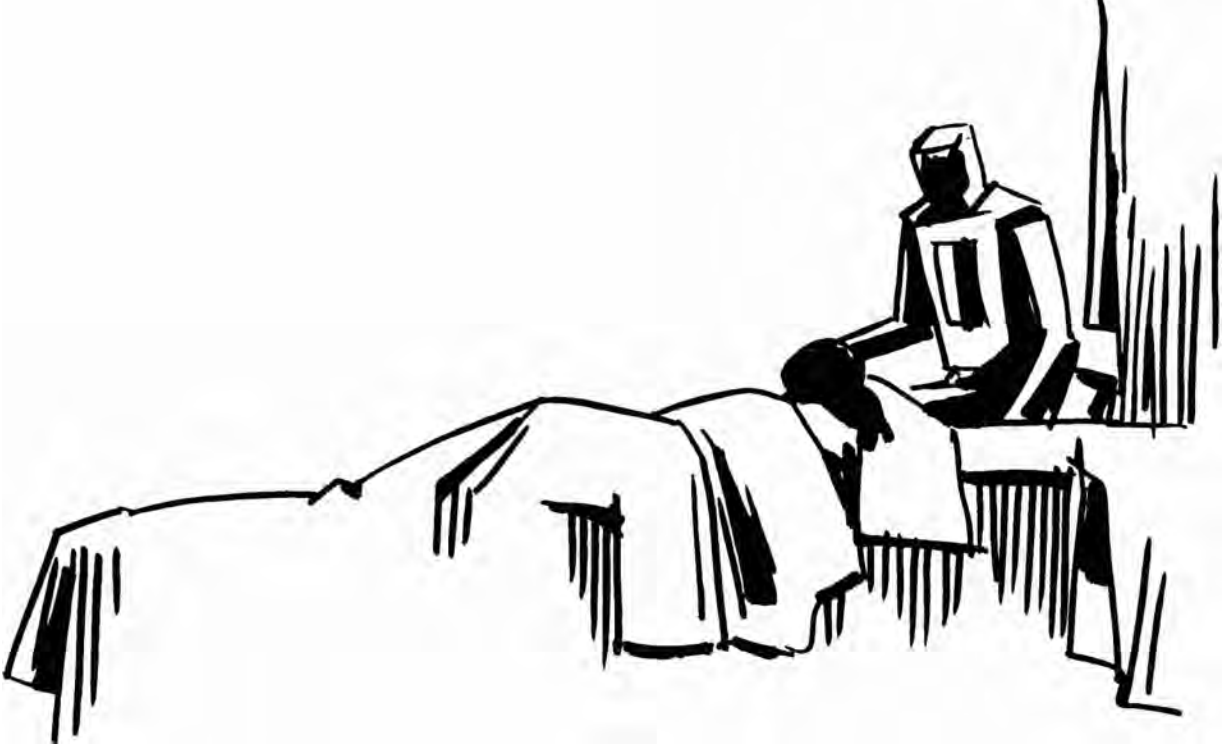
তিতি ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। ওর নাম রোবটিকা নয়, ইতি। দ্যাখো বাবা, তুমি ওকে ইতি বলে ডাকো, ও কাছে আসবে।'

বাবা ইতি বলে ডাকতেই, সত্যি-সত্যি কাছে এসে দাঁড়াল ইতি।

বাবা উঠে গিয়ে আমেরিকায় ফোন করলেন ব্যস্ত হয়ে। বাবার ফোনে চাপা স্বরের কথা এ-ঘর থেকে শুনতে পেল না তিতি। শুধু এটুকু শুনল তিতি, বাবা কাল ইতিকে নিয়ে চলে যাবেন আমেরিকায়। ওর কোনো একটা যন্ত্র নাকি খারাপ হয়ে গেছে, সারানো দরকার।

তারপর বাবা এ-ঘরে এসে ইতিকে ভরে ফেললেন প্যাকেটে। তিতি অনেক করে বলল, 'বাবা, ওর তো কোনো দোষ নেই। আমিই তো ওকে এক্কাদোক্কা খেলতে ডেকেছিলাম। ইতি যে আমার বন্ধু হয়ে উঠেছে বাবা। আমাকে এখন আর একলা থাকতে হয় না বাড়িতে।'

তিতির কোনো কথাই বাবার কানে ঢুকল না। খাওয়ার পর তিতিকে তার ছোটো খাটে শুইয়ে বাবা ঘুম পাড়াতে-পাড়াতে বললেন, 'আমি আবার নিয়ে আসব ওকে মাম। একদিনেই সারানো হয়ে যাবে।'

তিতি ঘুমিয়ে যেতে বাবা ঘুমোতে গেলেন। মাও কাজ সেরে চলে এলেন। তিতি কিন্তু সত্যি-সত্যি অনেকক্ষণ ঘুমোল না। খুব কাঁদল তিতি, একা-একা। কখন ঘুমিয়ে পড়ল, তিতি নিজেও জানে না।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যেতে বাবা তিতির খাটের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। পাশের ঘর থেকে প্যাকেট খুলে বেরিয়ে এসে ইতি বসে আছে তিতির মাথার পাশে। একটা হাত তিতির কপালে।

বাবা ধড়ফড় করে উঠে গিয়ে দেখলেন, জ্বরে তিতির গা পুড়ে যাচ্ছে।

অদৃশ্য বলয়

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

বিকেলের রোদ নরম হয় এসেছে। রাস্তাটা পার হতে হতে বাগচি একবার অভ্যেস-বশে সামনে তাকালেন। বিশাল আটকোনা একটি তারা যেন হঠাৎ আকাশ থেকে খসে ইট পাথর-কাচে মোড়া চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। বলছে, 'আমায় দেখো। কী সুন্দর আমি।'

এই বাড়িটি বাড়ি, না বলে একে বাড়ির সমষ্টি বলাই উচিত—বাগচির মানস কন্যা। এর চিন্তা, নকশা থেকে শুরু করে প্রত্যেক ধাপে ধাপে তিনি ছিলেন জড়িত। যখন লোকে ষাট-সত্তর তলার বেশি যেতে ভয় পেত, মনে করত প্রগতির চূড়ান্ত হল একশো তলা, সমর বাগচি তখন মেটিরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সদ্য পিএইচডি করে নতুন উপাদান নিয়ে আশ্চর্য, অভিনব, ভবিষ্যৎমুখী সব পরিকল্পনা করছেন।

এইভাবে জেট ফাউন্ডেশনের ওপর জন্ম নিল আকাশছোঁয়া ঘেঁষাঘেষি আটটি বাড়ি। একটি কেন্দ্র থেকে সাইকেলের স্পোকের মতো বেরিয়ে আছে। এখানে বাস করার ফ্ল্যাট থেকে শুরু করে অফিস, কলেজ, বাজার, খেলার মাঠ, ক্যান্টিন, স্টেডিয়াম, কী নেই! এমনকী, একটি চিড়িয়াখানাও। বলতে গেলে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শহর। তাই কাজকর্মে যাবার জন্য কাউকে আর বাড়ি ছেড়ে বেরোতে হয় না।

এইসব প্রাসাদগুচ্ছ, এমনকী, শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারেও অন্য কারও মুখ চেয়ে নেই। সৌরশক্তি ও জৈব গ্যাস, এই দুভাবে এদের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা এরা নিজেরাই করেছে। কাজকর্মের জন্য কাউকে বাসে ঝুলে-ঝুলে দূরে যেতে হয় না। পথঘাট তাই ফাঁকা-ফাঁকাই থাকে। ব্যক্তিগত মালিকানায় গাড়ি নেই বললেই হয়। সরকারি গাড়ি অবশ্য আছে, তা ছাড়া আছে বড়ো-বড়ো কোম্পানিদেরও নিজস্ব গাড়ি। দূরে যাবার একান্ত দরকার হলে ট্রেন, বাস, পাতাল-রেল আছে। বাড়িগুলি ওপরে উঠে যাওয়ায় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় অনেক খালি জায়গা পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আছে সবুজ মাঠ, পার্ক ছোটোখাটো জঙ্গল।

বাগচি চোখ নামিয়ে আবার হাঁটা দিলেন। মনটা খুব ভালো লাগছিল না। কংক্রিটের চত্বরে ইচ্ছে করে ফুটো করা আছে যাতে ফাঁকে ফাঁকে ঘাস গজাতে পারে ঘাস মাড়িয়ে বাড়ির দিকে যেতে যেতে মনে হল, কেউ তাঁর কাজে বাগড়া দেবার চেষ্টা করছে না তো! একেই তো চৌম্বক বলয়ের জন্য এক শ্রেণির লোকে খুব চটেছে। আজ হঠাৎ তাঁর বেতার-টেলিফোন জ্যাম হয়ে গেল। অন্য শহরের এক কর্মীর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন চৌম্বক বলয়ের আর একটি নতুন প্রয়োগ নিয়ে। ঠিকভাবে ডেভেলপ করতে পারলে ইস্পাতের প্রচুর সাশ্রয় হয়।

ভাবতে ভাবতে বাড়ির আরও কাছে পৌঁছে গেছেন বাগচি। এখন আর আটকোনা তারার মতো লাগছে না, মনে হচ্ছে দৈত্যাকার একটি মৌচাক। বিকেলের পড়ন্ত রোদ জানালার কাচে-কাচে ঝলসাচ্ছে। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে তাঁর মুখ থেকে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে এল, 'বাঃ।' বলতে বলতেই পায়ে কীসের ঠোক্কর খেলেন, পড়ে যেতে-যেতে সামলে নিয়ে আছাড় খাওয়া থেকে বাঁচালেন নিজেকে। রোদ-ঝলসানো জানলাগুলি থেকে মাটির দিকে দৃষ্টি ধাতস্থ হতে একটু সময় নিল। যখন ভালো করে নজর পড়ল, আঁতকে উঠে আবার স্বগতোক্তি করলেন, 'বিষ্ণু!'

বিষ্ণু তাঁর ছোটো ছেলে। তাকে নিয়ে বাগচি-পরিবারে মহা দুশ্চিন্তা। কারণ সে চায় এমন একটি পেশা, যা বহুদিন ভদ্রসমাজে ভালো চোখে দেখা হয় না। তাদের তেমন খাতিরও নেই। সে ছিল এককালে, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। এমন সব ছেলেই হতে চায় পেশাদার ফুটবলার। সেইরকম ট্রেনিং-এরও ব্যবস্থা আছে ছোটোবেলা থেকেই বিষ্ণু চায় ক্রিকেট খেলোয়াড় হতে, সুনীল গাওস্কর হতে, যার নাম জিজ্ঞেস

করলে ওর বয়সের ছেলেরা মাথা চুলকে বলবে, 'কে জানে, শিবাজির কোনো সেনাপতি-টতি হবে হয়তো। বাগচির মাথার মধ্যে নিজের কাজ ছাড়াও এই দুর্ভাবনাটা তো জমা হয়ে ছিলই, এখন দপ করে মেজাজটা চড়ে গেল। কারণ, আর কিছু নয়, যে-বস্তুটি পায়ে লেগে তিনি চিতপটাং হচ্ছিলেন, সেটি একটি লাল গোলমতো জিনিস, এক সময় যা খুবই প্রসিদ্ধ ছিল ক্রিকেট-বল নামে।

এখনও অবশ্য একে ক্রিকেট-বলই বলে। যদিও এর গঠন ও উপাদানে কিছুটা বদল হয়েছে। একে নিয়ে ছেলেপিলেরা আব একদম মাতামাতি করে না। বলটা এখানে কোথা থেকে এল? যতই জিনিসটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে পরখ করতে থাকেন, ততই তাঁর ভুরু দুটো কাছাকাছি আসতে থাকে। বিষ্ণু আবার ক্রিকেটে হাত দিয়েছে বলে শুধু নয়, এই সব উঁচু বাড়িতে এখন ক্রিকেট খেলা আইন করে বারণ। প্রচণ্ড স্পিডে যে-সব খেলা হয়, যেমন হকি, টেনিস, তাও বারণ। তবে অন্য সব খেলার মাঠ এখন ছাদে। একশো আশি তলা থেকে ক্রিকেট বা হকির বল নীচে পড়লে কী হতে পারে তা চিন্তা না করাই ভালো। এখন এখানে ইনডোর কোর্ট ছাড়া খোলা ছাদে শুধু খেলা হয় ফুটবল। ফুটবল আটকাবার জন্য উঁচু রেলিং ছাড়াও আছে দুর্ভেদ্য চৌম্বক বলয়।

আজ একবার বিষ্ণুকে পেলে হয়। রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে বাগচি লিফটের দিকে এগিয়ে গেলেন লম্বা-লম্বা পা ফেলে। পাশাপাশি অনেকগুলি লিফট। কোনোটা উঠছে, কোনোটা নামছে। যেটা সবচেয়ে কাছে ছিল, সেখানে গিয়ে বোতামটা টিপলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই খাঁচাটা নেমে এল, দরজা খুলে যেতেই গোটা পাঁচ-ছয় বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়ে বেরিয়ে এদিক-ওদিক ছিটিয়ে গেল, একজন ছাড়া। যে ছেলেটির বয়স আট-নয়, কোঁকড়া চুল, সপ্রতিভ চেহারা, সে বাগচিকে দেখে থমকে গিয়ে বলল, 'মেসোমশাই!

'কী রে পিন্টু!' অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিয়েই বাগচি লিফটের ভেতরে ঢুকেছেন। লক্ষই করেননি যে, পিন্টুও পিছনে পিছনে আবার ঢুকছে। 'তিপ্পান্ন তলায় চল,' একটু রাগী-রাগী গলায় বলা সত্ত্বেও খাঁচা চুপ। এবারে স্পিকারের একটু বেশি কাছে মুখ নিয়ে আবার বললেন বাগচি, 'কী, হল কী? তিপ্পান্ন তলা।' প্রায় হুমকির মতো শোনাল এবার। লিফট নট-নড়ন-চড়ন। তার দোষ কী। তার কম্পিউটার মেমারিতে প্রত্যেকটি বাসিন্দার গলার প্যাটার্ন ধরা আছে। তার বাইরে কোনোও গলার আদেশে লিফট চলতে পারেই না, এমনই এর ব্যবস্থা। আজেবাজে লোক বাইরে থেকে যাতে ঢুকে না পড়ে, তাই এই ব্যবস্থা।
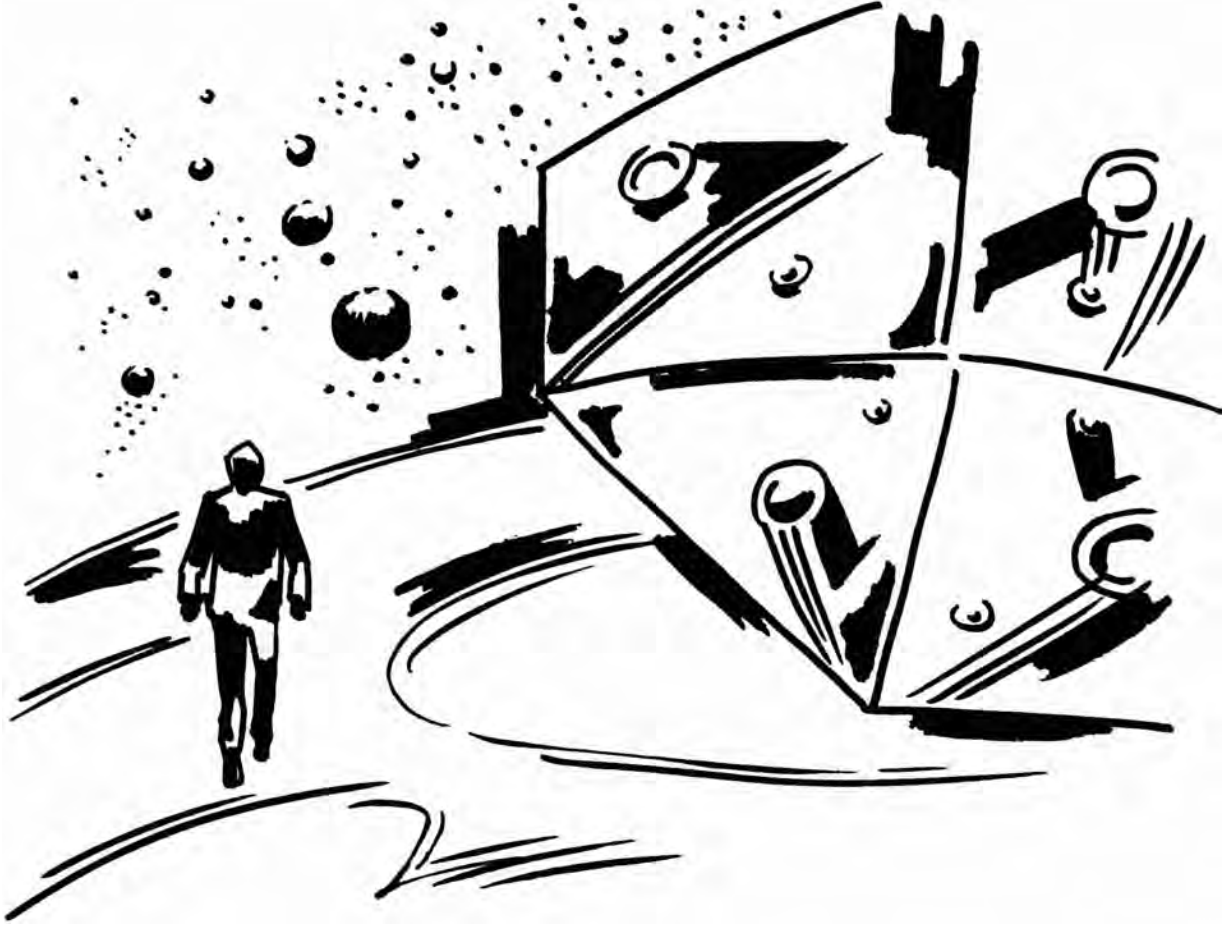
ক্রমশ মেজাজ চড়তে থাকে বাগচির। আজ কি সবাই মিলে তাঁর পিছনে লেগেছে! প্রথমে রেডিয়ো টেলিফোনে বিভ্রাট, তারপর এই নিষিদ্ধ বল। এখন লিফট। রেগে প্রায় বেরিয়ে আসতে যাচ্ছেন, এমন সময় পিছন থেকে একটি সরু গলা বলল, 'দাঁড়ান মেসোমশায়, আমি বলে দিচ্ছি। তিপ্পান্ন তলায় যাব আমরা।' গোঁগোঁ করে উঠতে লাগল খাঁচাটা।

বাগচি বুঝলেন, তাঁর গলা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, তাই প্যাটার্ন মিলছিল না। একটু হাসি-হাসি মুখে তিনি এবার পিন্টুর দিকে ফিরলেন। ছেলেটিকে তিনি খুবই স্নেহ করেন। চুয়ান্ন তলার হলেও সব সময় বিষ্ণুর সঙ্গে আঠার মতো লেপটে আছে। বিষ্ণুদার ফাই-ফরমাশ ঘাটতে পেলে পিন্টু যেন হাতে স্বর্গ পায়।

'এ কী, তুই আবার উঠছিস যে!' জিজ্ঞেস করলেন বাগচি।

'না, মানে, বিষ্ণুদা বলল,' থেমে গেল পিন্টু। মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস না থাকলে যা হয়। তার মুখ দেখে মনে হল, প্রাণপণে সে কিছুটা একটা অজুহাত ভাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু লাগসই কিছু মনে আসছে না।

লাল ক্রিকেট-বলটা পকেট থেকে বার করে বাগচি বললেন, 'এটার জন্যে তো?'

মুখ সাদা হয়ে গেল পিন্টুর। কী বলবে বুঝতে না পেরে পিন্টু বলল, 'মানে, আমি ফিলডিং করছিলাম তো, এমন সময়...'

'এমন সময় কী?' বাগচি গলাটা গম্ভীর রাখার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বিষ্ণুদাকে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা দেখে মজাও লাগছিল তাঁর।

কোনো উত্তর নেই।

'এমন সময় বলটা বেড়া টপকে নীচে চলে এল?'

বাগচি নিজের মুখেই এমন একটি অসম্ভব কথা বললেন, যার কোনো অর্থ হয় না। কারণ যে চৌম্বক বলয় দিয়ে সমস্ত ছাদের আকাশটা মোড়া আছে, তাকে ভেদ করে ধাতুর সামান্যতম ছোঁয়া আছে, এমন জিনিস বেরিয়ে আসতেই পারে না। এরই বাজারে চালু নাম বাগচি-বলয়। ছোটোবেলায় পড়া একটি কল্পবিজ্ঞানের বই থেকে। আইডিয়াটা পেয়েছিলেন তিনি, তার পরে এখনকার প্রযুক্তি ও মেটিরিয়াল বিজ্ঞানের ভেলকি যোগ করে তিনি এটিকে গ্রহণযোগ্য, কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন। এখন সমস্ত উঁচু বাড়ির ছাদে চৌম্বক বলয় থাকা বাধ্যতামূলক তবে হ্যাঁ, তার জন্য নানারকম নিত্যব্যবহার্য উপকরণে কিছু বদল আনতে হয়েছে, যেমন খেলার ব্যাট, বল, ডান্ডা, সবকিছুতেই ভেতরদিকে সূক্ষ্মভাবে লোহার একটা আস্তর থাকে। খেলোয়াড়দের জুতো ও জামাকাপড়েও তাই। বলয়টি একেবারে নিখুঁত করার জন্য প্রতিহত করার ব্যবস্থাও আছে। তার কাছাকাছি কোনো লোহার সাঁড়াশি হাতে কেউ গেলে সাঁড়াশিটি শাঁ করে বলয়ের গায়ে ছুটে গিয়ে ঝুলতে থাকবে না। তবে কেউ সাঁড়াশিটি ছুঁড়ে ছাদ থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করে, তা হলে ওই চৌম্বকক্ষেত্রে মৃদু শব্দ হবে, আর সাঁড়াশিটার গতি ওখানেই থেমে যাবে। সেটা পিছলে গড়িয়ে পড়বে ছাদের মেঝেতেই। এই বলয় ভেদ করে আজ অবধি কোনো ফুটবল মাটিতে পড়েনি, পড়লে সেটা হবে আপেল গাছ থেকে মাটিতে না-পড়ে আকাশে উড়ে যাওয়ার মতো অবিশ্বাস্য ঘটনা।

দুজনেই চুপ। পিন্টু যতটা না চমকে গেছে, ভয় পেয়েছে তার চেয়ে বেশি। ছাদে ক্রিকেট খেলার জন্য না জানি বিষ্ণুদার কী শাস্তি আছে কপালে। আসলে সে মোটেই খেলছিল না, বিষ্ণুদাই তাকে ছক্কা মারার একটা কায়দা দেখাচ্ছিল। এমন সময় বলটা উড়ে বাইরে চলে গেল। ছাদে তারা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। দুজনেই এই অসম্ভব ঘটনায় ভ্যাবাচ্যাকা। ছাদে তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও যখন পাওয়া গেল না, তখন বিষ্ণুদাকে বাঁচাবার জন্য সে ইচ্ছে করেই নীচে আসছিল। কে জানত যে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়।

বাগচি ভাবছিলেন অন্য কথা। চৌম্বকক্ষেত্রের দুর্ভেদ্য বর্মে কী করে ফাটল ধরল। অসম্ভব। তা হতেই পারে না। কিন্তু বলটা তা হলে...।

লিফট ততক্ষণে তিপ্পান্ন তলায় পৌছে গেছে। তিনি একাই বেরিয়ে এলেন। করিডরে শুনলেন পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ঘোষণা হচ্ছে, 'দয়া করে সকলে শুনুন, সদস্যদের অবহিত করা হচ্ছে যে, পূর্ব ও ঈশান ব্লকের মাঝখানের চত্বরে সরকারি দুগ্ধ-দফতরের ভ্যানটির মাথা কোনো অজানা উড়ন্ত বস্তুর আঘাতে চুরমার হয়ে গেছে। ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা যে যেখানে থাকেন, অতি অবশ্য যেন কমিটি-রুমে চলে আসেন। এমার্জেন্সি মিটিং-এ ডাকা হয়েছে।

নিজের ফ্ল্যাট অবধি পৌঁছতে-পৌঁছতে বারকয়েক ঘোষণাটার পুনরাবৃত্তি হল। শেষবারে একটা বাড়তি খবর, 'গাড়িটির ভিতরে পাওয়া গেছে দোমড়ানো অবস্থায় একটি ফুটবল। সুতরাং এ-টিমের ক্যাপটেনকেও তলব করা হয়েছে কমিটি-রুমে।'

কোনো সন্দেহ নেই যে, অসম্ভব ঘটনাটাই সত্যি-সত্যি ঘটেছে। চৌম্বক বলয়ে ফাটল। মেঘের মতো থমথমে মুখে ফ্ল্যাটে ঢুকলেন বাগচি। সামনেই টেলিভিশনের চাবি টিপছে বিষ্ণু তার মা কিংবা দিদি কেউ ধারে-কাছে নেই। ঘোষণা অবশ্য বাড়ির মধ্যেও শোনা যাচ্ছে, বসার ঘরের স্পিকার থেকে।

বাবাকে দেখে লাফিয়ে উঠল বিষ্ণু।

'কী হল?' ক্লান্ত, নিরাসক্ত গলা তার বাবার।

'এ-টিমের ক্যাপটেনকে কমিটি রুমে ডাকছে। শুনেছ? বাগচি ভাবলেন, একেই বলে ছেলেমানুষ।

এ-টিম আর বি-টিমের রেষারেষি এদের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আজ যদি যুদ্ধ হয়ে সমস্ত শহর ধ্বংস হয়, ওরা হিসেব করতে বসবে বি-টিমের কজন মাটি-চাপা পড়েছে। গত ওলিম্পিকে ইস্ট জার্মান মেয়ে-ফুটবল-দল আর্জেন্টিনার ছেলে-ফুটবল-টিমকে হারাবার পর থেকে মেয়েদের মনোবল একেবারে তুঙ্গে। এ-টিম ছেলেদের টিম। মেয়েরা যাকে আড়ালে বলে এলেবেলে টিম। ছেলেরাও নিজেদের মধ্যে মেয়েদের বি-টিমকে বলে বোকা টিম, কেউ বলে বিচ্ছিরি টিম। আজ এ-টিমের এই বিপদে সব

ছেলেই উত্তেজিত, তাদের কাছে সেটা মান-সম্মানের প্রশ্ন। এতই উত্তেজিত বিষ্ণু যে, বাবাকে দেখে লুকিয়ে পড়ার বদলে সে দৌড়ে এসে জরুরি খবরটা শুনিয়ে দিল।

'হ্যাঁ, শুনলাম। কিন্তু হয়েছে কী?'

'কমিটি মিটিং বসছে। নীচে কী অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, তাই। শোনোনি? ইশ, দিদিটা যদি শুনে থাকে।'

'শুনবেই। সব জায়গায়ই তো আওয়াজ পৌঁছুবে।'

'ইশ!' মুখটা কাতর হয়ে গেল বিষ্ণুর।

ঘোষণাটা রেকর্ডের মতো চলছিল। বাগচি রিমোট বোতাম টিপে বন্ধ করলেন। তাঁর চিন্তা এখন বিষ্ণুর থেকে সম্পূর্ণ অন্য দিকে চলে গেছে। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে কপালে একবার হাত বুলোলেন। চশমাটা খুলে রাখলেন। বিষ্ণু তখনও চাবি নিয়ে ঘোরাচ্ছে।

'কী আছে দ্যাখ তো রান্নাঘরে। আর কফির জলটা চাপিয়ে দে।'

বিষ্ণু উঠে গেল। ফিরে এল এক প্লেট ঘুগনি আর কফি নিয়ে। মা সব গুছিয়েই রেখে গিয়েছিলেন। ক্রিলের ঘুগনি আজকাল খুব চলছে। কুমেরু থেকে চালান আসছে। খেতে চিংড়ি মাছের মতো, দামেও সস্তা।

এক চামচ মুখে দিলেন বাগচি অন্যমনস্ক ভাবে। মনে হল, কাগজ খাচ্ছেন।

'বাবা, দ্যাখো তো টিভিতে কী হল? কোনো আওয়াজ নেই, ছবিও আসছে না।'

'একটু চুপ করবি বিষ্ণু, আমি ভাবছি।'

'কী ভাবছ?'

বাবার সঙ্গে এরকমভাবেই কথা বলে সে। এর জন্য মার কাছে বকুনিও কম খায় না। বাবা যে শহরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁর মাথায় যে-সব চিন্তা-ভাবনা ঘোরে সেগুলি যে খুব দামি, বিষ্ণুর তাতে কিছু যায় আসে না।

'ভাবছি, বলটা পড়ল কী করে?'

'বল!' দারুণ চমকে গেল বিষ্ণু। 'কোন বল?' ঘোষণার শেষ অংশটা সে ভালো করে শোনেনি।

'ফুটবল। ভ্যানের ছাদ ফুটো করে গাড়ির মধ্যে পাওয়া গেছে। পড়ল কী করে বলটা।'

'বাবা।' উঠে দাঁড়াল বিষ্ণু, 'একটা কথা বলব?'

'জানি। তোমার ক্রিকেটবল তো?'

'ওটা কী করে উড়ে গেল, আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না। তারপর এখন এই টিভিতে গড়বড়। এরকম তো কখনো হয় না।'

আস্তে-আস্তে সোজা হয়ে বসলেন বাগচি। তারপর নিজের মনে বলে যেতে লাগলেন, যেন গল্প শোনাচ্ছেন কাউকে। 'পিন্টুকে ফিলডিং করছে, বিষ্ণু লুফে নেবে বলে রেডি, কিন্তু হঠাৎ পাখির মতো বলয়ের জাল ছিঁড়ে বলটা উড়ে গেল। ভাগ্যিস তখন নীচে কেউ ছিল না। তবে একটু পরেই সেখান দিয়ে হেঁটে আসছিলাম আমি। বলটা আর কেউ দেখার আগেই তুলে নিই।

চোখ দুটো গোল হয়ে থাকে বিষ্ণুর। সে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করে, আর কোনোদিন ক্রিকেট ব্যাটে হাত দেবে না। আজ আর একটু হলেই তার বাবার মাথায় বলটা লাগতে পারত। উহ, চোখ বন্ধ করে ফেলে সে।

বাগচি বলে চলেছেন, 'ঠিক সেই সময় এ-টিমের ফুটবল প্র্যাকটিস চলছিল ঈশান ব্লকের ছাদে। একটা উঁচু ভলি, তারপর একই ঘটনা। জাল ফুটো করে, চৌম্বক টানকে কলা দেখিয়ে ফুটবল একশো আশি তলা থেকে দুধের ভ্যানের মাথায়। দুটো ঘটনা ঘটছে প্রায় একই সময়।'

বিষ্ণু বাবাকে এরকম ভাবে বিড়বিড় করতে দেখে কেমন ঘাবড়ে যাচ্ছিল। সে তাঁর মনটা অন্যদিকে করার জন্য বলল, 'আর ঠিক একই সময়ে উপগ্রহ থেকে টিভি ট্রান্সমিশন বিগড়ে গেল!'

'আর আমার রেডিয়ো টেলিফোন চলল না।'

'তার মানে কোনো চৌম্বক গোলমাল?'

'চৌম্বক ঝড়।'

মুখের চেহারা বদলে গেল বাগচির। কোঁচকানো ভুরু সোজা, গোঁফের ফাঁকে হাসি। কফির কাপ প্রায় উলটে ফেলে তিনি বিষ্ণুর হাত ধরে নাচতে লাগলেন, 'মিল গিয়া, মিল গিয়া!'

ফ্ল্যাটের খোলা দরজা দিয়ে কোন ফাঁকে ঢুকে পড়েছে পিন্টু। ঘরে এরকম খুশির আবহাওয়া দেখে সে ভয়ে-ভয়ে বলল, 'কী পেয়েছেন মেসোমশাই।'

মেসোমশাই তখন নেচে চলেছেন। সেই অবস্থায় তিনি বললেন, 'উত্তর! উত্তর!'

একটু পরে চেয়ারে বসে বাকি কফিটা এক চুমুকে শেষ করে তিনি বিষ্ণুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বুঝেছিস ব্যাপারটা? এর উৎস আছে আমাদের চেয়ে অনেক অনেক দূরে...'

বিষ্ণু বলল, 'সোলার অ্যাকটিভিটির কথা বলছ?'

'একদম ঠিক। সৌরোৎপাত। এই সময় পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে চৌম্বক ঝড় হয়, বা হতে পারে। শর্টওয়েভ রেডিয়ো যোগাযোগ এই সময় ব্যাহত হতে পারে। এবং আরও কী কী হতে পারে, সেটা আমরা আজকেই দেখলাম।'

পিন্টু বেচারার মাথায় এসব কিছুই ঢুকছিল না। কেবল বিষ্ণুদা যে বাবার কাছে বকুনি খাচ্ছে না তাতেই সে খুশি।

ঠিক সেই সময় বন্ধ টিভি সেটটিকে শব্দ ফিরে এল, ফুটে উঠল ঘোষিকার মুখ।

'একটি বিশেষ ঘোষণা। আবহাওয়া-অফিস থেকে এই মাত্র জানান হল যে, আজ ভারতীয় সময় বিকেল পাঁচটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে পাঁচটা বেজে আটচল্লিশ মিনিট দশ সেকেন্ড অবধি সমস্ত পৃথিবীতে বেতার ও উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। অত্যন্ত প্রবল চৌম্বক ঝড়ই এর কারণ বলে তাঁরা জানিয়েছেন। এ-বিষয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আজ রাত আটটায় প্রচারিত হবে...'

বাগচি পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন 'এই যে পিন্টু, তোর জন্যে টফি।' কিন্তু হাত বার করতেই বেরিয়ে এল একটি ক্রিকেট-বল।

পিন্টু বোকার মতো হাসল। বাগচি, দরাজ গলায় 'হাঃ হাঃ' করে উঠতেই বিষ্ণু কটমট করে তার ভক্তের দিকে তাকাল। বাগচি হেসে বললেন, 'আরে, প্যাকেটটা গেল কোথায়? আচ্ছা, ততক্ষণ তুই এটা ধর তো। আমি দেখি।'

এক ঝটকায় পিন্টুর কাছ থেকে বলটা ছিনিয়ে নিয়ে বিষ্ণু বলল, 'বাবা, আমি আর...'

বাগচি বললেন, 'ও ব্যাপারে পরে কথা হবে। এখন আমি কমিটি মিটিঙে যাচ্ছি।...এই নে পিন্টু।' ততক্ষণে হারানো টফির মোড়ক পাওয়া যাচ্ছে।

একটু পরের ঘটনা। কমিটি-রুমের উত্তেজনা একটু কমেছে। দু-একজন কিন্তু এখনও বাগচির ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন।

তিনতলার মৈত্র বললেন, 'সবই তো বুঝলাম, মি. বাগচি। আপনি বলছেন এটা একটা দৈব-দুর্বিপাক। রেয়ার ঘটনা। প্রত্যেক দিন ঘটার নয়।'

বাগচি বললেন, 'গত দুশো বছরে, মানে দুই শতাব্দীতে এই প্রথম। 1845 সাল থেকে এশিয়াটিক সোসাইটিতে যা রেকর্ড আমরা পাচ্ছি, তার মধ্যে এ-রকম প্রবল চৌম্বক ঝড়ের উল্লেখ নেই।'

মৈত্র তবু তর্ক করে যান, 'দুশো বছরে হয়নি। মানলাম। কিন্তু আবার যে হবে না তার গ্যারান্টি কে দেবে? আপনি দেবেন?'

ইতিমধ্যে সিকিউরিটি থেকে খবর এসে গেছে যে, ছেলেদের টিমকে সঙ্গে নিয়ে অকুস্থল পরিদর্শন করে দেখা গেছে, বাগচির অনুমানই ঠিক। বলয়ের ফাটল আবার জুড়ে গেছে।

হাসি-হাসি মুখে বাগচি বললেন, 'দেখুন, বেঁচে থাকতে গেলে কিছু-কিছু ঝুঁকি নিয়ে আমাদের চলতেই হয়। মনে করুন, এটাও সেরকম।'

বাকিরা সমস্বরে বললেন, 'যা বলেছেন?'

পলাতক তুফান

জগদীশচন্দ্র বসু

গত বৎসর আমার বিষম জ্বর হইয়াছিল। প্রায় মাসেক কাল শয্যাগত ছিলাম।

ডাক্তার বলিলেন— সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে, নতুবা পুনরায় জ্বর হইলে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। আমি জাহাজে লঙ্কাদ্বীপ যাইবার জন্যে উদ্যোগ করিলাম।

এতদিন জ্বরের পর আমার মস্তকের ঘন কুন্তলরাশি একান্ত বিরল হইয়াছিল। একদিন আমার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা দ্বীপ কাহাকে বলে?' আমার কন্যা ভূগোলতত্ত্ব পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার উত্তর পাইবার পূর্বেই বলিয়া উঠিল 'দ্বীপ'— ইহা বলিয়া প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় আমার বিরল-কেশ মসৃণ দুই-এক গোছা কেশের মণ্ডলী দেখাইয়া দিল।

তারপর বলিল, ''তোমার ব্যাগে এক শিশি 'কুন্তল কেশরী' দিয়াছি; জাহাজে প্রত্যহ ব্যবহার করিও, নতুবা নোনা জল লাগিয়া এই দুই-একটি দ্বীপের চিহ্নও থাকিবে না।'' 'কুন্তল-কেশরী'-র আবিষ্কার এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। সার্কাস দেখাইবার জন্য বিলাত হইতে এদেশে এক ইংরেজ আসিয়াছিল। সেই সার্কাসে কৃষ্ণ কেশর-ভূষিত সিংহই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য দৃশ্য ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজে আসিবার সময় আণুবীক্ষণিক কীটের দংশনে সমস্ত কেশরগুলি খসিয়া যায় এবং এদেশে পৌঁছিবার পর সিংহ এবং লোমহীন কুকুরের বিশেষ পার্থক্য রহিল না। নিরুপায় হইয়া সার্কাসের অধ্যক্ষ এক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইল এবং পদধূলি লইয়া জোড়হস্তে বর প্রার্থনা করিল। একে ম্লেচ্ছ, তাহাতে সাহেব! ভক্তের বিনয় ব্যবহারে সন্ন্যাসী একেবারে মুগ্ধ হইলেন এবং বরস্বরূপ স্বপ্নলব্ধ অবধৌতিক তৈল দান করিলন। পরে উক্ত তৈল 'কুন্তল-কেশরী' নামে জগদ বিখ্যাত হইয়াছে। তৈল প্রলেপে একসপ্তাহের মধ্যেই সিংহের গুপ্ত কেশর গজাইয়া উঠিল। কেশহীন মানব এবং তস্য ভার্য্যার পক্ষে উক্ত তেলের শক্তি অমোঘ। লোকহিতার্থেই এই শুভ সংবাদ দেশের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এমনকি, অতিবিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সর্বপ্রথম পৃষ্ঠায় এই অদ্ভুত আবিষ্কার বিঘোষিত হইয়া থাকে।

২৮-এ তারিখে আমি চুসান জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিলাম। পথম দুই দিন ভালোরূপেই গেল। ১ লা তারিখ প্রত্যুষে সমুদ্র এক অস্বাভাবিক মূর্তি ধারণ করিল, বাতাস একেবারে বন্ধ হইল। সমুদেরর জল পর্যন্ত সিসার রঙের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল।

কাপ্তানের বিমর্ষ মুখ দেখিয়া আমরা ভীত হইলাম। কাপ্তান বলিলেন, যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, অতিসত্বরই প্রচণ্ড ঝড় হইবে। আমরা কূল হইতে বহুদূরে—এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা।

এই সংবাদ শুনিয়া জাহাজে যেরূপ ঘোর ভীতিসূচক কলরব হইল তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারিদিক মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার হইল এবং দূর হইতে এক-এক ঝাপটা আসিয়া জাহাজখানাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

তারপর মুহূর্তমধ্যে যাহা ঘটিল তাহার সম্বন্ধে আমার কেবল এক অপরিষ্কার ধারণা আছে। কোথা হইতে যেন রুদ্ধ দৈত্যগণ একেবারে নির্মুক্ত হইয়া পৃথিবী সংহারে উদ্যত হইল।

বায়ুর গর্জনের সহিত সমুদ্র স্বীয় মহাগর্জনের সুর মিলাইয়া সংহার মূর্তি ধারণ করিল।

তারপর অনন্ত ঊর্মিরাশি, একের উপর অন্যে আসিয়া একেবারে জাহাজ আক্রমণ করিল।

এক মহাঊর্মি জাহাজের উপর পতিত হইল এবং মাস্তুল, লাইফ-বোট ভাঙিয়া লইয়া গেল।

আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত। মুমূর্ষু সময়ে জীবনের স্মৃতি যেরূপ জাগিয়া উঠে, সেইরূপ আমার প্রিয়জনের কথা মনে হইল। আশ্চর্য এই, আমার কন্যা আমার বিরল কেশ লইয়া যে উপহাস করিয়াছিল, এই সময়ে তাহা পর্যন্ত স্মরণ হইল—

'বাবা, এক শিশি 'কুন্তল-কেশরী' তোমার ব্যাগে দিয়াছি।'

হঠাৎ এককথায় আর-এক কথা মনে পড়িল। বৈজ্ঞানিক কাগজে ঢেউয়ের উপর তৈলের প্রভাব সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম। তৈল যে চঞ্চল জলরাশিকে মসৃণ করে, এ বিষয়ে অনেক ঘটনা মনে হইল।

অমনি আমার ব্যাগ হইতে তৈলের শিশি খুলিয়া অতিকষ্টে ডেকের ওপর উঠিলাম। জাহাজ টলমল করিতেছিল।

উপরে আসিয়া দেখি, সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্বতপ্রমাণফেনিল এক মহা ঊর্মি জাহাজ গ্রাস করিবার জন্য আসিতেছে।

আমি 'জীব আশা পরিহরি' সমুদ্র লক্ষ করিয়া 'কুন্তল-কেশরী' বাণ নিক্ষেপ করিলাম। ছিপি খুলিয়া শিশি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম ; মুহূর্ত মধ্যে তৈল সমুদ্রে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ইন্দ্রজালের প্রভাবের ন্যায় মুহূর্তমধ্যে সমুদ্রে প্রশান্ত মূর্তি ধারণ করিল। কমনীয় তৈল স্পর্শে বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত শান্ত হইল। ক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল।

এইরূপে আমরা নিশ্চিত মরণ হইতে উদ্ধার পাই এবং এই কারণেই সেই ঘোর বাত্যা কলিকাতা স্পর্শ করে নাই। কত সহস্র প্রাণী যে এই সামান্য এক বোতল তৈলের সাহায্যে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?

লেখক পরিচিতি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম ১৯৩৪ সালে। সাংবাদিকতার চাকরি করেছেন। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও কবি। সাহিত্যের সব শাখাতেই তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা আছে। তাঁর সন্তু-কাকাবাবু চরিত্র ছোটোদের খুবই প্রিয়। উল্লেখযোগ্য বই : *ভয়ংকর সন্দর, পাহাড় চূড়োয় আতঙ্ক, সবুজ দ্বীপের রাজা* প্রভৃতি।

লীলা মজুমদার

জন্ম ১৯০৮ সালে। মৃত্যু ১৯৮৮ সালে। শিশুসাহিত্য রচনায় তাঁর সারাজীবন কেটেছে। 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *খেরোর খাতা, পদিপিসির বর্মী বাক্স, গুপিপানুর কীর্তিকলাপ* প্রভৃতি।

জয়দীপ চক্রবর্তী

জন্ম ১৯৭৪ সালে। ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ.। শিক্ষকতাই তাঁর পেশা। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখেন। মজাদার গল্প লেখায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *নতুন স্কুলে গঙ্গাপদ, হিজিবিজির দেশে* প্রভৃতি।

সংকর্ষণ রায়

জন্ম ১৯২৮ সালে। পেশায় ছিলেন ভূতাত্ত্বিক। তাঁর বিজ্ঞানধর্মী লেখা পাঠক মহলে আদৃত। উল্লেখযোগ্য বই : *কালনাগিনীর আক্রোশ, ছোটোনাগপুরের জঙ্গলে, পাতালের ঐশ্বর্য* প্রভৃতি।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

জন্ম ১৯৩০ সালে। ১৯৫০-১৯৫৬ সাল পর্যন্ত 'আলকাপ' দলে গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সাংবাদিকতার চাকরি করেছেন। বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যেও অনেক লেখা লিখেছেন। তাঁর কর্নেল চরিত্রটি কিশোরদের কাছে খুবই প্রিয়। উল্লেখযোগ্য বই : *কিশোর সাহিত্য, কর্ণেল সমগ্র* প্রভৃতি।

প্রচেত গুপ্ত

জন্ম ১৯৬২ সালে। অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। সাংবাদিকতা তাঁর পেশা। বড়োদের গল্প-উপন্যাসের তাঁর ভক্ত-পাঠক অনেক। কিশোরদের লেখা তাঁর উপন্যাস এবং গল্প পাঠকমন জয় করেছে। উল্লেখযোগ্য বই : *কাঞ্চনগড়ের কোকিল স্যার, নীল আলোর ফুল, ঝিলডাঙার কন্যা* প্রভৃতি।

উল্লাস মল্লিক

জন্ম ১৯৭১ সালে। শিক্ষকতাই তাঁর পেশা। বড়োদের জন্যে গল্প-উপন্যাস লেখেন। পাশাপাশি ছোটোদের জন্যে গল্প লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *বন্ধকনামা, তিন চাকা, বক্সের বাইরে* প্রভৃতি।

ক্ষীতিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

জন্ম ১৯০৯ সালে। মৃত্যু ১৯৯০ সালে। অধ্যাপনা করেছেন। বিখ্যাত ছোটোদের পত্রিকা 'রামধনু'র সম্পাদক। বিজ্ঞান রচনার পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, আকাশের গল্প, বিজ্ঞান বুড়ো* প্রভৃতি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

জন্ম ১৯০৪ সালে। মৃত্যু ১৯৮৯ সালে। কবি এবং কথাসাহিত্যিক। বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যে তাঁর লেখা খুবই বিখ্যাত। তাঁর ঘনাদার গল্পগুলির পাঠক ছোটো-বড়ো সকলেই। উল্লেখযোগ্য বই : *ড্রাগনের নিশ্বাস, তেল দেবেন ঘনাদা, ঘনাদার গল্প, আবার ঘনাদা* প্রভৃতি।

সুকুমার রায়

জন্ম ১৯৮৭ সালে। মৃত্যু ১৯২৩ সালে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র এবং চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বাবা, বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক। প্রধানত ছোটোদের জন্য লিখেছেন ছড়া, গল্প, নাটক। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *আবোলতাবোল, হযবরল, পাগলা দাশু, চলচিত্তচঞ্চরী* প্রভৃতি।

পার্থসারথি চক্রবর্তী

জন্ম ১৯৪১ সালে। অধ্যাপনা করেছেন। ঊর্ধ্বতন পদে সরকারি চাকরিও করেছেন। বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানভিত্তিক অনেক লেখা আছে তাঁর। উল্লেখযোগ্য বই : *কল্পবিজ্ঞানের গল্প, রিলেটিভিটির মজা, আজব দেশে নিকুঞ্জবিহারী* প্রভৃতি।

অদ্রীশ বর্ধন

জন্ম ১৯৩২ সালে। কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা *আশ্চর্য*-র সম্পাদক। *ফ্যানটাসটিক* পত্রিকারও সম্পাদক তিনি। বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান লেখায় সিদ্ধহস্ত। বিখ্যাত বই : *মাকড়সা আতঙ্ক, প্রোফেসর নাটবল্টু চক্র* প্রভৃতি।

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

জন্ম ১৯৭৩ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ.। এখন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত। বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যে অনেক ভালো উপন্যাস ও গল্প লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *মানুষ-কুমির, কৃষ্ণলামার গুম্ফা, রানি হাটস্পেসুটের মমি* প্রভৃতি।

সমরজিৎ কর

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রোফেসর। তিনি বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানভিত্তিক রচনায় পারদর্শী। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *অগ্রজ বিজ্ঞানী, দুই দেশ: শক্তি ও মানুষ, ফেরা* প্রভৃতি।

মেঘনাদ সাহা

জন্ম ১৮৯৩ সালে। মৃত্যু ১৯৫৬ সালে। পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী। ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রতিষ্ঠাতা। উল্লেখযোগ্য বই : *ট্রিয়েটাইজ অন মডার্ন ফিজিক্স, দ্য প্রিন্সিপ্যাল অফ রিলেটিভিটি ট্রিয়েটাইজ অন হিট* প্রভৃতি।

সিদ্ধার্থ ঘোষ

জন্ম ১৯৪৮ সালে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর আসল নাম অমিতাভ ঘোষ। অনুবাদ করেছেন, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা লেখায় পারদর্শী। বিখ্যাত বই : *কলকাতা নীলকণ্ঠ, গ্যাবনে বিস্ফোরণ, কলের শহর কলকাতা* প্রভৃতি।

সত্যজিৎ রায়

জন্ম ১৯২১ সালে। মৃত্যু ১৯৯২ সালে। বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক। পৃথিবীবিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক। অস্কার পুরস্কারে ভূষিত। তাঁর ফেলুদা ও প্রোফেসর শঙ্কু চরিত্র দুটি তাবৎ পাঠকের মন জয় করেছে। 'সন্দেশ' পত্রিকাটি দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *জয় বাবা ফেলুনাথ, কৈলাসে কেলেঙ্কারি, রয়েল বেঙ্গল রহস্য* প্রভৃতি।

রাজেশ বসু

জন্ম ১৯৭১ সালে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্ট্যাটিসটিকসে স্নাতক। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রকে কর্মরত। বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যেও চমৎকার লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *পরির দুঃখ, কে* প্রভৃতি।

অনীশ দেব

জন্ম ১৯৫১ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে এম.টেক.। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রোফেসর পদে চাকরি করেছেন বিখ্যাত গোয়েন্দা ও কল্পবিজ্ঞান লেখক। বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যেও লেখেন। উল্লেখযোগ্য বই : *ভয়পাতাল, ভৌতিক অলৌকিক, মার্ডার ডট কম* প্রভৃতি।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

জন্ম ১৯২৪ সালে। বিশিষ্ট কবি। বড়োদের জন্যেও রহস্য উপন্যাস লিখেছেন। দীর্ঘদিন *আনন্দমেলা* পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য বই : *নীল নির্জন, উলঙ্গ রাজা, কলকাতার যীশু* প্রভৃতি।

শ্যামল দত্তচৌধুরী

জন্ম ১৯৪৫ সালে। ইঞ্জিনিয়ার, স্টিম বোলিং মিল থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে পুরোদমে সাহিত্য রচনায় আছেন। বড়োদের চেয়ে কিশোররা তাঁর লেখার ভক্ত পাঠক। উল্লেখযোগ্য বই : *বমাল গ্রেফতার, কেমন আছে ইয়েতিরা* প্রভৃতি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৯৩৫ সালে। স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে জীবন শুরু করেছেন। পরে সাংবাদিকতায় আসেন। জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। বড়োদের মতো ছোটোদের জন্যেও অনেক ভালো লেখা লিখছেন। উল্লেখযোগ্য বই : *ঘুণপোকা, মানবজমিন, মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি, গোঁসাইবাগানের ভূত* প্রভৃতি।

রতনতনু ঘাটী

জন্ম ১৯৫৩ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করে সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু। এখন 'আনন্দমেলা' পত্রিকার সহ সম্পাদক। বড়োদের পাশাপাশি শিশু ও কিশোরদের জন্যে কবিতা, গল্প, উপন্যাস লেখেন। উল্লেখযোগ্য বই : *মামাদের পোষা পরি, তিতির বন্ধু, কমিকস দ্বীপে টিনটিন* প্রভৃতি।

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৯৩৪ সালে। কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর এখন পুরোপুরি সাহিত্য রচনায় আছেন। ছোটোদের ও বড়োদের, দু'ধরনের পাঠকের জন্যে লেখেন। বিজ্ঞানভিত্তিক লেখায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *দাদুর দোয়াতদানি* । তাঁর স্বামী বিজ্ঞানী শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে লিখেছেন *ভারতীয় বিজ্ঞান উত্তরণের কাল, পরমাণু জিজ্ঞাসা* প্রভৃতি।

জগদীশচন্দ্র বসু

জন্ম ১৮৫৮ সালে। মৃত্যু ১৯৩৭ সালে। পৃথিবীবিখ্যাত বিজ্ঞানী। গাছের প্রাণ আছে তিনিই আবিষ্কার করেন। বিনা তারে খবর পাঠানোর উপায় তিনি প্রথম বের করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই : *অব্যক্ত, পলাতক তুফান, নিরুদ্দেশের কাহিনি* প্রভৃতি।